মন ও মানুষ

(স্বামী অভেদানন্দের ব্যক্তিত্ব, বাণী ও চিন্তাধারা)

—তৃতীয় ভাগ—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক ঃ স্বামী অশেষানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

দ্বিতীয় নূতন সংস্করণ ঃ শ্রাবণ, ১৩৬৮

মুদ্রক ঃ ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার
৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণি, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯।

উৎসর্গ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ
এবং
শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের
পুণ্য-পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হ'ল।

॥ সূচীপত্র ॥

॥ ভূমিকা ॥

'মন ও মানুষ'-গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল একটু নূতন রূপ নিয়ে। মনে রাখা উচিত যে, গ্রন্থের বিষয়গুলি ও তাদের আলোচনা ও প্রসঙ্গ যেমনটিভাবে হয়েছে ঠিক তেমনিভাবেই গ্রন্থে সাজানো হ'ল, সুতরাং সন-তারিখ-অনুযায়ী সাজানোর প্রশ্ন এখানে নাই। যেমন, উদাহরণ—আমেরিকার কথা হয়তো প্রথমে আলোচিত হয়েছে এবং তারপর সন্নিবেশিত হয়েছে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের দক্ষিণেশ্বরে তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্নিধানে উপনীত হওয়ার এবং দীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতির কথা। পুনরায় তাঁর জীবনের প্রায় শেষের দিকে কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও দার্জিলিঙে রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমকে দেবোত্তররূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে উৎসর্গ করার কথা। তাই সকল প্রসঙ্গের কথোপকথনের যথাযথ সন-তারিখ প্রভৃতির উল্লেখ থাক্‌লেও ওদেশের ও এদেশের তথা পাশ্চাত্যের ও ভারতবর্ষের ঘটনাপ্রবাহের সন্নিবেশের কিছু পরিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য আছে।

বর্তমানে নূতন দ্বিতীয়-সংস্করণ 'মন ও মানুষের' তৃতীয় ভাগে কিছু কিছু নূতন বিষয়বস্তুর ও ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ লেখকের সযত্নে রক্ষিত পুরাতন কাগজপত্র রাখার ঝুলি থেকে অনুসন্ধান ও সংগ্রহ ক'রে যা-কিছু নূতন উপাদান পাওয়া গেছে সেগুলিকেও নূতনভাবে লিখে এই নূতন সংস্করণে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া প্রথম সংস্করণের ভাষাও কিছু কিছু পরিমার্জিত করা হয়েছে।

'মন ও মানুষ'-গ্রন্থের নাম নির্দিষ্ট হয়েছে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বিচিত্র বিষয়ের বাণী ও চিন্তাধারার এবং তাঁর বিরাট-বিশাল ব্যক্তিত্বকে (personality) স্মরণ ক'রে;—যেমন 'মন' অর্থে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বিচিত্র বিষয়ের উপর প্রচলিত ও স্বতন্ত্র বাণী ও চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষ' অর্থে তাঁর বিরাট ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব,—যা তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, তপশ্চর্যা, সাধনা ও অনন্যসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভার উদ্ভাসিত আলোকে গঠিত ও রূপায়িত হয়েছিল। অলৌকিক ও অসাধারণ তাঁর জীবনসিদ্ধ আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস, অসাধারণ-অসামান্য প্রতিভা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ,

স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি তাঁর গুরুভ্রাতারা এবং জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতীরূপিণী-নবযুগনায়িকা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর অমোঘ-পবিত্র-আশীর্বাদ, করুণাদৃষ্টি ও সহায়তা প্রভৃতি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কর্মচঞ্চল সর্বতোমুখী প্রতিভাদীপ্ত জীবনকে ও কর্মধারাকে সকল সময়েই নিয়ন্ত্রিত ও জয়যুক্ত করেছিল।

সুতরাং তাঁর অসামান্য জীবনচরিতের ও জীবনালোচনার আলোকে প্রতিভাত হবে ঊনবিংশ-বিংশ শতকের যুগনায়ক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণেরও আবির্ভাবরহস্যের ও যুগব্রতসাধনের বহু তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা ও অবিস্মরণীয় ভাবনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তারই পুণ্য-পবিত্র আলোকে উদ্‌ভাসিত হবে শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের নিজেরও বিরাট-বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের বহু-বিচিত্র ঘটনা ও তাঁর জীবনসার্থকতার কথা ও কাহিনী।

তাছাড়া একথা সত্য যে, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বিচিত্র বিষয়ের উপর আলোচনা বহু অধ্যাত্মজীবনের পথচারীর অসংখ্য জীবনসমস্যারও সমাধান ক'রে তাদের কর্মময় জীবনে দেবে শান্তি ও চিরন্তন সান্ত্বনা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

মন ও মানুষ

(স্বামী অভেদানন্দের ব্যক্তিত্ব, বাণী ও চিন্তাধারা)

।। স্মৃতি ঃ কুড়ি ।।

যতদূর মনে পড়ে সে'দিন ছিল বৃহস্পতিবার, কিন্তু ইংরাজী বা বাংলা কোন্ সালের কথা মনে নেই। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর কয়েকজন আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অফিস-ঘরে গিয়ে বসলাম। আগন্তুক অনুরাগী ভদ্রলোকও দু'চারজন ছিলেন। রাত্রি তখন আটটা কি সাড়ে-আটটা হবে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কিছুক্ষণ পরেই গায়ে চাদর দিয়ে অফিস-ঘরে এসে বস্‌লেন। মাথার টুপি ও জামা-কাপড় সব নূতন রঙ-করা। খুব সাদাসিধে পোষাক হ'লেও সে'দিন তাঁকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমরা মনে মনে এ'কথাই চিন্তা করছিলাম। চেয়ারে বসার পূর্বে তিনি সহাস্যে বল্লেন ঃ 'দেখ দেখি সেজেছি ক্যামন?'

আমরা ঃ 'মহারাজ, খুবই সুন্দর। আমরাও এ'কথাই ভাব্‌ছিলাম এখুনি।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'তাই নাকি? তাহ'লে আমি thought-reading (মনের কথা পড়্‌তে) জানি বলো।'

পাশ থেকে হঠাৎ একজন ভদ্রলোক ভক্তির আতিশয্যে ব'লে উঠ্‌লেন ঃ 'তা আর হবে না মহারাজ, আপনারা মহাপুরুষ অন্তর্যামী।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী মহারাজের মধ্যে একটু ভাবান্তর দেখা দিল। তিনি চিরদিনই ছিলেন স্পষ্টবক্তা। সোজাসুজিভাবে কথা বলাই ছিল তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। তা'রজন্য অনেকে তাঁকে ভুলও বুঝেছেন, আবার অনুতপ্তও হয়েছেন অনেক সময়ে তাঁর প্রাণের সারল্য ও অকপট ভাব জান্‌তে পেরে।

এবারেও হল তাই। খানিকক্ষণ গম্ভীর থাকার পর তিনি ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন ঃ 'আপনাদের ভক্তির ঠেলায় আমি আর বাঁচি না মশাই। আপনারা যুক্তি-বিচার জিনিসটাকে ভক্তির রাজত্ব থেকে একেবারে বাদ দিতে বসেছেন দেখ্‌ছি,—যেটা কিন্তু মোটেই ভাল নয়। আপনাদের বোঝা উচিত যে, সকল কাজ ফেলে সারাদিন সমাধিস্থ হ'য়ে বসে থাকা কারু পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা কী গণক্কার (গণৎকার),—না বাজীকর যে আপনাদের অন্তরের কথা জানার জন্য সর্বদা ওৎপেতে বসে থাক্‌বো?'

ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বল্লেন ঃ 'আজ্ঞে না মহারাজ, আপনারা যে মহাপুরুষ,—তাই।'

স্বামীজী মহারাজ বালকের মতো হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন ঃ 'দেখুন, ও'সব কথা রাখুন। মহাপুরুষ সকলেই। আপনিও কি কম? নিজেকে শক্তিহীন ও দুর্বল ভাব্‌ছেন কেন? নিজেদের শক্তিহীন ও দুর্বল ভেবেই তো সারা দেশটা শক্তিহীন ও দুর্বল হ'তে বসেছে। সমগ্র জাতিটা যেন self-hypnotised (আত্ম-সম্মোহিত) হ'য়ে নিজেদের ভাব্‌ছে—'আমরা কিছুই নই, শক্তিহীন দুর্বল।' কিন্তু আপনারা সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান,—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। সকলের মধ্যেই অন্তর্যামী বিরাটপুরুষ বর্তমান আছেন। 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব', —তিনি এক হ'য়েও বহুরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজেকে প্রকাশ করছেন। নিজেকে কখনও তাই দীন-হীন ও দুর্বল চিন্তা করবেন না। আপনারা সকলেই অমৃতের সন্তান—এটাই সর্বদা মনে রাখার চেষ্টা করুন। এই চেষ্টার নামই সাধনা। চিন্তা করুন—

'আমি সামান্য তো নই, রাজপুত্র হই, পিতার ধনে পুত্রের পূর্ণ-অধিকার।' বিশ্বপিতার আপনারা যোগ্য-অধিকারী—একথা সর্বদাই চিন্তা করবেন।'

ভদ্রলোক ঃ 'তা আর বুঝ্‌তে পারি কই মহারাজ।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'বোঝ্‌বার চেষ্টাই বা কে ক'রে বলুন। চেষ্টা করলে ভগবানই বুদ্ধিরূপে সাহায্য করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বল্‌তেন—'তুমি এক-পা এগিয়ে গেলে ভগবান দশ-পা এগিয়ে আসেন।' নিশ্চেষ্ট লোকের ধর্ম হয় না, কর্ম বা সাধনও হয় না। তীব্রসম্বেগানাং আসন্নঃ,—তীব্র ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা থাকা চাই সকল কাজের পিছনে। আত্মা যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব এটা বুঝতে চায় ক'জন? ইন্দ্রিয়রা সাধারণতই বহির্মুখী, কিন্তু তাদের অন্তর্মুখী করা চাই। কঠোপনিষদে আছে—

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।।'

ইন্দ্রিয়রা বাইরের বিষয়বস্তু নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা মেতে আছে, সুতরাং অন্তরাত্মাকে কখন্ আর দেখ্‌বে বলুন? রামপ্রসাদ বলেছেন ঃ 'ঘুড়ি লক্ষের দু'টো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপাড়ি।' কথাটা খুবই সত্য। কোন কোন ভাগ্যবান জ্ঞানী বাইরের চাকচিক্যকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে অন্তরাত্মাকে দেখেন, জানেন ও শাশ্বত আনন্দ লাভ করেন। ধ্যান-ধারণা-দ্বারা সমাহিত চিত্ত

হ'লে তবে পরমাত্মাকে দর্শন কিনা উপলব্ধি করা যায়। দর্শন তো আর এই পার্থিব চক্ষু দিয়ে হয় না, জ্ঞানচক্ষু দরকার। জ্ঞানচক্ষু হ'লে সাধক নিজে যে পরমাত্মার স্বরূপ এবং পরমাত্মা ও তার মধ্যে যে কোন ভেদ নেই—এই তত্ত্ব প্রাণে-প্রাণে অনুভব করতে পারে। এই সম্যক্ভাব জানার নাম আত্মার উপলব্ধি কিনা আত্মজ্ঞান। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের মন পার্থিব জিনিসের মায়াতে আবদ্ধ, ক্ষণিক ভোগের সুখকেই তারা বড় ব'লে মনে করে। তাই তারা আত্মার স্বরূপকে জানে না। কেন জানেনা? পূর্বে সেকথা বলেছি—'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্'; —অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-ত্বক্-জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টি বিশ্বসংসারের যাবতীয় ভোগের বিষয়ে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে ও তাদের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে দেয়। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মোহ ছেড়ে আর চিরনিত্য-শাশ্বত স্বয়ম্ভু এবং জন্ম-মরণ পরিবর্তনের অতীত শাশ্বত আত্মাকে বুঝতে দেয় না ইন্দ্রিয়রা। তাই বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী ক'রে অন্তরাত্মারূপী পরমাত্মা-ব্রহ্মের উপলব্ধি করা দরকার জন্ম-মরণরূপ সংসারকে অতিক্রম করার জন্য। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন ঃ 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিঃ নিরোধঃ।' নিরোধঃ কিনা মনকে বৃত্তিহীন ক'রে চিরশান্ত সমাধিতে অবস্থান। প্রশান্তিতে অবস্থান করা ছাড়া শান্তি নাই, মুক্তি নাই, আত্মোপলব্ধি নাই। তাই সাধন-ভজনের অভ্যাস চাই। অভ্যাসের অর্থ অভ্যাসযোগ। এরইজন্য সাধন-ভজনে নিষ্ঠা চাই, ভগবৎপ্রেম যাতে আসে তার চেষ্টা করতে হয়। মীরাবাঈ বলেছেন ঃ 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।' নন্দলালা প্রেমস্বরূপ ভগবান। তাঁকে পেতে, জান্‌তে বা বুঝ্‌তে হলে নিজেকে শুধু প্রেমিক নয়,—প্রেমময় হ'তে হয়। নইলে আপনি 'অন্তর্যামী বা মহাপুরুষ' বল্লে কি হবে। নিজে কিছু করুন, তবে তো সত্যকার অন্তর্যামী বা মহাপুরুষ কাকে বলে জান্‌তে পারবেন। নিজে কিছু করবো না, কেবল মুখে দু'চারটে ভক্তির বা জ্ঞানের বুলি আওড়াবো—তাতে কি হয়?'

স্বামীজী মহারাজ পুনরায় বল্লেন ঃ 'অন্যে পরে কা কথা। এই সব সাধু-ব্রহ্মচারীদেরই কি কম কঠোরতা করতে হয়? শুধু গেরুয়া পরলেই তো সাধু হওয়া যায় না, সাধন-ভজন চাই, অভ্যাস চাই, নিষ্কামভাবে লোকের কল্যাণের জন্য কর্ম করা চাই, তীব্র-ব্যাকুলতা চাই, ত্যাগ ও বৈরাগ্য চাই। পাছে ভোগে আসক্তি আসে ও ভগবানের উপর বিশ্বাস ও ভক্তির অভাব হয়—এ'জন্য শাস্ত্র সন্ন্যাসীদের তীর্থভ্রমণের উপদেশ দিয়েছে। 'রমতা সাধু বহতা পানি, না মৈল লখানি',—যে জল এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না, চলমান হয়, সেই জলে কখনো ময়লা জমে না। সাধুদের বেলায়ও তাই। যে-সব সাধু-সন্ন্যাসী দেশ-

বিদেশে নানান্ তীর্থে ঘুরে বেড়ায়, তাদের মনে আত্মনির্ভরতা আসে, মন নির্মল হয়। তাছাড়া দেশভ্রমণের আর একটা উপকারিতা হ'ল ভিন্ন-ভিন্ন দেশের লোকেদের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'লে নিজের মনের মধ্যে compare (তুলনা) করার একটা প্রবৃত্তি জাগে, বিচার করার শক্তি আসে ও বৈরাগ্য আসে। Comparative (তুলনামূলক) জ্ঞান-ছাড়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পাকা হয় না। কিন্তু তাই ব'লে তীর্থভ্রমণের নেশা আবার ভাল নয়। কোন কাজ করবো না, তপস্যা ও তীর্থভ্রমণের নাম ক'রে সারাজীবন এখানে-সেখানে কেবল ঘু'রে বেড়াব—এটাও মোটেই ভাল নয়। এজন্য সাধক কমলাকান্ত বলেছেন—

'তীর্থভ্রমণ দুঃখ-গমন, মন-উচাটন হয়ো নারে,
আনন্দে ত্রিবেণী-স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।'

'আনন্দে ত্রিবেণী-স্নানে শীতল হও না মূলাধারে' কথার অর্থ দু'রকমভাবে হয়। প্রথম অর্থ,—সঙ্গীত-রচয়িতা সাধক কমলাকান্ত নিজেই বলেছেন যে, ত্রিবেণী-স্নান মূলাধারপদ্মে হয়। ত্রিবেণী আবার দু'টি ঃ একটি যুক্ত-ত্রিবেণী মূলাধারে ও আর-একটি মুক্ত-ত্রিবেণী আজ্ঞাচক্রে। মুক্ত-ত্রিবেণীতে মুক্তি হয়, সংসারবন্ধন দূর হয়। মূলাধারে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না তিনটি নাড়ি একসঙ্গে মিলিত কিনা যুক্ত হয়েছে। মধ্যে সুষুম্না—সরস্বতী-নদীরূপে কল্পিত, বামে ইড়া—যমুনা, এবং দক্ষিণে পিঙ্গলা—গঙ্গা। এই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম বা মিলনস্থল মূলাধার। যোগশাস্ত্রে ইড়া ও পিঙ্গলাকে চন্দ্র ও সূর্যরূপেও কল্পনা করা হয়। ইড়া ও পিঙ্গলায় মনের সঙ্গে প্রাণ বা প্রাণবায়ুর দিবানিশি যাতায়াত। কিন্তু এই যাতায়াত বন্ধ হয় মন ও প্রাণবায়ুকে যখন সাধনার কৌশলে সুষুম্নার ছিদ্রপথে প্রবাহিত ও সমস্ত-চক্রভেদ ক'রে সহস্রারপদ্মে পরমশিবে মিলিত করা হয়। কিন্তু সহস্রারে যাওয়ার পূর্বে আজ্ঞাচক্রে তথা জ্ঞানচক্রে[১] মন পরিশুদ্ধ হয়। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন ঃ 'অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তিসারে। ওরে, কোটার ভিতর চোরকুঠারী, ভোর হ'লে সে লুকাবে রে' প্রভৃতি। এই 'শশী' অর্থে মন। মন সর্বদাই চঞ্চল। রামপ্রসাদ আবার বলেছেন ঃ 'মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ওমা।' তাই মনকে স্থির না করলে সুষুম্নায় মন প্রবেশ করতে পারে না। সুষুম্নাই সহস্রারপদ্মে মনকে পরমশিবে মিলিত করে। রামপ্রসাদ বলেছেন ঃ 'কালী, পদ্মবনে হংসসনে, হংসীরূপে করে রমন, তাঁকে সহস্রারে মুলাধারে, সদা যোগী করে মনন'। সহস্রার সহস্রদলবিশিষ্ট

১। মস্তকে কোটি-কোটি অসংখ্য nerve-centres আছে। ঐ স্নায়ুকেন্দ্রগুলি বিচিত্র সংবেদন বা জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল।

পদ্ম। সেই পদ্মে হংস অর্থাৎ শিব ও হংসী বা শক্তি পরস্পরে মিথুন বা চনকাকারে থাকে। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন ঃ 'ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা, তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী।' শ্যামা শব ও শিবরূপে সহস্রারে ও কুণ্ডলিনীশক্তিরূপে মূলাধারে অবস্থিত। এর অন্য অর্থ হ'ল ঃ মূলাধার-ছাড়াও সহস্রারপদ্ম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার আর একটি মিলনস্থল। সহস্রারে পরমাত্মারূপী পরমশিবের সঙ্গে সুপ্তা শক্তিরূপী জীবাত্মাকে মিলিত করলে সাধক অপার্থিব শান্তি লাভ করেন। তাই মূলাধার ও আজ্ঞা এবং পরে সহস্রার এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান কল্পনা করা হয়। তবে কমলাকান্ত মূলাধারকে প্রাধান্য দিয়েছেন কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার জন্য। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হ'লে সাধকের জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত হয়। শিব-শক্তির মিলনকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য যৌগিক বা তন্ত্রনির্দিষ্ট সাধনার ইঙ্গিত এখানে। মোটকথা মন যুক্তত্রিবেণী-মূলাধার থেকে মুক্তত্রিবেণী আজ্ঞা (জ্ঞান)-চক্রে উপনীত হ'লে পরিশুদ্ধ হয়। পরিশুদ্ধ মন চৈতন্যে রূপায়িত হয়ে সহস্রারে পরমজ্ঞানের সঙ্গে মিলিত হয়।

'তাই নিজে হাতেনাতে কিছু করা দরকার। উদ্দেশ্যহীন হ'য়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ালে হবে কেন! তাই ভবঘুরে হওয়া যেমন ভাল নয়, তেম্‌নি একটা জায়গায় মাটিকামড়ে পড়ে থাকাও আবার ভাল নয়, তাতে মনে আসক্তির ময়লা জম্‌তে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণও বহূদক ও কুটিচকের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি অবশ্য বহূদকের চেয়ে কুটিচকেরই প্রশংসা করেছেন বেশী। কুটিচক অর্থে সকল তীর্থস্থান ঘুরে ঘুরে শেষে যখন দেখে কোথাও কিছু নেই, নিজের মধ্যেই সব, তখন সে একটা জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে ব'সে যায়, আর সাধন-ভজন ক'রে সত্যবস্তু লাভ করে। বস্তু (ব্রহ্মবস্তু) লাভ করাটাই জীবনের আসল কাজ, তা যেইরকম ক'রেই হোক না কেন। উপায় সাহায্য করে, তবে লক্ষ্যই বড়। লক্ষ্য হ'ল যেটাকে তুমি জীবনে চরমবস্তু ব'লে লাভ করবে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্তুলে পাখীর উদাহরণ দিয়েছেন। চারদিক ঘুরে এসে শেষে নিশ্চিন্ত মনে পাখী মাস্তুলে বসে।'

আমরা ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ নয়, কাজে কিছু করো। শুধু কথায় যেমন পেট ভরে না, তেম্‌নি কেবল শাস্ত্রপাঠ, উদ্দেশ্যবিহীন হ'য়ে তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ানো, বা কেবলই কাজের নেশায় কাজ ক'রে যাওয়াও ভাল নয়। সকল জিনিসকেই ঈশ্বরলাভের উপায় ব'লে মনে করতে হয়, তবেই শাস্ত্রপাঠ বলো, তীর্থভ্রমণ বলো, কাজ করা বলো—সবই সার্থক হয়।'

রাত্রি তখন প্রায় ১০টা। এক মিনিটের জন্য ভিতরে গিয়ে স্বামীজী মহারাজ আবার ফিরে এসে চেয়ারে বস্‌লেন ও হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন ঃ 'কি বলো, আসলে ভাব নিয়েই তো কথা। তবে প্রত্যয় বা বিশ্বাস চাই,—'মূল সে প্রত্যয়।'

আমরা ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। আপনিও তো ভারতের বহু দেশ ঘুরেছেন খালি পায়ে কারু কাছ থেকে কোন কিছু না নিয়ে।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'হ্যাঁ, পরিব্রাজক-জীবনের ঐ 'কালী-তপস্বী'-ছবিটা দেখেছ?—ঐ দেখ।' এই ব'লে তিনি অফিসঘরের দক্ষিণদিকের দেওয়ালে টাঙানো কালী-তপস্বী-ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখালেন। তারপর বল্লেন ঃ 'শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) ও আমরা কয়েকজন বেরিয়ে পড়্‌লাম তাঁর নাম নিয়ে—এ'কথা তো তোমাদের অনেকবারই বলেছি। স্বামীজী (বিবেকানন্দ) গেলেন একদিকে, আর আমি গেলাম অন্যদিকে। নানান্ জায়গা নানান্ দেশ ঘুরে শেষে এলাহাবাদে যাই। এলাহাবাদে ঝুঁসিতে দিনকতক কাটাই তপস্যা ক'রে। সেখান থেকে সদানন্দকে (গুপ্ত মহারাজ) নিয়ে কাশী যাই। কাশীতে অসিঘাটের কাছে একটা বাগানবাড়ীতে আমরা থাক্‌তাম, দুপুরে মাধুকরী করতাম, আর বাকী সময় কাটাতাম শাস্ত্রপাঠে ও অনবরত ধ্যান-ধারণায়। তখন সংস্কৃতভাষায় অনর্গল কথা বল্‌তে পার্‌তাম। পাণিনির ব্যাকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদীটা আমার একরকম কণ্ঠস্থই ছিল। এলাহাবাদে থাকতে শিশির বসু মহাশয় যখন পাণিনির (পাণিনি-ব্যাকরণের) ইংরেজী অনুবাদ করতেন, তখন সেই অনুবাদের কাজে আমি তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিলাম।

'কাশীতে থাক্‌তে ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দের নাম শুনি। ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে একদিন দেখ্‌তে যাই। দেখ্‌লাম সত্যই যেন কাশীর জীবন্ত-শিব। যথার্থজ্ঞানী পুরুষ। বালকের মতো স্বভাব ও নির্বিকারচিত্ত তাঁর। যথার্থই তিনি জীবন্মুক্ত জ্ঞানীপুরুষ। তারপর যাই ভাস্করানন্দ স্বামীকে দেখ্‌তে। ভাস্করানন্দ স্বামীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর অদ্বৈতবেদান্ত নিয়ে বিচারও হ'ল। সবই সংস্কৃতে। সেই সময়ে প্রমদাদাস মিত্রও ঐ বাগানবাড়ীতে আমার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতে আস্‌তেন। তখন দীনু (দীননাথ বা সচ্চিদানন্দ) আমার সঙ্গে ছিল। পদব্রজে কাশী পরিক্রমা করি। তারপর কিছুদিন পরে হেঁটে কলকাতায় বরানগর-মঠে ফিরে আসি। অবশ্য এর পরে আরও অনেক ঘটনার কথা আছে।'

আমরা ঃ 'তাহলে তখন থেকেই বোধহয় বরানগর-মঠে আপনি থেকে গেলেন? স্বামীজীর (বিবেকানন্দের) লণ্ডনে যাওয়ার পূর্বে আর কখনো সম্ভবতঃ তাঁর (স্বামীজীর) সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'তার পূর্বে স্বামীজীর সঙ্গে আমার জুনাগড়ে একবার দেখা হয়েছিল পরিব্রাজক-অবস্থায়। বরানগর-মঠে নানান্ কারণে বেশীদিন আমি থাক্‌তে পারিনি। তখন শিবানন্দ স্বামী ও নিরঞ্জন স্বামী (নিরঞ্জনানন্দ) বরানগর-মঠের সব কাজের দেখাশোনা করতেন। শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) ও লাটুর (অদ্ভুতানন্দ) যত্ন-ভালবাসার কথা কোনদিন ভুল্‌তে পারবো না! বরানগর-মঠে দিনকতক থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ ক'রে আবার পদব্রজে বেরিয়ে পড়্‌লাম। সে'দিন একটু দুর্যোগপূর্ণ মেঘলা ও জল-ঝড়ের আকাশ ছিল। বৃষ্টিও হচ্ছিল সামান্য। লাটু মহারাজ অনুরোধ করেছিল সে'দিন বার না হওয়ার জন্য। আমি কিন্তু তাঁর নিষেধ রাখ্‌তে পারিনি। চোখ ছলছল করতে করতে লাটু আমার দিকে চেয়ে ছিল। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই দুর্যোগেই বেরিয়ে পড়্‌লাম।

'গঙ্গা পার হ'য়ে বালি-ষ্টেশনে কাশী যাওয়ার গাড়ী ধরি। তার পরের দিন কাশী পৌঁছুই। কাশী থেকে যাই প্রয়াগ, দিল্লী, তারপর আগ্রা হ'য়ে চিত্রকূটে। সেখান থেকে যাই জয়পুর, খেতড়ি, আবু ও গিরনার প্রভৃতি স্থানে। সমস্ত স্থানেই খালি পায়ে ঘুরতাম। মাধুকরী করতাম তিন বাড়ী। ঐ যে কালী-তপস্বী ছবি দেখ্‌ছ—ঠিক ওভাবেই ভারতের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। তখন স্বামীজীকে দেখাব ভারি ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ঠিকানা মোটেই জানা ছিল না। নর্মদানদী পার হ'য়ে ক্রমশঃ জুনাগড়ে গিয়ে পৌঁছুলাম। পথে পোরবন্দরের (গুজরাট) বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর-পাণ্ডুরঙের সঙ্গে দেখা। তিনি বল্লেন ঃ 'এই সে'দিন স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে ইংরেজী-জানা একজন বাঙ্গালী-সন্ন্যাসী এসেছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক।' আমি চেহারা ও কথাবার্তার description (বিবরণ) শুনে অনুমান কর্‌লাম ঐ সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই আমাদের স্বামীজী হবেন। সম্ভবতঃ ছদ্মবেশে তিনি গুজরাট প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শঙ্কর-পাণ্ডুরঙ খুব শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত লোক ছিলেন। সংস্কৃতভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল (অধিকার) ছিল। সেই সময়ে তিনি অথর্ববেদ সংকলন ক'রে সংস্কৃতে ছাপানোর বন্দোবস্ত করছিলেন। আমার সঙ্গে আলাপ হ'তে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁর বাড়ীতে দিনকতক থাকার জন্য আমায় বিশেষ অনুরোধও করলেন তিনি। কিন্তু বেশীদিন থাকার সেখানে ইচ্ছা হ'ল না। আমি মনে মনে বুঝ্‌লাম স্বামী সচ্চিদানন্দ আর কেউ নন, আমাদের বিবেকানন্দই। তাঁকে দেখার জন্য তখন আমার মন আরও চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। শঙ্কর-পাণ্ডুরঙ বল্লেন যে, তিনি (বিবেকানন্দ) জুনাগড়ের দিকে গেছেন। আমি দু'দিন মাত্র পোরবন্দরে থেকে জুনাগড়ের দিকে তাই রওনা হলাম। জুনাগড়ে অনেক

খোঁজাখুজি ক'রে সেখানকার নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মন্‌সুখরাম-সূর্যরাম-ত্রিপাঠীর বাড়ীতে হাজির হ'লাম। ত্রিপাঠী-মহাশয় একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ, অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখি আমাদের স্বামীজী (বিবেকানন্দ) বসে আছেন। ত্রিপাঠী-মহাশয়ের সঙ্গে তিনি তখন সংস্কৃতে বেদান্তের বিচার করছিলেন। আমায় অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে স্বামীজী আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠলেন। তিনি আমাকে দেখিয়ে ত্রিপাঠী-মহাশয়কে বল্লেন ঃ 'ইনি আমার গুরুভাই, একজন অদ্বিতীয় বেদান্তী। আপনি এঁর সঙ্গে বেদান্তের বিচার করুন।' আমি ধুলোপায়েই বসে গেলাম বিচার করতে। অনেক দিন পরে স্বামীজীকে দেখে মনে কি যে আনন্দ হ'ল তা' আর ব'লে বোঝানোর নয়। স্বামীজী হাসিমুখে একপাশে বসে আমাদের বিচার শুন্‌ছিলেন। শান্ত-স্থির-মুদ্রিত নয়ন। ত্রিপাঠীমহাশয়ের সঙ্গে আমি অনর্গল সংস্কৃতভাষায় অদ্বৈতবেদান্তের নানান্ জটিল বিষয় নিয়ে বিচার করতে লাগ্‌লাম। স্বামীজীর মুখে আনন্দ আর ধরে না। ত্রিপাঠীমহাশয়ও খুব খুসী হ'য়ে আমাদের আদর-যত্ন করেছিলেন। জুনাগড়ে বহু দিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে আবার নানান্ কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হ'ল। বরানগর-মঠের কথাও জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। কোনও-একটি কারণে খুব দুঃখ করলেন। দু'চার দিন পরে স্বামীজী আবার বোম্বাইয়ের দিকে রওনা হলেন। আমিও ত্রিপাঠীমশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বারকার দিকে যাত্রা করলাম। বহুদিন পরে মিলনের পর আবার আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হ'ল।'

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'দ্বারকা থেকেই ফিরেছিলেন, না—আর কোথাও গিয়েছিলেন?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'ফির্‌বো কেন? দ্বারকার মন্দির প্রভৃতি দেখে প্রভাসতীর্থে গেলাম। সেখান থেকে জাহাজে ক'রে বোম্বাই ও পরে মহাবালেশ্বর যাই। মহাবালেশ্বরে নরোত্তম মুরারজী গোকুলদাসের বাড়ীতে উঠে দেখি বসে আছেন আমাদের স্বামীজী,—সেই নরেন্দ্রনাথ। খুব তো একচোট হাসাহাসি হ'ল। তারপর স্বামীজী বল্লেন ঃ 'বেশ বাবা, তুমি আমার পিছু নিয়েছ দেখ্‌ছি।' আমি বল্লাম ঃ 'তা কেন? আমি আমার মতো চলেছি, তুমি তোমার মতো চলেছ। কিন্তু তুমি যে আবার এখানে হাজির হবে তা' আমি ক্যামন ক'রে জান্‌বো বলো?' সে'দিনটা সেখানে কাটিয়ে তার পরের দিন আমি পুণার দিকে বেরিয়ে পড়্‌লাম। স্বামীজী সেখানেই থেকে গেলেন। তখনও তিনি নিজেকে 'সচ্চিদানন্দ' এই ছদ্মনামেই পরিচয় দিতেন।'

স্বামীজী মহারাজ বলতে লাগলেন ঃ 'আমি পুণা হ'য়ে বরোদা, নাসিক ও দণ্ডকারণ্যে যাই। সেখান থেকে তাপ্তী, গোদাবরী ও কাবেরী ইত্যাদি তীর্থ দর্শন ক'রে মাধুকরী করতে করতে পদব্রজে অগ্রসর হতে থাকি। মাঝে-মাঝে রেলেও গেছি। তখন পয়সা ছুঁতাম না, কেউ যদি টিকিট ক'রে গাড়ীতে চড়িয়ে দিত তো গাড়ীতে যেতাম। ক্রমশ উত্তরের দিক থেকে একেবারে দক্ষিণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে হাজির হলাম। সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে স্নান ক'রে রামেশ্বর-শিব দর্শন করলাম। তারপর তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, কাঞ্চী, কুম্ভকোনম্ প্রভৃতি দর্শন ক'রে কলকাতায় ফিরে আস্‌বো ঠিক করলাম। আমি টাকাকড়ি স্পর্শ করি না জেনে একজন ভদ্রলোক আমায় জাহাজের টিকিট কিনে দিলেন। ফোর্থ-ক্লাশের ডেক্-প্যাসেঞ্জার হ'য়ে জাহাজে উঠ্‌লাম। কাপড়ের খুঁটে দু'টিখানি চিঁড়ে বাঁধা ছিল, তাই সমুদ্রের জলে ভিজিয়ে নিয়ে প্রায় তিন দিন কাটালাম। কিন্তু সে কি আর খাওয়া যায়, সমুদ্রের লোনাজলে চিঁড়ে অখাদ্য হ'য়ে গিছ্‌লো। কিছুদিন পরে কলকাতায় এসে শুন্‌লাম বরানগরে মঠ নাই, আলমবাজারে উঠে গেছে। সুতরাং আলমবাজার-মঠে অপ্রত্যাশিতভাবে পৌঁছুতে শশী, লাটু, শরৎ, নিরঞ্জন এরা খুব আনন্দিত হ'ল।'

আমরা ঃ 'ফিরে এসে আর কোথাও বোধহয় বার হলেন না?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'আলমবাজার-মঠেই তখন থাক্‌লাম। কিন্তু খালিপায়ে সারাটা দেশ ঘোরার জন্য কিছুদিন পরে পায়ে থ্রেডওয়ার্ম (নাহারু) দেখা দিল। একদিন-দু'দিন নয়, প্রায় তিনমাস শয্যাগত হ'য়ে পড়ে থাক্‌লাম। নড়বার আদৌ শক্তি ছিল না। জুনাগড়ে স্বামীজীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হ'লে তিনি আমায় বলেছিলেন ঃ 'এদেশে খালিপায়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু ভুগ্‌তে হবে।' মহাপুরুষের বাক্য বৃথা যাওয়ার নয়, সত্য হয়েছিল। অসুখের সময় শরৎ, লাটু ও নিরঞ্জন[২] এরা খুব সেবা-যত্ন করেছিল। তাদের যত্ন ও ভালবাসা জীবনে কখনো ভুল্‌তে পারবো না! অসুখ সেরে গেলে শরতের কাঁধে ভর দিয়ে কতদিন ছোটছেলেদের মতো এক-পা দু'পা করে চলা অভ্যাস করেছি, তবে তো ভাল ক'রে চল্‌তে পারি।

'সারা ভারতবর্ষটা নিঃসম্বলেই ঘুরে বেড়িয়েছি। কত ঝড়-ঝাপ্টা মাথার উপর দিয়ে গেছে, সবই অবলীলাক্রমে সহ্য করেছি। অবশ্য ফলও তার পেয়েছি। এখন পেন্‌সেন ভোগ করছি আর কি।' এই ব'লে স্বামীজী মহারাজ হাস্‌তে লাগ্‌লেন। আমরাও হাসি চাপ্‌তে পারিনি। এর মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা

২। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

করলো ঃ 'মহারাজ, আপনি কি গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী গিছ্‌লেন?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'গিছ্‌লাম বৈকি! হিমালয়ের শেষ থেকে আরম্ভ ক'রে কুমারিকা-পর্যন্ত কোন স্থান আর বাকি রাখিনি। গঙ্গোত্রী যাওয়ার দেবপ্রয়াগ থেকে দু'টো রাস্তা বেরিয়ে গেছে ঃ একটা গঙ্গার ধার দিয়ে গঙ্গোত্রীর দিকে, আর অপরটা কেদার-বদরীর দিকে। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী হ'য়েও কেদার-বদরী যাওয়া যায়। ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে একটা রাস্তা আছে।[৩] আমি প্রথমে বদরিকাশ্রম যাই, সেখান থেকে যাই উখীমঠে ও গুপ্তকাশী হ'য়ে কেদারনাথে। তারপর ত্রিযুগীনারায়ণের রাস্তা ধ'রে গঙ্গোত্রীর দিকে রওনা হই। উত্তরকাশী হ'য়েও গঙ্গোত্রী যাওয়া যায়। গঙ্গোত্রীর দু'ধারে সিদ্ধিগাছের জঙ্গল। আমার সঙ্গে যারা ছিল সকলেই মুঠোমুঠো সিদ্ধি তুল্‌তে লাগ্‌লো। গঙ্গোত্রী যেখান থেকে বেরিয়েছে সে'টার নাম গোমুখ। একটা পাহাড়ের উপর থেকে ঝরনার মতো গঙ্গার ধারা নাম্‌ছে। আমি তারই কিছু দূরে রাত্রি কাটালাম। সাম্‌নে একটা উষ্ণ কুণ্ড (জলের) ছিল। সঙ্গে সামান্য চালও ছিল। একটা গামছার খুঁটে চাল বেঁধে খানিকক্ষণ কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে রেখে তুল্‌তেই দেখি চাল সিদ্ধ হ'য়ে ভাত হ'য়ে গেছে। তবে ভাতে গন্ধকের খুব গন্ধ ছাড়্‌ছিল। কাছে বোধহয় গন্ধকের কোন পাহাড় ছিল, তাই ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যে বারমাস জল গরম থাকে। গরম মানে কি,—যেন ফুট্‌ছে! আমি ও একজন সাধু সেখানেই রাত্রি কাটালাম। নানকপন্থী ঐ উদাসী-সাধু আমার সঙ্গে ছিল। রাত্রে কাঠ জোগাড় ক'রে সারারাত্রি আগুন জ্বালিয়ে কাটালাম। তারপর দু'জনে পালা ক'রে রাত্রি জাগ্‌লাম, নইলে বাঘ আস্‌বে। শুন্‌লাম চিতাবাঘের সেখানে ভারি উপদ্রব। প্রথমের দিকে নানকপন্থী সাধু জেগে থাক্‌লো, আমি ঘুমালাম। শেষরাত্রে আমি জাগ্‌লাম। বরফের নদী থেকে সাতটি ধারা একসঙ্গে মিশে গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে। গঙ্গোত্রী দেখে উত্তরকাশী হ'য়ে দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যমুনোত্রীতে উপস্থিত হলাম। সেখানেও একটা গরমজলেব কুণ্ড ছিল। তাতে চাল সিদ্ধ ক'রে খেয়ে একটা গুহার ভিতর রাত্রি কাটালাম। পরের দিন যমুনার ধার দিয়ে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে দেরাদুন হ'য়ে আবার হৃষিকেশে ফির্‌লাম।'

আমরা সকলে চুপ ক'রে বসে স্বামীজী মহারাজের কথা শুন্‌ছি। তিনি এমনিভাবে তাঁর ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন যেন আমাদের সাম্‌নে তাদের ছবি স্পষ্টই ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

৩। এই রাস্তা এখন বন্ধ হ'য়ে গেছে।

।। স্মৃতি ঃ একুশ ।।

আমরা তখন দার্জিলিঙে শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রমে। একদিন রাত্রি দুটো-আড়াইটা হবে। স্বামীজী মহারাজ রাত্রের আহার শেষ ক'রে শোওয়ার ঘরের সাম্‌নের ঘরে চেয়ারে হেলান দিয়ে তামাক খাচ্ছেন। আমরা তাঁকে প্রণাম ক'রে বস্‌তেই তিনি বল্লেন ঃ 'আরে এসো এসো, এত রাত্রে ঘুম ছেড়ে যে?' আমরা বল্লাম ঃ 'কেন মহারাজ, এ'রকম তো প্রায়ই আম্‌রা আসি, আজ তো আর নূতন নয়।' তিনি বল্লেন ঃ 'হ্যাঁ, তা তো বটেই, তবে কি ব'লে আর কথাবার্তাটা আরম্ভ করি বলো,—তাই।'

আমরা বহুবার উল্লেখ করেছি যে, স্বামীজী মহারাজের আলোচনা করার নির্দিষ্ট কোন বিষয় ও সময় ছিল না। কারু ভিতর জানার বা শোনার আগ্রহ ও আকুলতা দেখ্‌লে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে নানান্‌ প্রসঙ্গ শুরু ক'রে দিতেন। বিচিত্র কর্ম্মময় ছিল তাঁর জীবন! জীবনের শেষদিন-পর্য্যন্ত বিচিত্র কর্ম্মের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় যোগসূত্র বাঁধা। তাঁর কর্ম্মের ধারা বা পদ্ধতিও ছিল কর্ম্মযোগীর মতো, তবে কর্ম্মের নেশা কোনদিন তাঁকে পেয়ে বসেনি, বরং কর্ম্মই তাঁর হাতের খেলার জিনিস ছিল।

দিনে ও রাত্রে খাওয়ার পরে অনেকেই আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বস্‌তাম তা' পূর্ব্বেই বলেছি। সে'দিনও তাই রাত্রে আহারের পর তাঁর বিশ্রামের ঘরে গিয়ে বস্‌লাম। স্বামীজী মহারাজ একটি প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে বল্লেন ঃ 'কি জানো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তো কাট্‌লো মানুষের অর্দ্ধেকটা জীবন, আর অর্দ্ধেকটা কাটে নানান্‌ অংশে ভাগ হ'য়ে।'

আমরা ঃ 'সে কি রকম মহারাজ?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'এই দেখ না, যখন বিয়ে হয়নি—তখন মানুষের স্বাধীন বিহঙ্গের মতো নিজের চিন্তাই থাকে, অপর চিন্তা থাকলেও তা' গৌণভাবে থাকে। বিয়ে হলেই অর্দ্ধেক জীবনটা বিলিয়ে দিতে হয় অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রীকে। ছেলেপুলে হ'লে তাদের দিতে হয় তারও অর্দ্ধেকটা। তারপর আবার জামাই, নাতি-নাত্‌নি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়্‌শী, অসুখ-বিসুখ, ডাক্তার-বদ্যি, মাম্‌লা-মকদ্দমা ইত্যাদি আছেই। তখন নিজের বল্‌তে আর কি থাকে বলো? অবশ্য সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের কথা স্বতন্ত্র। তারা সারা জীবনটা সাধন-ভজন ও

ভগবচ্চিন্তা ক'রে কাটিয়ে দিতে পারে। তবে সকল রকম জীবনেই সংযম, নিষ্ঠা ও অভ্যাস থাকা দরকার। অভ্যাস করলে কি গৃহবাসী ও কি বনবাসী সকলের জীবনেই শান্তি আসে, সান্ত্বনা আসে। দেখোনা,—অভ্যাস করেছিলাম বলেই তো ঘুমটা একরকম জয় ক'রে ফেলেছি। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) যখন ছিলাম, তখন ঘুমাতাম চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর তিন-চার ঘণ্টার বেশী নয়।'

আমরা ঃ 'আপনাদের কথা স্বতন্ত্র মহারাজ।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'কেন, আমরা বুঝি মানুষ নই, আকাশের দেবতা? আর তাই যদি হয়, তবে জান্‌বে দেবতারাও মানুষ। সাধনা ও সৎকর্মের ভিতর দিয়ে মানুষই দেবতা হয়। An ordinary man becomes a God-man. সচ্চিন্তায় ও সাধনায়ই তারা দেবতা হয়। তবে জীবনে যত্ন ও অভ্যাস চাই। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন ঃ 'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।' বারবার যত্ন করার নাম অভ্যাস। কিছুই করবো না, কেবল কুঁড়েমি করবো ও প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুবো—এ'সব করলে কি আর জীবনে উন্নতি হয়! স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) আজীবন কি কঠোর তপস্যাই না করেছিলেন! কাশীপুরের বাগানে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) একবার রাত্রে ধ্যান করছিলেন, অসংখ্য মশা বসে সর্বাঙ্গ কালো হ'য়ে গিছ্‌লো, মনে হয়েছিল যেন একটা কালো কম্বল তাঁর গায়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। দুপুরের প্রখর রৌদ্রের ভিতর বরানগর-মঠে শুয়ে আমিও ধ্যান করতাম। মহিম বাবু (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) একদিন দেখে বল্লেন ঃ 'কালী ম'রে কাঠ হ'য়ে গেছে।' যোগানন্দ শুনে বলেছিল ঃ 'আরে ও মরে নি, ও শালা মড়ার মতো শুয়ে-শুয়ে ঐরকম ক'রেই ধ্যান করে।'

নিঃশব্দে আমরা শুনে যাচ্ছি। ঘড়িতে ক্রমশঃ তিনটে বাজ্‌লো। আমরা ওঠার উপক্রম করছি দেখে স্বামীজী মহারাজ বল্লেন্‌ ঃ 'আরে এসেছ যখন আরো কিছুক্ষণ না হয় বস্‌লে। ঘুম তো মাটি হয়েছেই, সুতরাং ঘুমের জন্যে আর ভেবে লাভ কি।'

সত্যই তখন আমাদের চোখ ঢুলু-ঢুলু কর্‌ছিল। লজ্জার খাতিরে জোর ক'রে চোখের পাতা-দুটো কোন রকমে টানাটানি করছিলাম। তবে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলাম হাইতোলার ব্যাপারে।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'দ্যাখো, আধ্যাত্মিক-জীবনে ঠিক ঠিক উন্নতি না করলে সাধুজীবন নিয়ে আর কি হ'ল বলো। নিজেদের স্বার্থ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও খাওয়া-পরা

নিয়ে গতানুগতিকভাবে ধ্যান-জপ করলে কোন ফল হয় না। ব্যাগার-খাটার জন্য সাধুজীবন নয়। জীবনে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় চাই, বিবেক ও বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা চাই। স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে নিউ ইয়র্কে আমার এক সময়ে একবার আলোচনা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম ঃ 'মঠ-মিশন করলে, কিন্তু তার মধ্যে সবার জন্য অবারিত প্রবেশাধিকার রাখা কি ভাল? সত্যকার বিবেক-বৈরাগ্যবান ছেলে দরকার, নইলে যাকে-তাকে সাধু-সন্ন্যাসী করলে সঙেঘর পরিণাম বিশেষ ভাল হয় না'।[১] স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) শুনে বলেছিলেন ঃ 'কথাটা সত্য। তবে কি জানো, আমার উদ্দেশ্য হ'ল সকলকে জীবনে একটা chance (সুযোগ) দেওয়া। সুযোগ-সুবিধা পেলে একশোটার ভিতর থেকে একটাও ভাল হ'তে পারে। একথা পূর্বেও তোমাদের আমি বলেছি।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, সাধুজীবনের উদ্দেশ্য যখন ঈশ্বরলাভ করা, তখন সেই ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের উদ্দেশ্য সৎই হয়, সেজন্য তাঁরা ভাল আধার হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এতে chance-এর (সুযোগের) প্রশ্নই বা ওঠে কেন?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'সুযোগ-সুবিধা তো বটেই। সত্যকারের বিবেক-বৈরাগ্যবান ছেলেই বা ক'জন আসে! সকলেই তো আর ঈশ্বরলাভ করবো ব'লে আসে না। গোড়ার দিকে বেশ বিবেক-বৈরাগ্য ও ভক্তি-নিষ্ঠা নিয়ে এলো, তার পরই হয়তো আস্তে-আস্তে সেইসব কমে যেতে লাগলো। এরই জন্য সাধন-ভজন দরকার। ঠিকঠিকভাবে সাধন-ভজন করলে জীবনে chance (সুযোগ) আসে।

'সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন ঃ 'লক্ষের ঘুড়ি দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপাড়ি।' এর অর্থ কি জানো? গীতার সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বলেছেন—

'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।' (৭।৩)

'সহস্র-সহস্র মানুষের মধ্যে দু'একজন ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টারূপ সাধন-ভজন করে, আবার অসংখ্য যত্নবান সাধকদের মধ্যে দু'একজন যথার্থভাবে আমার তত্ত্ব ও স্বরূপ জানতে পারে।' তাই ইচ্ছা ও সাধন-ভজনরূপ যত্ন করলেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ তাই একটি সারকথা বলেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল-কিছুতেই আমি আছি। আমা-ছাড়া কোন-কিছু নাই।'

১। এই আলোচনা হয়েছিল শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ যখন বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে মঠ প্রতিষ্ঠা ক'রে দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যান (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে) তখন।

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥' (৭।৭)

'এই জ্ঞান যদি কারু থাকে, তবে সে ঈশ্বরকে না ভেবে ও না ডেকে থাক্‌তে পারে না। ঈশ্বর চৈতন্যরূপে সর্বত্র সকল বস্তুতে আছেন।

'তবে এটি বুঝার জন্য বোধশক্তিলাভকে chance বলতে পারো, আবার নাও বলতে পারো। বোধশক্তি ও বিবেক সকলের মধ্যে জাগে না,—তার অর্থ হ'ল ঈশ্বর আছেন ও তাঁকে লাভ করা যায়—এই প্রয়োজন সকলে অনুভব করে না। এই অনুভব করার জন্য সামর্থ্য ও সুযোগ পাওয়াকেও তুমি chance বলতে পারো, আবার নাও বলতে পারো।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, সাধন-ভজন বলতে ঠিকঠিক কি বুঝায়?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'ভাল প্রশ্নই করেছ, কেননা সাধন-ভজন বলতে বেশীর ভাগ লোকের ধারণা যে, ঠাকুর-ঘরে বা কোন নির্জন স্থানে ব'সে একটু জপ-ধ্যান করা। জপ-ধ্যান করা তো চাইই, কিন্তু জপ-ধ্যান কেমন ক'রে করতে হয় তাই তো অনেকে জানে না। গুরু বা আচার্য ব'লে দিলেই তা শোনে ও মানেই বা ক'জন? ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন, জপের অর্থ—যে মন্ত্র জপ করবে, তার অর্থ ভাবনা করবে ঃ 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'। এখানে অর্থ বল্‌তে meaning নয়, দেবতা। অর্থাৎ যাঁর নাম জপ করবে, তার নামীকে চিন্তা করা দরকার। মালায় বা করে (অঙ্গুলীতে) সংখ্যা রাখাটা বাইরের জিনিস, ওটাই সব-কিছু নয়, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের কাছে ইষ্টচিন্তা বা মন্ত্রের অর্থ-ভাবনা গৌণ হ'য়ে দাঁড়ায়, মুখ্য কাজ হয় করে বা অঙ্গুলিতে সংখ্যা রাখা ও মালা ঘোরানো। এর রহস্য গুরুর কাছ থেকে তাই জেনে নিতে হয়, নইলে জপই বলো ও ধ্যানই বলো—সবই ক্রমশ mechanical (কলের মতো উদ্দেশ্যহীন) হ'য়ে দাঁড়ায়।'

এ'কথা বলে স্বামীজী মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব থাক্‌লেন। প্রায় তিন-চার মিনিট পরে আমাদের দিকে লক্ষ্য ক'রে আবার বল্লেন ঃ 'ধ্যান কি আর অত সহজে হয়? ধ্যান হ'লে তো হয়েই গেল। সমাধির ঠিক পূর্ব-অবস্থার নাম ধ্যান,—অর্থাৎ ধ্যান জম্‌লে তবে সমাধি। নইলে তাড়াতাড়ি ক'রে আসনে ব'সে চোখ বুঁজ্‌লেই ধ্যান হয় না। সেইরকম ধ্যানের নাম হ'ল 'মর্কটধ্যান'। মর্কটধ্যানে গতানুগতিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বর থাকে, আন্তরিকতা থাকে না, লক্ষ্যও স্থির থাকে না। তাই জপ-ধ্যান করার সময়ে সাবধান হ'তে হয় মন যাতে আজে-বাজে অন্য বিষয় চিন্তা না করে। সাবধান হওয়ার জন্যই তো

জ্ঞানী-গুরুর নির্দেশ ও উপদেশ মান্‌তে হয়। সকলেরই তো আর ঠিকঠিক ধ্যান-জপ হয় না, বা সকলেই তো আর ঈশ্বরলাভ করে না! আমরা তাই সকলকে একটা chance (সুযোগ) দিই,—যদি কেউ নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে বিবেক বৈরাগ্যবান হ'তে পারে। বিবেক-বৈরাগ্য এলেই হ'য়ে গেল। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন ঃ 'অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ'। 'তন্নিরোধঃ' কিনা মনের বৃত্তির নিরোধ। নিরোধের অর্থ ভাষ্যকার ব্যাস বলেছেন 'সমাধিঃ' কিনা সংহত ও সম্পূর্ণ স্থির-বৃত্তিহীন-মন। বৃত্তি থাকে বলেই তো মন। সংকল্প-বিকল্পরূপ মনের কাজ বা চাঞ্চল্যের নাম বৃত্তি। বিবেক-বৈরাগ্য এলে মনের চাঞ্চল্য দূর হ'য়ে মন স্থির হয়। গীতায় আছে ঃ 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।' নিজের চেষ্টা ও সঙ্গে সঙ্গে গুরুর কৃপা না হ'লে বৈরাগ্য আসে না। তাই সে'কথাই আবার বলি—

'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততাম্ অপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।' (৭।৩)

'হাজার-হাজারের ভিতর কেউ সিদ্ধিলাভের বা ঈশ্বরকে দর্শনের জন্য ইচ্ছা ও যত্ন করে, আবার যত্ন ও চেষ্টা করছে একান্ত মন নিয়ে এই রকম হাজার-হাজার লোকের মধ্যে হয়তো একজন যথার্থভাবে সিদ্ধিলাভ করে ও ঈশ্বরকে দর্শন ক'রে ধন্য হয়। তাও হাজারের মধ্যে যে একজনই সিদ্ধিলাভ করবে এমনও কোন নিশ্চয়তা নেই।

'এখানে ধ্যান-সম্বন্ধে তোমাদের আরও কিছু বলা দরকার। ধ্যান সহজে হয় না। এজন্য পতঞ্জলি রাজযোগে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলেছেন। তবে অদ্বৈতবেদান্তে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা আছে। যোগসাধনার প্রথমে ধারণা অভ্যাস করতে হয়। ধারণার অর্থ ধারণ করা। কোন চিন্তার বিষয়কে বারবার repeatedly চিন্তার অভ্যাস করতে হয়। এরই নাম অভ্যাসযোগ। বারবার চিন্তার বিষয়বস্তু ধরে রাখার অভ্যাস করলে যে একটা সংস্কার সৃষ্টি হয় সেই সংস্কারের জন্য মনে স্থিরতা আসে। একটি মাত্র বিষয়ে মন তখন ডুবে যায়। এই একমুখী ধারাবাহিক-নিস্তরঙ্গ-স্থির-মনের অবস্থার নাম ধ্যান। ধ্যানের রূপ নিবাতনিষ্কম্প-স্থির-অবস্থা। তাই এতই স্থির মন তখন হয় যে, একটি আলপিন পড়্‌লে বজ্রাঘাতের মতো শব্দ অনুভূত হয়। এই রকম মনের অবস্থা বা ধ্যানের পরই সমাধি। তাও সমাধি দু'রকম ঃ সবিকল্প ও নির্বিকল্প। পাতঞ্জলদর্শন এদেরকে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ ও নির্বীজ-সমাধি বলেছে। সবীজ-সমাধিতে বীজ কিনা একটু 'অহং'-অভিমানবৃত্তি থাকে। তাতে

যোগী আবার ইন্দ্রিয়ের জগতে নেমে আস্‌তে পারেন। এই নেমে আসার নাম ব্যুত্থান। আবার ব্যুত্থান-অবস্থা থেকে সমাধির অবস্থায় যাওয়ার নাম উত্থান। পাতঞ্জলদর্শনে এই সব নিয়ে আলোচনা আছে।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার কি কোন direct method (সোজাসুজি উপায়) নাই?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'Direct method বলতে made easy (সহজ) পন্থা? দেখ বাপু, সিদ্ধিলাভ করার কোন direct বা indirect (সোজা বা বাঁকা) পথ নেই। সকল সাধনাই direct (সোজা), আবার indirect (বাঁকা)। নিষ্ঠা, আকুলতা ও ঐকান্তিকতাই আসল। যেকোন সাধন মন-মুখ এক ক'রে যদি আন্তরিকতার সঙ্গে আচরণ করো তা-ই সিদ্ধিলাভ করার পক্ষে direct method (সোজা-উপায়), আর লোকদেখানো বা ফাঁকি দেওয়ার মতলব নিয়ে করলে direct (সোজা) পথও indirect (বাঁকা) হ'য়ে দাঁড়ায়।

'আসলে যেকোন সাধনই করো না কেন, তার সম্বন্ধে তোমার পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার,—যাকে বলে clear conception (স্বচ্ছ-ধারণা)। সিদ্ধিলাভের জন্য সাধন করছ,—অথচ কেন করছ ও করার উদ্দেশ্য কি তাদের সম্বন্ধে তোমার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই, daily routine (দৈনন্দিন ধারা)-অনুযায়ী কিন্তু করে যাচ্ছো,—এটা ঠিক নয়। তাই সাধন-ভজনে clarity of thoughts,—অর্থাৎ clear conception about the aim and object of concentration and meditation (ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে চিন্তার স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্ট ধারণা, অর্থাৎ তাদের লক্ষ্য ও পাওয়ার বিষয়-সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা) থাকা চাই, নইলে পূর্বেই বলেছি যে, সাধন-ভজনও কার্যতঃ stereotyped (গতানুগতিক) ও mechanical (যন্ত্রচালিতের মতো গতানুগতিক) হ'য়ে দাঁড়ায়।

'শ্রীশ্রীঠাকুর বল্‌তেন ঃ 'যার পেটে যা সয়।' সকল ধর্ম ও সকল সাধনপথই সত্য। সত্য বল্‌তে direct (সোজা), সুতরাং indirect বা পরোক্ষ কোনটাই নয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের জীবন দিয়ে দেখালেন—'যত মত তত পথ, কিন্তু লক্ষ্য এক।' সকল পথ অর্থাৎ সকল রকম সাধন-ভজনই লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়, তবে যেটা তোমার সুবিধাজনক ও সহজসাধ্য সেটাই তোমার পক্ষে direct বা সোজা, অপরের পক্ষে হয়তো সেটা indirect বা সোজা নাও হ'তে পারে। পথ বা সাধনপ্রণালী তো অসংখ্য, তাই যেকোন একটা সাধনপথ বেছে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। রাজযোগের ধারণা-ধ্যান-সমাধির সাধন, কর্মযোগ,

ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ বা আত্মতত্ত্ববিচার এ'সবই সাধনপথ বা উপায়, আবার অভিমত বা সাধন-পথ-সম্বন্ধে মতবাদও বটে। তাই আসনে বসে প্রাণায়াম ও ধ্যান-জপ করাটাই একমাত্র লক্ষ্য নয়। ঈশ্বরের সেবার, অর্থাৎ পূজার ভাব নিয়ে (with spirit of worship) কাজ করা, অন্তরের টান দিয়ে ভক্তি করা ও সদসদ্‌বিচার করাটাও সাধন। যেকোন অবস্থায় যেকোন ভাব নিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়, আসলে আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য চেষ্টা করার নামই সাধনা ও অভ্যাস।'

আমরা ঃ 'কেউ সাধন-ভজন ক'রে যাচ্ছে—বিরাম নেই, কিন্তু কেমন ক'রে বুঝ্‌বো যে সে কখন্ সিদ্ধি লাভ করবে?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'তাতে আর বোঝাবুঝি কি। বুঝ্‌বেই বা কে, আর বোঝাবেই বা কাকে? বুঝ্‌বে যা দিয়ে, তাই তো তুমি। You cannot get behind consciousness (তুমি জ্ঞানের বাইরে বা জ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারো না), জ্ঞানকে জ্ঞান দিয়েই বুঝ্‌বে বা লাভ করবে। জ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে বা বাদ দিয়ে কোনদিনই জ্ঞান লাভ করতে পারবে না। তিনি (ব্রহ্ম বা ঈশ্বর) জ্ঞানস্বরূপ। তুমিও তাই। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ। জ্ঞান তার প্রকাশের জন্য অন্য কিছুর সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। আলোকে জানার জন্য আর আলোর দরকার হয় না। তাই সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, কবে জ্ঞান লাভ করবে এ'রকম ক'রে খতিয়ে দেখ্‌তে নেই। সাধন-ভজন তো আর আলু-বেগুনের ব্যবসা নয় যে, খতিয়ে দেখ্‌বে লাভ হ'ল—কি লোকসান হ'ল? সাধন-ভজনের বেলায় লাভ-লোকসান যদি হয় তা একমাত্র সাধকের নিজের গুণের বা দোষের জন্য হয়। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়ই হবে, আর লোকদেখানো জপ-ধ্যান করো তো নিজে ফাঁকিতে পড়্‌বে। তাই সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, আর চিন্তা করতে হয় কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে করছ, কতটুকু তোমার মন উদার ও সংস্কারমুক্ত হয়েছে, পরের দোষদর্শন না ক'রে কতটুকু সকলের গুণদর্শনের দিকে তোমার দৃষ্টি যাচ্ছে, নিজেকে যেমন ভালবাস তেমনি কতটুকু অপর সকলকে তুমি ভালবাস, কতটুকু স্বার্থবুদ্ধি ও সংকীর্ণতা তোমার ভিতর থেকে দূর হ'য়ে গেছে—এই সব। এগুলোই তো খতিয়ে দেখার ও বিচার করার জিনিস, নইলে সাধন-ভজনও করছ, আর মনের মধ্যে কুসংস্কারগুলোকে জাগিয়ে রাখছ, এতে কিছু হবে না। তাই সাধন-ভজন করার সময়ে একান্তই যদি জান্‌তে চাও কবে তোমার সিদ্ধি লাভ হবে, তাহলে একথাই মনে রাখ্‌বে যে, মনের সকল সংস্কাররূপ অজ্ঞান যে'দিন দূর হবে, সে'দিনই তোমার সিদ্ধি লাভ হবে। মনে

সঙ্কীর্ণতা থাক্‌বে আর ঈশ্বর লাভ করবে—এ'কখনও হয় না।

'শঙ্করাচার্য ঠিক এ'ধরনের কথাই বলেছেন যে, জ্ঞানলাভ করার অর্থ অজ্ঞান দূর করা। আলোর প্রকাশ চিরকালই আছে, অজ্ঞানরূপ আবরণের জন্যই অন্ধকার। তাই অন্ধকার দূর করার জন্য যেমন আলোর দরকার, অজ্ঞান দূর করার জন্য তেম্‌নি আত্মতত্ত্ববিচার দরকার। ব্রহ্মজ্ঞান সর্বদাই আছে ও তা' স্বপ্রকাশ, সুতরাং তাকে সাধন-ভজন দিয়ে আর কি লাভ করবে বলো। যা নেই তাকে পাওয়ার জন্যই চেষ্টা ও সাধনা, কিন্তু যা সর্বদাই আছে তাকে পাওয়ার জন্য কি আর চেষ্টা করবে বলো। অজ্ঞাননাশের সঙ্গে-সঙ্গেই জ্ঞানের প্রকাশ হয়।'

আমরা ঃ 'মহারাজ দেবদেবীদের পূজা-অর্চনা কি সাধন-ভজনের মধ্যে পড়ে?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'পড়ে বৈকি! দেবদেবীদের পূজা করার অর্থ তাঁরা শক্তি ও মহিমায় আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাঁদের প্রসন্নতা ও আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তাঁদের পূজা-অর্চনা বলতে তাঁদের কাছে আত্মনিবেদন করা প্রয়োজন।

'বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল। যাগযজ্ঞও এক রকমের নয়, বৈদিকযজ্ঞ, শ্রৌতযজ্ঞ, পশুযজ্ঞ, পুরুষমেধযজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ নানান্‌ রকমের। সোমযোগ তাদের মধ্যে প্রধান। সোমযোগে বা যজ্ঞে সোমরস আহুতি দেওয়া হ'ত ঘৃতাহুতির সঙ্গে। সোমযোগে সামগান হ'ত। সামগান বলতে বৈদিক-সামসঙ্গীত। স্তোত্রপাঠও হ'ত, আবার মন্ত্র গানও হ'ত। পাঠ ও গান একরকম নয়! গানে বা সামগানে পাঁচটি, ছ'টি বা সাতটিও বৈদিক-স্বরের সংযোগে সামগান করা হ'ত। সামগানে বৈদিক দেবতারা সন্তুষ্ট হতেন। অধ্বর্যু-ব্রাহ্মণেরা যেমন যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন, তেম্‌নি সামগ-ব্রাহ্মণেরা সামগান করতেন। চারজন চারজন ক'রে ষোলজন ব্রাহ্মণ সোমযোগে যোগদান করতেন। ঐ ব্রাহ্মণদের যিনি প্রধান তাঁকে বলা হ'ত ব্রহ্মা। তিনি সকলকিছুর তত্ত্বাবধান বা তদারক করতেন। যাগযজ্ঞগুলি সকাম বলতে স্বর্গকামনা ক'রে অনুষ্ঠান করা হ'ত। উপনিষদের যুগে নিষ্কাম-উপাসনা। তখন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ এলো। সুতরাং সাধন-ভজনে পূজানুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, এই সকল-কিছুর ধারণা করা কঠিন। সকাম ও নিষ্কাম, পূজা ও উপাসনা...'।

স্বামীজী মহারাজ কথায় বাধা দিয়ে বল্লেন ঃ 'বোঝার কঠিনটা কোথায়? বৈদিক-যুগের গোড়ার দিকে সকাম-যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ছিল। ধীরে ধীরে ক্রমে বুদ্ধি ও বিচারর যুগে মানুষ বুঝ্‌লো যে, কর্মের ফল স্বর্গলাভে মুক্তি নাই, তাতে

সংসার-বন্ধন থেকে রেহাই নাই, সুতরাং তারা ক্রমে নিষ্কামকর্মে ও উপাসনায়, ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত হ'ল। ভোগে শান্তি কোথা?—ত্যাগেই শান্তি। তাই নিবৃত্তির পথে তখন মানুষ চল্‌তে লাগ্‌লো। সকল-কিছু শক্ত বা কঠিন তো বটেই, সহজ আর কোন্ জিনিষটা বলো? একমাত্র ফাঁকি দেওয়াটাই সহজ ; নইলে মন ও মুখ এক ক'রে কাজ করা ভাল। কি জানো, এ'সবের ঠিকঠিক ধারণা ক'রতে গেলে চাবিকাটি দরকার।'

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী মহারাজের ভিতর একটু যেন ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। তিনি ক্যামন একটু গম্ভীর ও আনমনা হ'লেন। গভীর রাত্রের নীরবতায় তখন চারদিক বেশ থমথম করছিল। স্বামীজী মহারাজের গাম্ভীর্য ঘরের পরিবেশকে যেন আরো গম্ভীর ও নিস্তব্ধ ক'রে তুল্‌লো। আমরা সকলে নির্বাক ও নিস্তব্ধ। দু'তিন মিনিট সে'ভাবেই কাটলো। তারপর আমাদেরই একজন ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কর্‌লো ঃ 'চাবিকাটির কথা যে বল্‌ছেন, চাবিকাটি কি মহারাজ?' এই চাবিকাটির কথা স্বামীজী মহারাজ পূর্বেও দু'একবার বলেছেন। তিনি আনমনাভাবে বল্লেন ঃ 'হাঁ, চাবিকাটি। অধ্যাত্মজীবনের রহস্যভেদ করতে গেলে এই চাবিকাটি না হ'লে হয় না।'

তাঁকে পুনরায় অন্যমনস্ক দেখে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'ল না, কেবল আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগ্‌লাম 'চাবিকাটি'-কথাটার অর্থ কি। কথার ভিতর নিশ্চয়ই কোন গভীর রহস্য লুকানো আছে। নানান্ চিন্তার আলোড়নে আমাদের ঘুমের নেশা তখন সম্পূর্ণ কেটে গেছে। ভাব্‌লাম স্বামীজী মহারাজ বোধহয় এতদিন কোন নূতন সাধনার কৌশল গোপন রেখেছিলেন, আজ তার সন্ধান দেবেন। সে'কথা জানার আকুলতায় কিন্তু আমরা অস্থির, অথচ কারু মধ্যে কোন জিজ্ঞাসা করার তখন সাহস ছিল না। আমাদের মনের উপর দিয়ে ভেসে চল্‌ছিল যেন যুগ-যুগান্তের কত ধারণার স্রোত,—কত অতীতের স্মৃতি!

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী মহারাজ নিজেই মৌন-নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বল্লেন ঃ 'বুঝ্‌লে—চাবিকাটি কাকে বলে?'

আমরা ঃ 'কিছুই বুঝ্‌লাম না মহারাজ।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'ঐকান্তিকতা, একনিষ্ঠা, ভক্তি-বিশ্বাস-ব্যাকুলতা এ'গুলোই চাবিকাটি। উদ্দেশ্যের প্রতি মনের one-pointed (একমুখী) বৃত্তি থাকা চাই। তোমার মন কেবল ইষ্টকেই চাইবে, দুনিয়ার আর-কিছু চাইবে না। পার্থিব সকল-কিছু পড়ে থাক্‌বে মনের বাইরে, তোমার মন থাক্‌বে কিন্তু

আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে। মনের তাই তখন আর পৃথক অস্তিত্ব থাক্‌বে না। মনকে এই আত্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মাবগাহী করার কৌশল জানার নাম চাবিকাটি। 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বরেণ্যম্',—আত্মা হৃদয়-গুহায় বদ্ধ কিনা হৃদয়ে লুকিয়ে আছেন। সেই গুহার দরজা খুলতে গেলে এই চাবিকাটি চাই। রুমীর মসনবীতে একটা গল্প আছে বলি শোন।

'একজন সুফী তার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে দরজায় আঘাত কর্‌লে। বন্ধু তার ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে : 'Who is there ? (বাইরে কে?)। সুফী বন্ধু বল্লে : 'I am' (আমি তোমার বন্ধু)। বন্ধু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে : Begone, at my table there is no place for the two' (যাও বন্ধু, আমার টেবিলে দু'জনের স্থান হবে না)। সুফী-বন্ধু তখন মনে গভীর দুঃখ নিয়ে ফির্‌তে বাধ্য হ'ল, বিরহের আগুন তার হৃদয়কে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। সে তাই ফির্‌লো। ভয় ও শ্রদ্ধা নিয়ে তার বন্ধুর দ্বারে এসে আবার আঘাত কর্‌লে। ভিতর থেকে পূর্বের মতোই উত্তর এলো : 'Who is there ?' (বাইরে কে?)। এবার সুফী-বন্ধু উত্তর দিলে : 'Thou beloved, thou' (হে প্রিয়তম, তুমি)। তখন দরজা খুলে গেল ও তার বন্ধু বল্লে : 'Since thou art I, come in, there is no room for two 'I's in this room' (তোমার আমিত্ব যখন ঘুচে গেছে তখন ভিতরে এসো, কেননা আমার ঘরে দু'জন আমির স্থান নেই)।[২]

'দেখ, there is no room for two 'I's,—ভগবানের রাজ্যে যেতে গেলে আমিত্ব অর্থাৎ ভগবান থেকে তোমার সত্তা পৃথক এই বোধ থাক্‌লে চল্‌বে না। আমিত্বই অহংকার ও অজ্ঞান। অন্ধকার থাক্‌লে যেমন আলো থাকে না, অজ্ঞান থাক্‌লে তেম্‌নি জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। জ্ঞান তখন অভিভূত হ'য়ে থাকে, ঢাকা থাকে। জ্ঞানের প্রকাশের জন্য তাই অজ্ঞান দূর করতে হয়। অজ্ঞানই আবরণ। তাই আবরণ না চলে গেলে আলোর প্রকাশ হয় না। তার জন্য চাই সদসদ্‌বিচার। নিজের সুখ, নিজে স্বাচ্ছন্দ্য, নি্জের ভোগের ইচ্ছা এই সব ত্যাগ না করলে আমিত্ব বা অহংকার দূর হয় না, আর আমিত্ব বা অহং থাকা পর্যন্ত যত ধ্যান-জপই করো, যত শাস্ত্রই পড়, সব ভস্মে ঘি ঢালার মতো হয়। Full resignation to the will of God (ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়)। বল্‌বে : 'Thy Will be done, not mine' (হে ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমার নয়)। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের

২। গল্পটি 'মস্‌নবী-র ১ম ভাগে ৩০৫৬ সংখ্যক কবিতায় (Book I, Verse 3056) বর্ণিত আছে। অধ্যাপক নিকোলসন্ (Prof. R. A. Nicholson) তাঁর *Tales of Mystic Meaning*-গ্রন্থে (পৃঃ ১৩৮) মস্‌নবীর এই গল্পটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন।

পরমসখা হ'লেও যতক্ষণ না 'শিষ্যস্তেঽহম' বলে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছিল, ততক্ষণ-পর্যন্ত অর্জুনের অজ্ঞান যায় নি। আত্মসমর্পণ করা ও আত্মাভিমান ত্যাগ করা এককথা। এ'সব অভ্যাস করতে হয়, নইলে কেবল বেদান্ত-বিচার কর্‌লে পাণ্ডিত্য বাড়ে, কিন্তু আত্মানুভূতি হয় না।

'আরো একটা মজার গল্প বলি শোন। শ্রীশ্রীঠাকুরও এই গল্পটা খুব বল্‌তেন। বৃন্দাবনে গোপীদের মনে একবার ভারি অভিমান হ'ল যে, শ্রীকৃষ্ণ নাকি শ্রীরাধাকে বেশী ভালবাসেন, তাদের ততো ভালবাসেন না। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তা' জান্‌তে পার্‌লেন। তিনি একবার অসুখের ভাণ কর্‌লেন। কঠিন অসুখ বাঁচার আশা খুবই কম। গোপীরা ভেবে আকুল শ্রীকৃষ্ণকে কি ক'রে বাঁচানো যায়। ডাক্তার-বৈদ্য এলো, সবাই হার মান্‌লে, উপায় কি! চতুর-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—'এ অসুখ আর সার্‌বে না'। গোপীরা তখন কেঁদেই আকুল। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—'হ্যাঁ, তবে একটা উপায় আছে'। গোপীরা বল্লে,—'কি?' শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—'তোমাদের কারু পায়ের একটু ধূলো যদি আমার মাথায় দাও তবেই অসুখ সার্‌তে পারে, নচেৎ নয়'। গোপীরা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে বল্লে—'তাও কি কখনো হয়? কৃষ্ণ, তুমি বাঁচো আর নাই বাঁচো, আমরা কিন্তু কেউই তোমার মাথায় পায়ের ধূলো দিতে পার্‌বো না'। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—'তা হ'লে আর কোন উপায় নাই।' শ্রীরাধা ছিলেন কাছে, তিনি শুনে বল্লেন—'সে কি! এই কথা?' তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের পায়ের ধূলো নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাথায় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাল হ'য়ে গেলেন। গোপীরা দেখে অবাক্‌। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—'কি গো গোপীরা, বুঝ্‌লে তো—কেন রাধাকে আমি বেশী ভালবাসি?' গোপীরা বুঝে লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইলো। এরই নাম আত্মসমর্পণে আত্মভোলা। আত্মভোলা কিনা অহংকার ও ভেদভাবের বিসর্জন। অভেদজ্ঞান না হ'লে আত্মভোলা ও আত্মজ্ঞান হয় না।

'গল্পটার ভিতর কি গভীর অর্থ আছে বলো দেখিনি? তোমরা হয়তো খুঁজবে যে, এ'গল্প সত্যই শ্রীমদ্ভাগবতে আছে কি-না। শ্রীশ্রীঠাকুর শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ' গল্পটি বল্‌তেন। দুই-দুই ভাব থাক্‌লে অভেদজ্ঞানরূপ আত্মজ্ঞান হয় না। শ্রীরাধা নিজের পৃথক সত্তা ভুলে গিছ্‌লেন, শ্রীকৃষ্ণই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান ও জীবন! এরই নাম শুদ্ধপ্রেম। অনন্যাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান এককথা। শ্রীকৃষ্ণ না বাঁচ্‌লে শ্রীরাধার জীবন বাঁচে না। শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তি কিনা,—শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্না। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মধ্যে সকল ভেদভাব একেবারে দূর হ'য়ে গেছে। প্রত্যেক সাধকদের পক্ষেও তাই! শ্রীরাধার মতো

ভগবানের প্রতি আত্মভোলা ভাব ও ভালবাসা চাই। নিজের 'আমি-ভাব মরে গিয়ে সব 'তুমিময়' (আত্মাময়) না হ'লে ঈশ্বরদর্শন হয় না। ঈশ্বরের জন্য এ'রকম আকুলতা ও আত্মভোলা ভাব চাই।'

আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুন্‌ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে বল্লাম ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমাদের রকমখানা দেখে স্বামীজী মহারাজ মৃদু-মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌লেন ও বল্লেন ঃ 'শুধু আজ্ঞে হ্যাঁ নয়, জীবনে কিছু করা চাই। 'নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ' এই ভাব না এলে জীবনে কি আর কর্‌লে বলো?' আমরা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকালাম। দেখ্‌লাম অন্ধকারে ঢাকা পাহাড়ের (দার্জিলিঙে) গায়ে নীচের বস্তিগুলিতে কোথাও কোথাও দু'একটি আলো তখনও মিটিমিটি ক'রে জ্বল্‌ছে। অবশ্য সহরময় বিজ্‌লি-আলোর ঔজ্জ্বল্য তখনও অটুট ছিল। স্বামীজী মহারাজ সহাস্যে বল্লেন ঃ 'কি বাবা, ঘুমকে আজ হজম ক'রে ফেলেছ দেখ্‌ছি। বেশ বেশ,—'তোর ঘুম তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি'। এ'রকমটাই চাই। কি বলো? ঘুম যখন জয় করেছ, তখন কথার পালা এখুনি শেষ ক'রে লাভ কি?'

আমরা বল্লাম ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'প্রথম জীবনের সকল কথা বলতে এখন বেশ ভাললাগে। ছেলেবেলা থেকে যোগশিক্ষা করবো এই ছিল একান্ত ইচ্ছা। কলেজ ষ্ট্রীটের উপরে এলবার্ট-হল্‌ ছিল। ওখানে পূর্বে একটা ছোট-ধরনের এলবার্ট হল্‌ ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ওখানে ব্রাহ্মসমাজের (নববিধান) একটা স্কুল (আলবার্ট-ইনষ্টিটিউসন) করেছিলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এলবার্ট-হলের ঐ স্কুলে তখন সাংখ্যদর্শনের 'ক্রমবিকাশ' ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের *'Evolution Theory'* (ক্রম-বিকাশবাদ) এই দু'টি বিষয় নিয়ে তুলনামূলকভাবে বক্তৃতা কর্‌তেন। কলকাতার শিক্ষিত হিন্দুদের ভিতর বেশ তখন একটা সাড়া পড়ে গিছ্‌লো। একদিনের কথা! বঙ্কিমবাবু (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) একটি আলোচনাসভার সভাপতি ছিলেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় সভার সাংখ্যদর্শনের উপর বক্তৃতা শেষ ক'রে পাতঞ্জলদর্শনের আলোচনা শুরু করলেন। তাঁর ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হ'ত। তাঁর মুখে সে'দিন পাতঞ্জলযোগদর্শনের ব্যাখ্যা শুনে আমার মনে যোগাভ্যাস করার ইচ্ছা আরও প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো। পাতঞ্জলদর্শনের বই কিনে পড়ার ইচ্ছাও সঙ্গে সঙ্গে জাগ্‌লো। জলখাবারের পয়সা জমিয়ে একখানা পাতঞ্জলদর্শন কিন্‌লাম। কিন্তু পড়াবে কে? মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভবম্‌, অভিজ্ঞানকুন্তলম্‌, ভট্টিকাব্য, ছন্দোমঞ্জরী এ'সব বই পূর্বেই পড়েছিলাম। কিন্তু

সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞান দিয়ে তো আর পাতঞ্জলদর্শনের মতো বই বোঝা যায় না! কাজেই মনে মনে ঠিক কর্‌লাম তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কাছে গিয়ে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা জানাবো।

'তর্কচূড়ামণি মহাশয় তখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর উপরতলায় ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে থাক্‌তেন। ঠিকানা নিয়ে একদিন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তর্কচূড়ামণি মহাশয় আমার সব কথা আগ্রহ সহকারে শুন্‌লেন, যথেষ্ট যত্ন করলেন, আমার আগ্রহের প্রশংসাও করলেন। তিনি বল্লেন ঃ 'বাবা, আমার তো এক মুহূর্তও অবসর নেই যে তোমায় পড়াই। আজকাল আবার নানান্ জায়গায় নানান্ বক্তৃতা দেওয়া নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত থাকি। তবে কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কাছে যদি যেতে পারো, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় পড়াবেন। তোমাকে আমিই পাঠাচ্ছি—এইকথা তাঁকে বল্‌বে। তিনি একজন বেশ বড় পণ্ডিত।'

'অগত্যা তথাস্তু ব'লে ঠিকানা নিয়ে তখনই কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা বলাতে তিনি বল্লেন ঃ 'বাবা, আমারও সময় অত্যন্ত কম। তবে এখন আমি পাতঞ্জলদর্শনের বাংলা-অনুবাদ করছি। তুমি সকাল আটটা-নটার সময়ে আস্‌বে, আমার সেবক তখন গায়ে তেল মাখিয়ে দেবে, আমি সেই সময়েই তোমায় সূত্রের অর্থ বলে দিতে পার্‌বো।' আমি তাতেই রাজী হ'য়ে তাঁর কাছে পড়া আরম্ভ ক'রে দিলাম।

'পাতঞ্জলদর্শন শেষ ক'রে নিজেই গীতা পড়্‌লাম। কিন্তু যোগশিক্ষা করার ইচ্ছা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগ্‌লো। একখানা 'শিবসংহিতা' কিনে পড়্‌লাম। হঠযোগ-প্রদীপিকায় ও কুণ্ডলিনীযোগে প্রাণায়াম ও রাজযোগের সকল রকম সাধনপ্রণালী দেওয়া আছে, কিন্তু শুধুই পড়া নিয়ে তখন আর প্রাণে শান্তি পেলাম না, হাতেনাতে যোগসাধন করার বাসনাই আমাকে পাগল ক'রে তুল্‌লো। খেচরীমুদ্রা[৩] অভ্যাস ক'রে সমাধিতে বুঁদ হ'য়ে থাক্‌বো—এই ইচ্ছা তখন মনের মধ্যে প্রবল হ'য়ে উঠলো।

'কিন্তু শিক্ষাগুরু চাই। গুরুই বা পাবো কোথায়? আমার বাবার মুখে শুনেছিলাম একজন হঠযোগীর কথা। হঠযোগী ছিল সুন্দরবনের জঙ্গলে। খিদিরপুরে ভূকৈলাসের রাজকর্মচারীরা তাঁকে সমাধিস্থ অবস্থায় ভূকৈলাসে

৩। হঠযোগ সাধনায় খেচরীমুদ্রার বিবরণ আছে। খেচরীমুদ্রায় তালুতে জিহ্বা লাগিয়ে সমাধিস্থ হবো এই তখন ইচ্ছা।

নিয়ে আসে। যোগী তাঁর জিহ্বাটা টাক্‌রায় উল্টে দিয়ে সমাধিস্থ ছিল। তখন আমি শুনে দিনকতক পদ্মাসন ক'রে বসে জিহ্বাটা ওল্টানোর চেষ্টা করেছিলাম। বাড়ীর সকলকে সে'কথা বল্‌তামও। শুনে সবাই হাস্‌তো, ঠাট্টাও করতো।

'কিন্তু আমার মনের তীব্র-ব্যাকুলতা অন্যে কি ক'রে বুঝ্‌বে বলো? ঘটনাচক্রে আমার ছেলেবেলার সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর (যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য) একদিন বল্লে ঃ 'ভাই, দক্ষিণেশ্বরে একজন অদ্ভুত পরমহংস-যোগী আছেন, রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে তিনি থাকেন। লোকে তাঁকে বলে পাগল, কিন্তু আসলে তিনি একজন মহাযোগী। অনেক বড়-বড় লোক কলকাতা থেকে তাঁকে দেখ্‌তে যান। তুমি তাঁর কাছে যেতে পারো, তিনি তোমায় যোগ শেখাতে পারেন।' শুনে আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। মনের কথা তার কাছে কিছু গোপন করতে পার্‌লাম না। তাই আমার যোগশিক্ষার ইচ্ছা যজ্ঞেশ্বরকে খুলে বল্লাম। সে শুনে বল্লে ঃ 'বেশতো, আমি তোমায় একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবো।' আমার মনের ভিতর সে'দিন কি যে আনন্দ হয়েছিল তা' আর কি বল্‌বো।

'দক্ষিণেশ্বরের যোগী পরমহংসকে দেখার ইচ্ছা আমার তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠ্‌লো। যজ্ঞেশ্বর থাক্‌তো বাগবাজারে রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে, কিন্তু তার বাড়ীর নম্বর (৫৭ নং) আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করলাম দক্ষিণেশ্বরের কথা। দেখ্‌লাম তিনি বিশেষ কিছু জান্‌তেন না। কাজেই একদিন রবিবার সকালে বেরিয়ে পড়্‌লাম কাকেও কিছু না ব'লে। চিৎপুর-রোড হ'য়ে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বাগবাজারে পৌঁছুলাম। রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের এ'ধার থেকে ও'ধার পর্যন্ত খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের বাড়ীর কোন হদিস্‌ করতে পার্‌লাম না। তখন মন একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌লো। পরিশেষে ঠিক করলাম নিজেই জিজ্ঞাসা করতে করতে দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হবো।

'করলামও তাই। বাগবাজার পোলের উপর দিয়ে বারাকপুর-ট্রাঙ্ক-রোড ধ'রে সোজা চল্‌তে লাগ্‌লাম দক্ষিণেশ্বরের দিকে। মাথার উপর কাঠফাটা রোদ্দুর। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। বহুক্ষণ চলার পর একজনকে দেখ্‌তে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম রাণী রাসমণির কালীবাড়ী কতদূর? লোকটি আমায় গঙ্গার ধার দিয়ে সোজা হেঁটে যেতে বল্লে। অগত্যা তাই করলাম। অবশেষে ঘুরতে-ঘুরতে আড়িয়াদহগ্রামে হাজির হলাম। সেখানে জিজ্ঞাসা করতে একজন আমায় পথ দেখিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ চলার পর কালীবাড়ীর উত্তর দিকের গেটের (Gate) ধারে হাজির হলাম। বেলতলা ও পঞ্চবটীর পাশ দিয়ে কালীমন্দিরে গেলাম। খালি পা। অতো সুদীর্ঘ-পথ চলা জীবনে আমার সেই প্রথম। একজন কর্মচারীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম পরমহংস মহাশয়ের কথা। সেই লোকটি

পরমহংস-মহাশয়ের ঘরটা দেখিয়ে বল্লে ঃ 'তিনি থাকেন ওই ঘরটায়। আজ কলকাতায় গেছেন।' এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লাম ঘরে চাবি দেওয়া। আশা ছিল দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পরমহংস-মহাশয়কে দেখ্‌তে পাবো, কিন্তু তিনি নাই দেখে একটা সিঁড়ির উপর হতাশ হ'য়ে ব'সে পড়্‌লাম। দারুণ পিপাসায় ও ক্ষুধায় আমার সর্বশরীর তখন অবসন্ন। হাতে একটাও পয়সা নেই। কি করবো ঠিক করতে পারলাম না। দুঃখে চোখে জল এলো!

'তারপর দেখি একটি যুবক, হাতে ছাতা, গেট দিয়ে প্রবেশ ক'রে আমার দিকে আসতে লাগ্‌লো। আমিও তার দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে ছিলাম। যুবক আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে ঃ 'পরমহংসদেব আছেন?' আমি বল্লাম ঃ 'না তিনি কলকাতায় গেছেন।' যুবকও একটু হতাশ হ'য়ে আমার পাশে এসে বস্‌লো। দু'জনের মধ্যে তখন কিছুক্ষণ আলাপ হ'ল। আমার সঙ্গে পরমহংস মহাশয়ের দেখা হ'ল না, বাড়ী ফিরতে হবে শুনে সে আমায় আশ্বাস দিয়ে বল্লো ঃ 'সে কি, ফিরবে কেন? এসেছ যখন, দেখা ক'রে তবে যাবে।' আমি বল্লাম ঃ 'বাড়িতে কাকেও ব'লে আসিনি, সকলে যে চিন্তা করবে।' যুবক বল্লে ঃ 'আমিও তাই। বাপ-মাকে না ব'লে পায়ে হেঁটে সোজা কলকাতা থেকে আস্‌ছি। বাপ-মা একদিন একটু ভাব্‌লে তো আর কি হলো! গঙ্গায় স্নান-টান সেরে মা-কালীর প্রসাদ পাবে চলো।

'কথায় কথায় যুবকের নাম জান্‌লাম শশিভূষণ চক্রবর্তী, কলকাতা আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে একটা গলিতে তার বাড়ী। যুবক তার পূর্বে আরো দু-একবার দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। পরমহংসদেবের ভাইপো রামলাল-দাদা ও পূজারীদের সঙ্গে তার বেশ আলাপ-পরিচয় ছিল, কাজেই স্নান-আহারের জন্য কোন অসুবিধা হলো না। যুবক খুঁজেপেতে একখানা কাপড় জোগাড় করলে। পালা করে সেই কাপড় প'রে দু'জনে গঙ্গায় স্নান কর্‌লাম। পরে মা-কালীর প্রসাদ পাওয়া গেল। মা-কালীর প্রসাদ লাভ আমার জীবনে সেই প্রথম!

'আহারের পর বিশ্রাম ক'রে কলকাতায় ফির্‌বো কিনা চিন্তা করতে লাগ্‌লাম। যুবক আমায় চিন্তিত দেখে বল্লে ঃ 'ভাবছ কি?' আমি বল্লাম ঃ 'বাড়ী ফিরবো কিনা ভাব্‌ছি।' যুবক বল্লে ঃ 'তাও কি কখনো হয়? বাপ-মা ভাব্‌বে—ভাবুক না। আজ একটু ভাব্‌বে, কাল আবার তোমাকে দেখ্‌লে আনন্দে সব ভুলে যাবে। তোমার মতো আমারও ঐ একদশা। আমিও বাপ-মাকে ব'লে কোনদিন আসিনি। আজ রাত্রিটা এখানে থাকো, রাত্রেই

পরমহংসদেব আস্‌বেন। তাঁকে দর্শন ক'রে কাল সকালে একসঙ্গে দু'জনে কলকাতা ফেরা যাবে।

'যুবকের কথা শুনে মনে বল এলো। শেষে ঠিকই করলাম—যা আছে কপালে, পরমহংসদেবকে দর্শন ক'রে তবে বাড়ী ফিরবো।

'ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। মা-কালীর মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো আমি যুবকের সঙ্গে গিয়ে মা-কালীর মন্দিরে আরতি দেখ্‌লাম। আরতি দেখে হৃদয় যেন এক অব্যক্ত ভাবে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল! আরতি শেষ হ'ল। আমরা পরমহংসদেবের ঘরের সাম্‌নে বারান্দায় বসে আবার বিশ্রাম করতে লাগ্‌লাম। শশিভূষণের সঙ্গে তখন বেশী রকমভাবেই আলাপ জমে উঠ্‌লো। ব্যথার ব্যথী হিসাবে পরস্পরের মধ্যে টানও হয়েছিল যথেষ্ট। দু'জনে নানান্ রকম আলোচনা ক'রে সময় কাটাতে লাগ্‌লাম, বাড়ীর কথা বিন্দু-বিসর্গ আর মনে ছিল না। কিছুক্ষণ পরে রামলাল-দাদা শীতলভোগের প্রসাদী-দু'খানা লুচি ও একটু চিনি এনে শশী ও আমাকে ভাগ ক'রে দিলেন। আমরা সেই প্রসাদী-লুচি চিনি দিয়ে খেয়ে একটা মাদুর বিছিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়্‌লাম। রামলাল-দাদা কাছেই ছিলেন। তারপর কি হ'ল শুন্‌লে তোমরা নিশ্চয়ই হাস্‌বে।

আমরা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ঃ 'কি মহারাজ?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'সেই সময়ের আমার মনের চিন্তার কথা! বারান্দায় শুতে-না-শুতেই শশী একেবারে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লো। রামলাল-দাদাও তাই। আমার চোখের পাতায় কিন্তু একটুও ঘুম এলো না, কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌লো পরমহংসদেবের কথা! ভাব্‌লাম জটাজুট-কৌপীনধারী, আপাদমস্তকে ভস্মমাখা, হাতে চিম্‌টে, রক্তচক্ষু এই রকম বোধহয় হবেন পরমহংস-মহাশয়। কত কথাই না তখন মনে হ'তে লাগ্‌লো পরমহংসদেব-সম্বন্ধে। চিম্‌টে হাতে নিয়ে তাড়া করার ভয়ও যে মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল না, তা' নয়। ভাব্‌লাম তাড়িয়েও তো তিনি দিতে পারেন। এম্‌নি নানান্ রকমের উদ্ভট চিন্তায় চোখে আর ঘুম এলো না, জেগে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতে অনেকক্ষণ কাট্‌লো। এমন সময়ে একটা গাড়ীর চাকার ঘড়্-ঘড়্-শব্দ শোনা গেল রামলাল-দাদা শুনেই ধড়্‌মড়িয়ে উঠে পড়্‌লেন। শশীও তাই। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। রামলাল-দাদা আমাদের বল্লেন ঃ 'এই পরমহংসদেব আস্‌ছেন।' কি জানি কেন, পরমহংসদেব আস্‌ছেন শুনে আমার হৃদয়ের ভিতরটা ভয়ে ক্যামন গুর-গুর ক'রে উঠ্‌লো। আমি পরমহংসদেবের প্রতীক্ষায় বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম।

'সকলেই নির্বাক। দেখ্‌লাম পরমহংসদেব গাড়ী থেকে নেমে উত্তর-ারান্দার সিঁড়ি দিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করার সময়ে গুরু-গম্ভীর স্বরে তিনবার ''লে উঠ্‌লেন—কালী, কালী, কালী। দক্ষিণেশ্বরের বিস্তৃত উঠান, বাগান ও ারিদিক তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠ্‌লো। ঘরে প্রবেশ ক'রে তিনি ছোট তক্তাপোষটির উপর বস্‌লেন। পিছনে একজন বালক-সেবক ার গামছা ও এলাচি প্রভৃতি মুখশুদ্ধির বটুয়াটি নিয়ে প্রবেশ করলো। পরে জনেছিলাম তার নাম লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), পশ্চিমদেশে (ছাপরায়) বাড়ী, ারমহংসদেবের সেবা করে। রামলাল-দাদা ও শশী ঘরে প্রবেশ ক'রে ারমহংসদেবকে প্রণাম করলে। আমি তখনো বারান্দার একপাশে জড়সড় হয়ে াড়িয়ে। রামলাল-দাদা আমার কথা পরমহংসদেবকে বল্লেন। পরমহংসদেব ়নে বল্লেন ঃ 'বেশ তো, নিয়ে এসো।' রামলাল-দাদা আমাকে ডেকে-নিয়ে গলেন। আমি ঘরে ঢুক্‌তেই তিনি আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌লেন। ামি তাঁর পা-দু'খানির উপর মাথা রেখে প্রণাম কর্‌লাম। হৃদয়ের সমস্ত ভয় ় সমস্ত জড়তা যেন চোখের নিমিষে দূর হ'য়ে গেল। শান্তির তরঙ্গ সারা দহের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগ্‌লো। সে যে কি আনন্দ তা' ভাষায় ব্যক্ত রতে পারছি না। সেই সব কথা এখন সত্যই যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে! ক যে তাঁর গভীর ভালবাসা!'

স্বামীজী মহারাজ নীরব ও গম্ভীর হলেন! কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকার পর মতহাস্যে তিনি আবার বল্লেন ঃ 'তারপর পরমহংসদেব একসঙ্গে অনেকগুলো থা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কে তুমি? তোমার বাড়ী কোথায়? তোমার নাম ক? কি জন্যে এসেছ? কি চাও?' আমি আমার নাম-ধাম, মনের ইচ্ছা সবই াকে একে-একে নিবেদন করলাম। শেষে বল্লাম ঃ 'আমি যোগ শিখ্‌তে চাই। াপনি কি আমায় যোগ শেখাবেন?

'পরমহংসদেব কিছুক্ষণ নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লেন। ামিও নির্বাক। শরীরবোধ তখন যেন একরকম লোপ পেয়ে গিছ্‌লো। কতক্ষণ ারে তিনি আবার বল্লেন ঃ 'যোগ শিখ্‌বে? বেশ তো। তুমি পূর্বজন্মে একজন ড় যোগী ছিলে, একটু বাকি ছিল। এই তোমার শেষজন্ম। আজ রাত্রে এখানে কাল সকালে এসো।

'আমি শুনে আশ্বস্ত হলাম। পরমহংসদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বাইরের এসে আবার শুলাম। চোখে ঘুম এলো না, শুয়ে-শুয়ে ারমহংসদেবের কথাই কেবল ভাব্‌তে লাগলাম। ভাব্‌লাম—'কই জটা, চিম্‌টে,

কমণ্ডলু, গায়ে ছাইমাখা! ওসব কিছুই তো নাই। মাথাও কামানো নয়, বর অল্প-অল্প দাড়ি আছে। পরণে গেরুয়া নয়, লালপেড়ে সাদা-ধুতি, পায়ে চটি জুতো, গায়ে জামা, আর কোঁচার খুঁট্‌টা কাঁধে ফেলা। ঘরে একটি ছোট সাধার তক্তাপোষ (বড় চৌকী বলা যায়), তার উপর সামান্য গদি দেখ্‌লাম, একা ছোট তাকিয়াও আছে। আশ্চর্য এই সাধু! আশ্চর্য এই পরমহংস!'—এই স কত চিন্তাই না তখন মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগ্‌লো। আর মনের মধে অপূর্ব একটা আনন্দের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছিল। শশীভূষণ ইতিমধে পরমহংসদেবের কাছ থেকে ফিরে এসে আবার আমার পাশে শুয়ে ঘুমি পড়্‌লো। আমি কিন্তু জেগে থাক্‌লাম, চোখে একটুমাত্রও ঘুম এলো না। সারাটি ক্ষণ পরমহংসদেবের কথাই চিন্তা করতে করতে অব্যক্ত এক আনন্দের স্রোতে ডুবে সারা রাত্রি প্রায় জেগেই কাটালাম। ভোর হ'তে-না-হ'তে বিছানা থেকে উঠে গঙ্গায় স্নান সেরে নিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘুম না হ'লেও শরীরে কোন গ্লানি বোধ করলাম না। তারপর উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম কখ আবার পরমহংসদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়!

'সূর্য তখন উঠেছে। নহবৎখানার সানাইয়ের শব্দ গঙ্গার তরঙ্গের সঙ্গে যে মিশে যাচ্ছিল। অন্তরের আবেগ ও আকুলতা ক্রমশই আমাকে পাগল ক'রে তুল্‌ছিল। এমন সময়ে রামলাল-দাদা এসে বল্লেন ঃ 'পরমহংসদেব তোমা ডাক্‌ছেন।' আমি আগে-থাক্‌তেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ঘরে ঢুকতে দেখি পরমহংসদেব আপনভাবে ছোট্ট-ছেলেটির মতো খাটের উপর ব'সে আছেন। আমি তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম কর্‌লাম। তিনি স্নেহভরে বল্লেন 'এই মাদুরটায় বসো।' আমি বস্‌লে তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তুমি কতদূর পড়েছ?'

আমি বল্লাম—'আমি এখন এন্‌ট্রান্স ক্লাসে পড়ি।'

'তুমি সংস্কৃত জানো? শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু পড়েছ?'

'বল্লাম—'রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ভট্টিকাব্য, গীতা, পাতঞ্জলদর্শন শিবসংহিতা এ'সব পড়েছি।

'পরমহংসদেব আমার কথা শুনে ভারি খুসী হ'য়ে বল্লেন ঃ 'বেশ, বেশ' তারপর তক্তাপোষ থেকে উঠে তিনি আমাকে গঙ্গার উত্তর দিকের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানেও একখানি তক্তাপোষ পাতা ছিল। বসার জন্য আমায় ইঙ্গিত করলেন। আমি বস্‌লে তিনি আমায় জিব (জিহ্বা) বার করতে বল্লেন তিনি তাঁর ডানহাতের মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে জিবের উপর কি একটি মূলমন্ত্র লিখে

দিলেন। আনন্দধারায় আমার সমস্ত শরীর যেন আপ্লুত হ'য়ে গেল। ডানহাতখানি আমার বুকের উপর দিয়ে তিনি নাভি থেকে কুণ্ডলিনীশক্তিকে উপর দিকে আকর্ষণ করতে লাগ্‌লেন। আমি তখন একরকম সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি। তিনি আমায় মা-কালীর ধ্যান করতে বল্লেন। আমি ধ্যান করতে করতে অপার আনন্দসাগরে ডুবে স্থির হ'য়ে গেলাম, বাইরের কোন জ্ঞানই আর তখন থাক্‌লো না। কতক্ষণ সেইরকমভাবে কেটেছিল তা বল্‌তে পারিনি, তবে জ্ঞান হ'লে দেখ্‌লাম পরমহংসদেব আমায় স্পর্শ ক'রে আছেন। তিনি আমার বুকে হাত দিয়ে ঊর্ধগতি কুণ্ডলিনীশক্তিকে আবার নীচের দিকে যেন নাভিতে নামিয়ে আন্‌লেন। আমি সহজ অবস্থায় ফিরে এলে তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কি দেখ্‌লি গভীর ধ্যানে?' 'যে'সব অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল ধ্যানে, তাই তাঁকে বল্লাম।' তিনি শুনে খুশি হ'য়ে বল্লেন ঃ 'তোর বিয়ে করার ইচ্ছে নেই তো?' আমি বল্লাম ঃ 'না'। তিনি বল্লেন ঃ 'হ্যাঁ, বিয়ে করিস্‌ নি।'

তারপর স্বামীজী মহারাজ আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন ঃ 'তারপর তো তোমরা সবই জানো। তারপর আমায় তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) দিব্যভাবের শিক্ষা দিয়ে বল্লেন—

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুবি।
দুই সতীনে পীরিত হ'লে তবে শ্যামা-মাকে পাবি॥

'তিনি প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে শোওয়ার পূর্বে বিছানায় বসে ধ্যান করার জন্য উপদেশ দিলেন ও বল্লেন ঃ 'এখন ধ্যানে যা-যা দর্শন কর্‌বি,—সব এসে (আমার কাছে এসে) বল্‌বি।' তিনি কালীমন্দিরে গিয়ে আবার আমায় ধ্যান করতে বল্লেন। তাই কর্‌লাম। কালীমন্দির থেকে ফিরে এলে তিনি সস্নেহে আমার হাতে মিষ্টান্ন-প্রসাদ দিয়ে বল্লেন ঃ 'খা।' আমি প্রসাদ খেলাম। তারপর তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে কলকাতায় ফেরার জন্য বিদায় প্রার্থনা করলাম। তিনি স্নেহমাখা স্বরে বল্লেন ঃ 'আবার আসিস্‌। শেয়ারের নৌকো কিংবা ঘোড়ার গাড়ী ক'রে এখানে এলে সুবিধে হবে।' আমি বল্লাম ঃ 'যদি ভাড়া যোগাড় করতে না পারি?' তিনি বল্লেন ঃ 'আস্‌বি। তার আর কি, আমি যোগাড় ক'রে দেবো।

'এরপরই দেখি যে, কলকাতা থেকে একজন বড়লোক-ভক্ত ঘোড়ার-গাড়ী ক'রে পরমহংসদেবের কাছে এসে উপস্থিত। তিনি প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই পরমহংসদেব আমার দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে বল্লেন ঃ 'তুমি এই ছেলেটিকে

কলকাতা পৌঁছে দিও তো।' তিনি হাতজোড় ক'রে বল্লেন ঃ 'জিয়াজ্ঞে।' তারপর পরমহংসদেবকে প্রণাম ক'রে আমি বিদায় নিলাম ও সেই ভদ্রলোকটির গাড়ীর উপরে কোচবাক্সে ব'সে কলকাতা রওনা হলাম। আসার সময়ে সারাটা রাস্তা কেবল চিন্তা করতে লাগ্‌লাম পরমহংসদেবের কথা, আর তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা ও করুণার কথা!'

দেখ্‌লাম স্বামীজী মহারাজ কথাগুলি বলতে বলতে আত্মহারা হ'য়ে গেলেন। ঘড়িতে তখন প্রায় তিনটে বেজেছে। আমরা শশব্যস্তে উঠে বল্লাম ঃ 'মহারাজ, তিনটে প্রায় বাজে, আপনি বিশ্রাম করুন আজ।'

তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন ঃ 'হ্যাঁ, শুধু আমি কেন, তোমরাও বিশ্রাম করগে এবার। রাত্রি অনেক হ'ল। কাল তো আবার সকাল-সকাল উঠ্‌তে হবে।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও আমাদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে গাইতে লাগলেন—

ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই,
যোগে-যাগে জেগে আছি,
তোর ঘুম তোরে দিয়ে মা,
আমি, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।'

তিনি বল্লেন ঃ 'এটি জীবন্মুক্ত-সাধকের কথা। সাধারণ মানুষ অজ্ঞানের সংসারে ঈশ্বরকে ভুলে কাজের মধ্যেই ডুবে আছে। জীবন্মুক্ত-সাধকরা অজ্ঞানের পারে গিয়ে ব্রহ্মানন্দে ভরপুর হ'য়ে বাস করেন। তাঁদের অজ্ঞান-ঘুম আর তাঁদেরকে মোহে আচ্ছন্ন ও আবদ্ধ করতে পারে না। অজ্ঞানের সংসারে তাঁরা অজ্ঞানকে জয় ক'রে সদানন্দে বাস করেন।' মনে হ'ল, স্বামীজী মহারাজ নিজের কথাই যেন বল্লেন একটু আবেশের ভাব নিয়ে!

॥ স্মৃতি ঃ বাইশ ॥

সে'দিন বুধবার। সকাল সাড়ে-আটটা—কি ন'টা হবে। স্বামীজী মহারাজ তখন কলকাতার মঠে (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে)। আমরা প্রণাম করতে গেছি প্রতিদিন যেমন যাই। প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই তিনি হাতে একখানি সবুজ মলাটের বাঁধানো খাতা দিয়ে বল্লেন ঃ 'কপি (copy) ক'রে দেবেতো এটা।'

আমরা বল্লাম ঃ 'এটা কি মহারাজ?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'আমার জীবনকথা। দার্জিলিঙে (বেদান্ত আশ্রমে) থাক্‌তে (১৯৩৬ খ্রীঃ) সময় পেলেই বসে-বসে সাদাসিদে ভাষায় আমার ছেলেবেলা জীবনের সকল ঘটনা লিখে রাখ্‌তাম। আমার সময় বা কোথায় বলো? এই দুটোমাত্র খাতা হয়েছে।'

আমরা ঃ 'কতটুকু লিখেছেন?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'বাল্যজীবন থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ যাওয়া-পর্যন্ত। তারপর পরিব্রাজক-অবস্থায় সারা ভারতের নানান্ দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি সেই সবের খানিকটা-পর্যন্ত ঘটনা।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, সবটাই লিখে শেষ করুন না কেন?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'সময় কই? শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ থেকে পেন্‌সন (pension) ভোগ করেও তো কাজের আর শেষ নেই! এখন জীবনের শেষকাজ হ'ল সোসাইটিকে দেবোত্তর ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে সঁপে দেওয়া। সেই কাজটাই যা এখন বাকী।' অবশ্য এই শেষকাজও স্বামীজী মহারাজের পূর্ণ হয়েছিল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী,—যখন ট্রাষ্ট-ডিড্ রেজেষ্ট্রী ক'রে তিনি সোসাইটীর নূতন নাম দিলেন 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ'।

কলিকাতায় ১৯নং রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের নিজস্ব জমি ও কতকগুলি ঘর-বাড়ী তখন তৈরী হয়েছে মাত্র। এতদিন ছিল বরাবরই ভাড়াটিয়া-বাড়ীতে মঠ বা আশ্রম (তখন নাম ছিল রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটী)। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে স্বামীজী মহারাজ আমেরিকা থেকে ফিরে প্রথমে বেলুড় মঠে ওঠেন। তারপর কাশ্মীর ও তিব্বতের নানান্ স্থান পরিভ্রমণ করেন (১৯২২)। তাঁর তিব্বতে ভ্রমণ করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিমিসগুম্ফায় (মঠে) যাওয়া। রুশ-পর্যটক নিকোলাস নোটোভিচ্ (Nicolus Notovich)-

লিখিত 'আন্‌নোন্‌ লাইফ অফ যীশাস-ক্রাইষ্ট' *(Unknown Life of Jesus Christ)*-গ্রন্থে[১] তিনি পড়েছিলেন যে, যীশুখ্রীষ্ট ভারতে এসেছিলেন। নিকোলাস নোটোভিচ্‌ হিমিস-মঠের গ্রন্থাগারে একটি পুঁথির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাতে যীশুখ্রীষ্টের ভারতে আসার ও ভারতে শিক্ষা-দীক্ষার কথা লেখা আছে। নোটোভিচের লেখা বইখানি স্বামীজী মহারাজ আমেরিকা থেকে সংগ্রহ্‌ ক'রে এনেছিলেন।

রুশ-পর্যটক নোটোভিচ ঠিক তুর্ক-রুশীয়-যুদ্ধের (১৮৬৭-১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) পরই তাঁর প্রাচ্যদেশে ভ্রমণের অভিযান শুরু করেন। বল্কান-পেনিন্‌সুলার বিভিন্ন স্থানগুলি পর্যটন ও ককেশীয়-পর্বত অতিক্রম ক'রে তিনি মধ্য-এশিয়ায় ও পারস্যে যান। পরিশেষে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। তিনি আফগানিস্থানের সুরম্য বোলান ও গুরনাই গিরিপথের (Passes) ভিতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ ক'রে প্রথমে সিন্ধুদেশ থেকে রাওয়ালপিণ্ডি ও পাঞ্জাবে যান। তারপর রওনা হন কাশ্মীরে ও পরে লাদাকের (Ladak) ভিতর দিয়ে তিব্বতের দিকে যান। তিব্বতের কোন-একটি বৌদ্ধমঠের প্রধান লামার কাছে হিমিসগুম্ফায় রক্ষিত একটি পুঁথির কথা তিনি জান্‌তে পারেন। পুঁথিতে বর্ণিত আছে যীশুখ্রীষ্টের ভারতে আসার কথা। তাঁর ভ্রমণ ও পুঁথির প্রসঙ্গে নোটোভিচ্‌ উল্লেখ করেছেন ঃ "In course of one of my visits to a Buddhist convent, I learned from the chief Lama that there existed very ancient memories, treating of the life of Christ and of the nations of the Occident, in the archives of Lassa, **. During my sojourn in Leh, the capital of Ladak, I visited Himis, a large convent in the outskirts of the city, where I was informed by the Lama that the monastic libraries contained a few copies of the manuscript in question. *** And I took advantage of my short stay among these monks to obtain the privilege of seeing the manuscript relating to Christ. With the aid of my interpreter, who translated from the Thebetan tongue, I carefully transcribed the verses as they were read by the Lama."

১। Cf. *The Unknown Life of Jesus Christ* (4th edition, Chicago, 1916), Preface, pp. 8-9. এটির ভারতীয় সংস্করণ, বর্তমানে ছাপা হয়েছে কলকাতা 'নবভারত' পাবলিশার্স থেকে।

শ্রীতারক এই সময়কার ভাব (যাহার দেখাদেখি ভক্তেরা মুগ্ধ) তিনি
সর্বদা ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হইলেও সর্বদা অনুভব করিতে পারিতেন

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ ও লীলা

R. জীবি P. 614.

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শ্রী অতুলচন্দ্র ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুরের এক সময় ভক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ বাবু লোকদের মতন। কিন্তু তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে সেই জন্য স্নেহ ও ভালবাসিতেন। একদিন তিনি রাত্রি প্রায় দশটার পর কলিকাতা হইতে কাশীপুরে আসিয়া দেখিলেন যে বাগানের ফটক বন্ধ। তাঁহার ঠাকুর দেখার আশাও পূর্ণ হইল না। তখন তিনি ফিরিয়া না [ফটকের সম্মুখে] হইয়া ঠাকুর দিকে চাহিলেন। অবশেষে দেখিলেন যে সম্মুখে ফটকের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং অতুল চন্দ্র ... হাসিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি দেখিলেন সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে তাহার ভক্তিভাবে এবং এক অপূর্ব মূর্তি। নিস্তব্ধ রাত্রি। অতুল চন্দ্র দেখিয়া সাক্ষাৎ ঠাকুর হইতে আসিয়া দিব্য দীপ্ত বিগ্রহ ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন অনেকক্ষণ তাহার দিকে দৃষ্টি দিয়া রহিলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অতুল চন্দ্রের সন্দেহ উপস্থিত হইল শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন সাক্ষাৎ শ্রীঠাকুর এবং তাহা সাক্ষাৎ শ্রীমূর্তি। এই দুর্লভ মূর্তি দর্শন করিয়া অতুল চন্দ্র মনে করিলেন হয়ত তাহার hallucination হইয়াছে কিনা। এমন সময় সহসা কোন কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর মুখের দিকে চাহিলেন এবং অতুল যে দেখিয়া তাহাকে দিলেন। তুমি কাহাকে দেখ এখানে। এখন তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও। সত্য তোমার আশা পূর্ণ হইল। অতুল বিস্মিত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন এবং সেই দুর্লভ দর্শন জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের [illegible] [illegible] [illegible], শরীর [illegible] [illegible]
[illegible] হইতে লাগিল। তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
না। [illegible] [illegible] তখন [illegible] লাগিলেন।

হঠাৎ একদিন [illegible] শ্রীশ্রীঠাকুরের [illegible] হইতে Hemorrhage
শুরু হইতে লাগিল। [illegible] [illegible] [illegible]
হইয়া পড়িলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] লাগিল। [illegible] [illegible] হইতে
[illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible],
[illegible] হইল যে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর [illegible] [illegible] [illegible]
করিতেন। তবে [illegible] তিনি [illegible] [illegible] শ্রীমা[illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীঠাকুর
বলিতে লাগিলেন: "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এইবার
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
হয়। এ [illegible] [illegible] হইতেছে বলিতে পার? [illegible] [illegible]
হইয়া যাইবেন।

---- x x x ----

[illegible] তিনি [illegible] [illegible] হইতে ২৫ শে শ্রাবণ
হইতে [illegible] [illegible] [illegible] বলিলেন। ৩১ শে শ্রাবণ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] তিনি [illegible] [illegible] বলিলেন "[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] না।" তবে [illegible] ৩১ শে শ্রাবণ [illegible] শ্রীশ্রী ঠাকুর
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] বলিলেন। "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ৩ [illegible] হই-
লাগিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: - [illegible]
[illegible]।" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমা
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু তিনি

* [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সমাধি [illegible]
[illegible] হইতে পারিলেন।
[illegible]
[illegible] সমাধিস্থ হইয়া
পড়িলেন। কিন্তু [illegible] তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইলে তি-
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
শ্রীশ্রীঠাকুর [illegible]
[illegible] ১৪ [illegible]
[illegible] হইয়াছে। [illegible] তাঁহার [illegible]
[illegible] শ্রীশ্রীঠাকুর [illegible]
[illegible] হইলেন। [illegible]
[illegible]
[illegible] (কাশীপুর [illegible]) [illegible]
[illegible] শ্রীশ্রীঠাকুরের [illegible]
[illegible] শ্রীশ্রীঠাকুরের
[illegible] হইয়া
[illegible] হইয়া [illegible]
[illegible]
১২৯৩; ইংরাজী Aug. 16th 1886. [illegible]
[illegible]
[illegible] তাঁহার সমাধি [illegible] হইতে [illegible]
[illegible] তাঁহার সমাধি [illegible] হইতে [illegible]
[illegible] তাঁহার [illegible]
[illegible] হইতেছে [illegible]
[illegible]
[illegible] হইয়া [illegible] হইয়া [illegible] কিন্তু

[illegible] শ্রীমৎ [illegible]

সংবাদ প্রেরণ হইল। তিনি উৎসাহে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহ
আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে মা তোমা
তোমার জয়!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমরা এখন
তাঁহাদের স্বামী-ও স্ত্রীর অপূর্ব সম্বন্ধ-ভাবিতে-ই অবাক হইয়া
গিয়াছি। শ্রীশ্রী-ঠাকুর বেদান্তী-জ্ঞানী-শ্রীমা কে সুতরাং [illegible]
[illegible] সং[illegible] প্রতি মূর্তি বলিয়া মানিতেন। এ সম্বন্ধে
মা ও তাঁহার স্বামীকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।
এই রূপ স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত কোথাও
দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাগবাজারে [illegible] সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের [illegible]
সংবাদ [illegible] তাঁর [illegible] হইল [illegible]
[illegible] স্বামী [illegible] আসিতে লাগিল।

১ [illegible] [illegible] প্রাতে [illegible] ৮ টার [illegible] সময় [illegible]
[illegible] সংবাদ [illegible] স্বামী [illegible] আসিয়া শ্রী
ঠাকুরের [illegible] দেখিয়া [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible]
শ্রীশ্রীঠাকুরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংবাদ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] আসিলেন। তিনি [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] কি হইবে? [illegible] [illegible]
[illegible] প্রাণ [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible]
হইয়াছে। শরীর decompose হইতে আরম্ভ হইয়াছে
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।" তিনি
[illegible] [illegible] "এই [illegible] photograph [illegible]
[illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] ১০, [illegible] [illegible]
এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
প্রদান করিলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া
[illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছি।

স্বামী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহারাজ।

[illegible] kidney troubles ছিল এবং [illegible] Gall stones এর [illegible] [illegible] [illegible] হইত [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible]। [illegible] হইতেন।

এদিকে স্বামী [illegible] হইত [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইত।" [illegible]।"

[illegible] [illegible] [illegible] — "[illegible] [illegible]।" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কিন্তু কেবল মহাপুরুষদের এমন শক্তি আছে যে প্রার্থনার দ্বারা ভিতর যাহার আছে তাহার অবিশ্বাস মহাপাপ সংসারের হইলেও আকর্ষণ করাইয়া দিয়াছিল অভিভাব করার এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে এবং অদৃষ্ট দূর্বল হয় তাহা দিয়া শাস্ত্র সকলই এ বলাইয়া দেয়। আমাদের নিকট কোটি মানুষ তাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ধীর কোটি এই সেই শক্তি আছে না? এবং কোনও ঐ শুধু কোটিতে উঠিতে পারে না?" শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর করিলেন:– "হয় না হতে পারে। ধীর যদি প্রার্থনার দিকে অগ্রসর উন্নত করিতে একটু শক্তি প্রার্থনা করে তাহলে সে তাহা সেইরূপ শক্তি হয়ত পায়।"

[illegible] P.30 | বাণী ও মায়ের শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধ

একদা রাতে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত আছি। এমন সময় তিনি হঠাৎ আমাকে বলিলেন:– "মধু তোর কাছে কি; তোরা ও জানিস কেমন শ্রীকৃষ্ণ নিত্য মূল উদ্ভাবন হয় এবং আমার ভিতর তাহার কারণ কোথায় উঠে বোস, বল দেখি?" আমি উত্তর করিলাম:– "তাহা আপনিই জানেন; আমি কি জানিব?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: "আমার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে, তা না হলে আমার ভাব হতে পারে?" এই তত্ত্ব হইতে তিনি আমার সম্বন্ধ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অনুভব ও ভুলিয়া নূতন আমাকে সেই (স্বর্গীয়) প্রেমানন্দ আস্বাদন করাইলেন এবং এই সম্বন্ধে নারদ প্রভৃতি ঋষিদের কথা বলিলেন তাতে নিত্য ও বেদ কহিলেন। It will die with me. That is all I can say. এই কথাটি আমি তাহার প্রেম দুখিতে কাঁদিল

[illegible] P.31 | বাণীর বিচার অনুরোধ

আমাদের মধ্যে একজন ভক্ত সাধারণ লোককে কথা বলা অমৃত বিষয় বাণীগুলির প্রচারের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরোধ করিলেন যে তাহার বাণীগুলি আমরা যেন যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া রাখি। উত্তরে তিনি বলিলেন:– "তোমরা কেবল যুগে যুগে আমার বাণী-

তখন লাদাক-পাস (Ladak-Pass) দিয়ে য়ুরোপ থেকে ভারতে প্রবেশ করার একটিমাত্র পথ বা যোগসূত্র ছিল। ঐ পথ দিয়েই যীশুখ্রীষ্ট ভারতে এসেছিলেন। জেরুজালেম ত্যাগ ক'রে একদল সওদাগরের সঙ্গে তিনি নাকি সিন্ধুদেশে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তের বছর। পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব অতিক্রম ক'রে তিনি একাকী পদব্রজে নানান্ দেশ ঘুরতে-ঘুরতে পরিশেষে জগন্নাথধাম-পুরীতে, রাজগৃহে, কাশীতীর্থে ও গয়ায় গমন করেন। তিনি গয়া থেকে যান বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তুনগরে। সেখানে ছ'বছর পালিভাষা শিক্ষা ক'রে তিনি বহু বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে নেপাল ও হিমালয়ের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করেন। 'তারিখ-ই-আঝাম্'-নামক আরবি-গ্রন্থে এই ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যীশু কাবুলের কাছে পথের পাশে একটি পুষ্করিণীতে হাত, পা ধুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছিলেন। এখনও ঐ পুষ্করিণীটির নাম তাই 'ঈশা-তালাও'। ঐ স্মৃতির উপলক্ষে এখনও ওখানে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসে। হিমালয়-প্রদেশগুলিতে ভ্রমণ ক'রে যীশুখ্রীষ্ট আবার পারস্যদেশে যান। তাছাড়া Crucification by An Eye-Witness-ইংরাজী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে প্রাণদণ্ড দেওয়ার পর তাঁর শিষ্য-সেবকরা যখন তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে পুনর্জীবন দান করেন তখন আত্মগোপনের জন্য তিনি লাদাক-পাশ অতিক্রম ক'রে কাশ্মীরে আসেন ও সেখানেই কিছুদিনের পরে তাঁর সাধারণভাবে দেহাবসান ঘটে।[২] মোটকথা ক্রুশে যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যু হয় নি। খানাইয়ারীতে এখনও যীশুখ্রীষ্টের একটি সমাধিস্থান পাওয়া যায়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের 'কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ'-গ্রন্থে তার একটি ছবিও তিনি দিয়েছেন। এ'সম্বন্ধে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-প্রণীত Christ the Saviour and the Christ-Myth-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তাছাড়া নিকোলাস নোটোভিচ্ তাঁর *The Unknown Life of Jesus Christ* -গ্রন্থে হিমিস-মঠে রক্ষিত পুঁথি থেকে যীশুখ্রীষ্টের ভারতে আসার বিবরণের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ হিমিস-মঠে গিয়ে প্রধান লামার কাছে ঐ পুঁথির অনুসন্ধান করেছিলেন। যে লামা স্বামীজী মহারাজকে হিমিস-মঠটি তন্ন-তন্ন ক'রে দেখিয়েছিলেন, তিনি গ্রন্থাগারের তাক থেকে একখানি পুঁথি পেড়ে বলেছিলেন সে'টি নকল-পুঁথি, আসলখানি লাসার নিকটবর্তী 'মারবুর' নামক বৌদ্ধমঠে রক্ষিত আছে। আসল পুঁথিটি পালিভাষায় লেখা, কিন্তু নকলখানি ছিল তিব্বতীভাষায় অনুবাদ করা। নকলটিতে ১৪টি

২। কিন্তু কাশ্মীরে যীশুর দেহাবসানের কথা সমর্থিত নয়।

পরিচ্ছেদ ও ২৪৪টি শ্লোক ছিল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সেই বৌদ্ধ-লামার সাহায্য নিয়ে শ্লোকের অধিকাংশ বাংলাভাষায় অনুবাদ ক'রে নিয়েছিলেন এবং তাঁর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' (পৃঃ ২৮৩—৩৮৫)-গ্রন্থে প্রকাশও করেছেন। নিকোলাস নোটোভিচ পুঁথিখানির যে অনুবাদ করেছিলেন তার সারাংশ হ'ল—

"10. When Issa had attained the age of thirteen, when an Israelite should take a wife, **. It was then that Issa clandestinely left his father's house, when out of Jerusalem, and, in company with some merchants, travelled toward Sindhu. ** (Ch-V) 1. In the course of his fourteenth year, young Issa, blessed by God, journeyed beyond the Sindh and settled among the Aryas in the beloved country of God. 2. ** When he passed through the country of the five rivers and the Rajipoutan, (Rajputana), the worshippers of the god Djaine begged him to remain in their midst. **5. He spent six years in Juggarnaut, Sajegriha, Benares, and the other holy cities ; **(Ch.VI). 2 ** and took refuge in the Gothamide Country, the birthplace of the great Buddha Cakeya-Mouni, **3. Having perfectly earned the Pali tongue, the just Issa applied himself to the study of the sacred rolls of Soutras. **5. He then left Nepal and the Himalaya Mountains and descended into the valley of Rajipoutan and went westward, **(Ch. VIII) 1. The fame of Issa's sermons spread to the neighbouring countries, and, when he reached Persia, **."

যীশুখ্রীষ্ট এসেনী-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক ছিলেন। আর্থার লিলি (Arther Lillie) তাঁর *India in Primitive Christianity*-গ্রন্থে (পৃঃ ২০০) এ'কথার উল্লেখ ক'রে বলেছেন ঃ "Jesus was an Essene, and the Essene, like the Indian Yogi, sought to obtain divine union and 'the gifts of the Spirit' by solitary reverie in retired spots।" স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখেছেন ঃ 'এসেনী'-নামটি ভারতীয় 'ঈশানী'-শব্দ থেকে এসেছে। ঈশান শিবের নাম এবং ঈশানী দুর্গা বা শক্তি। 'কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ'-গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখেছেন ঃ " ঈশাইনাথ ঈশের (শিবের) উপাসক।

'নাথ'-শব্দটি পৃথকভাবেও শিবের জ্ঞাপক। যোগীসম্প্রদায় নাথ বা শিবের উপাসক বলিয়া 'নাথ' নামের যোগের দ্বারা 'নাথযোগী' বলিয়া অভিহিত। যীশুখ্রীষ্ট সম্ভবতঃ নাথযোগীসম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপাস্য দেবতার নামে 'ঈশাই নাথ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্যালেস্তাইনে 'ঈশানী-যোগী-সম্প্রদায়' থাকিলেও সেই সম্প্রদায়ের মূলস্থানে বিশেষরূপে শিক্ষার জন্য যীশুখ্রীষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ইহা অসম্ভব নহে'।[৩]

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিতকার ষ্ট্রাসের (D. F. Strauss) অনুরাগী ছিলেন, স্বামীজী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) তেম্‌নি আর্ণেষ্ট রেনানের (Ernest Renan) গুণগ্রাহী ছিলেন। তবে ষ্ট্রাসের মতামতকেও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ স্বীকার করতেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যীশুখ্রীষ্টের ভারতে আসার কথা বিশ্বাস করতেন। যীশুখ্রীষ্ট যে এসেনী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং এসেনী-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত নিছক বৌদ্ধশ্রমণদের সংস্পর্শে সৃষ্টি হয়েছিল একথা তিনি তাঁর *India and Her People*-গ্রন্থে (পৃঃ ২২৭-২২৯) স্পষ্ট ক'রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'Philosophers like Schelling and Schopenhauer, and Christian thinkers like Dean Mansel and D. Millman, admit that the sect of the Essenes arose through the influence of the Buddhist missionaries who came from India. Moreover, it is a wellknown fact that John the Baptist was an Essene'।[৪] শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালও যীশুখ্রীষ্টের ভারতে আসার কথা বিশ্বাস করতেন। তিনি 'সত্তর বৎসর' *(Seventy Years)* নামক তাঁর আত্মজীবনীর মধ্যে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ "বাইবেলে যীশুর যে জীবন-ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দ্বাদশ হইতে ত্রিংশৎবর্ষ পর্যন্ত এই ১৮ (?) বৎসরের যীশুর জীবনের কোন খোঁজ-খবর মিলে না। কেহ কেহ অনুমান করেন এই সময়ের মধ্যে যীশু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তিনিই নাথযোগী-সম্প্রদায়ের এই ঈশাইনাথ।"[৫]

নিকোলাস নোটোভিচ্ যীশুখ্রীষ্টের ভারত-ভ্রমণের কাহিনীকে বিশ্বাস ক'রে তাঁর ভারতে আসার দু'টি কারণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "It is to be

৩। (ক) *Cf. The Unknown Life of Jesus Christ (1916), pp. 106-113, 119.*
(খ) স্বামী অভেদানন্দ ঃ কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ, পৃঃ ২৮৩—২৮৫।

৪। *Cf. India and Her People, (1905-6), p. 227.*

৫। *'প্রবাসী' পত্রিকা, মাঘ, ১৩৩৩ সাল।*

supposed that Jesus Christ chose India first, because Egypt was made part of the Roman possessions at that period, and then because an active trade with India has spread marvellous reports in regard to the majestic character and inconceiveable riches of art and science in that wonderful country, where the aspirations of civilized nations still tend in our own age.''[৬]

তিনি আরও বলেছেন যে, বাইবেলের প্রবক্তারাও যীশুখ্রীষ্টের জীবনের ঠিক ধারাবাহিক যোগসূত্র খুঁজে পান নি, কেননা সেন্ট লিউক নাকি বলেছেন ঃ 'He was in the desert till the day of his shewing unto Israel.' এ থেকে প্রমাণ হয় যে, যীশুখ্রীষ্টের ১৬ বছরের, অর্থাৎ ১৩ থেকে ২৯ বছর বয়সের ঘটনার ইতিহাস ও কোন সন্ধানই কেউ জান্‌তেন না ('Here the Evangelists again lose the thread of the terrestrial life of Jesus. ** which conclusively proves that no one knew where the young man had gone, to so suddenly reappear sixteen years later', p. 162)। সেন্ট লিউক এ'কথারও উল্লেখ করেছেন ঃ 'Jesus was about thirty years of age when he began to exercise his ministry.' (p. 173).

তাছাড়া বৌদ্ধপ্রমাণপঞ্জী থেকে জানা যায় যে, যীশুখ্রীষ্ট ২৯ বছর বয়সে ধর্মপ্রচার করতে আরম্ভ করেন ('commenced to preach in his twenty-ninth year'), সুতরাং যীশুখ্রীষ্ট দীর্ঘ ১৬ বছর ভারতবর্ষে অতিবাহিত করেছিলেন ভারতের বিভিন্ন দেশে এবং তীর্থস্থানে ভ্রমণ ও ধর্মসাধন ক'রে। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক নিকোলাস রোরিক (Prof. Roerich) যখন আমেরিকার পক্ষ থেকে মধ্য-এশিয়ায় ভ্রমণের জন্য এসেছিলেন, তখন তিনিও তিব্বতের বৌদ্ধবিহারে যীশুখ্রীষ্টের ভারতভ্রমণ-সংবলিত পুঁথি দেখেছিলেন। তাঁরও অভিমত হ'ল ঃ 'Jesus Christ travelled through India preaching, and returned to Jerusalem when he was 29 years of age.'

হিমিস-গুম্ফা লে-গ্রাম থেকে চব্বিশ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। তার কাছে স্তোকগ্রাম। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ হিমিস-মঠে উপস্থিত হ'লে সেখানকার লামারা তাঁকে বিশেষভবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তারা অনুরোধ জানালে

৬। Cf. *The Unknown Life of Jesus Christ,* pp. 161-162.

মঠের ভিজিটার্স বইয়ে *(Visitor's Book)* তিনি লিখেছেন ঃ 'Swami Abhedananda, Vice-President of the Ramkrishna Mission, Belur Math, near Calcutta.'

ইংরেজী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠ থেকে কাশ্মীর ও তিব্বতে ভ্রমণের জন্য যাত্রা করেন। তিনি তখন রামকৃষ্ণ-মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। হিমিস-মঠে প্রবেশ ক'রে নানান্ বৌদ্ধ-দেবদেবীর মূর্তি দেখ্তে দেখ্তে তিনি একটি অন্ধকার ঘরে উপস্থিত হলেন। সেখানে ছিল লামাগুরু স্তাগ্-সা-রাস্-চেনের প্রতিমূর্তি। সকল মূর্তিই প্রায় সোনা-রূপোয় মোড়া ছিল। দেবী মন্দরা বা কুমারীদেবীর মূর্তিও মঠের একটি পাশে রক্ষিত ছিল। পদ্মসম্ভব বা গুরু রিন্-পোচের তিনি পত্নী ও শান্তরক্ষিতের ভগ্নী। শান্তরক্ষিতের প্রতিমূর্তি ছিল অন্য-একদিকে। পণ্ডিত শান্তরক্ষিতও অতীশ দীপঙ্করের মতো নাকি তন্ত্রধর্মী ছিলেন। শান্তরক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্কর দু'জনেই নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। অতীশ তিব্বতে গিয়ে তন্ত্রধর্ম প্রচার করেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মঠের ভিতর ঘুরে ঘুরে সকল মূর্তি দেখেছিলেন। বৌদ্ধযুগের স্বর্ণময় স্মৃতি সমগ্র হিমিসমঠকে যেন ঘিরে রেখেছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে আরম্ভ ক'রে বুদ্ধদেবের মহাভিনিষ্ক্রমণ, বোধিলাভ, মারের মায়াজাল বিস্তার, পরিনির্বাণ ও পরবর্তী বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বর দেবদেবীর মূর্তি ও প্রাচীরগাত্রে তৈলচিত্র দিয়ে হিমিস-মঠের অভ্যন্তর সুশোভিত ছিল। হিন্দুদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ধীরে ধীরে রূপ ও বেশ পরিবর্তন ক'রে বৌদ্ধ-দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। এই রূপায়ণের চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। ঐতিহাসিক-কাহিনীর প্রামাণ্য নিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ভিতর বেশ-একটি মনকষাকষির কাহিনীও হিমিস মঠে রক্ষিত দেখা যায়। প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে এই নিয়ে মতভেদেরও অন্ত নেই। কেউ কেউ বলেন, বৌদ্ধ-দেবদেবীরাই ছদ্মবেশে হিন্দু-দেবদেবীতে পরিণত হয়েছেন, আবার বেশীর ভাগ পণ্ডিতের অভিমত যে, হিন্দু-দেবদেবীরাই বেশভূষা পরিবর্তন ক'রে বৌদ্ধ দেবদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অবশ্য এইসব হল নিছক ইতিহাস ও বিচারের কথা, তাই ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের উপর এর বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে আমাদের আসল প্রসঙ্গে এখন ফিরে আসা যাক্।'

স্বামীজী মহারাজ কথায় কথায় আবার বল্লেন ঃ 'আমার জীবনকথার ঘটনা এতই বিচিত্র ও বিপুল যে, তার খুঁটিনাটি সব-কিছু লিখ্তে গেলে অনেক সময় লাগ্বে। আমার সময় কই বলো। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি লেখো তো আমি

তাকে সাহায্য করতে পারি। আমেরিকায় থাক্‌তে প্রতিটি দিনের ডায়েরী (*Diary*,—'রোজনামচা') লিখে রাখ্‌তাম। ইংরেজীতে *Leaves from My Diary* লিখতে আরম্ভ করেছি, কিন্তু শেষ করতে পারবো কিনা শ্রীশ্রীঠাকুরই জানেন। স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) যেমন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজের হাত থেকে রেহাই পাননি, আমার ভাগ্যেও তাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করার মতো ত্যাগ-বৈরাগ্যবান সে'রকম ছেলেই বা আসছে কই বলো! ছেলেদের ভিতর নূতন ক'রে আবার প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। পুরাতন সমাজের বুকে নব-চেতনার সঞ্চার করা দরকার। তবে নূতন জাগরণ দেখা দিয়েছে, কিন্তু এই জাগরণ যাতে আরও প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে এটাই রামকৃষ্ণসঙেঘর তোমরা এখন করবে। তোমাদের কর্তব্য নিজেদের তৈরী করা ও সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও দশকে যথার্থ কল্যাণের পথে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করা। 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'—এই হ'ল সন্ন্যাসীজীবনের ব্রত। পলিটিক্যাল-ফিল্ডে (রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে) ঝাঁপিয়ে না পড়েও দেশ উদ্ধার করা যায়। স্বার্থত্যাগ, সেবাধর্ম, শিক্ষা, ভালবাসা, পরোপকার, ক্ষমা, মৈত্রী এ'সকল ব্রত নিজেদের জীবনে আচরণ ক'রে দেশ ও দশকে সেই আদর্শ শেখানোই সন্ন্যাসীজীবনের কাজ বা কর্তব্য। চৈতন্যদেব প্রেমের অবতার ছিলেন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবকে শিখায়' এই প্রেম ও ক্ষমাধর্ম নিজের জীবনে আচরণ ক'রে শ্রীচৈতন্য নির্বিচারে আপামর-সকলকে ভালবেসেছিলেন, অসংখ্য লাঞ্ছনা ও নানান্‌ দুঃখ-কষ্ট ভোগ ক'রেও অকাতরে সকলকে কোল দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের এই মহান্‌ আদর্শ সন্ন্যাসীমাত্রের বরণীয়, তবেই মনুষ্যজীবনে ত্যাগ-তপস্যার সার্থকতা থাক্‌বে। নিজের লোটা-কম্বল ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই যদি সারাটি জীবন কাটে, তাহ'লে আর হ'ল কি বলো! শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ তাই বলেছিলেন : 'জীবে দয়া কি-রে! শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।' স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) তাই রামকৃষ্ণসঙেঘ সেবাব্রতের প্রবর্তন করেন এবং যথাযথভাবে প্রবর্তন করার পূর্বে তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর অভিমত ও অনুজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। তোমাদের জীবনের তাই উদ্দেশ্য হবে 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। এটাই আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগৎকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম living (জীবন্ত) ও practical (ব্যবহারিক), কেবল মুখে কতকগুলো শাস্ত্রের বাঁধাবুলি-আওড়ানো নয়। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ও বর্তমান কালের উপযোগী এই শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম!'

স্বামীজী মহারাজ আবার তাঁর কাশ্মীর ও তিব্বত-ভ্রমণকাহিনী নিয়ে বল্লেন : 'সারা পৃথিবীটা ঘুরে বেড়াবো এই ছিল আমার মনের বাসনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সাধ আমার পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন।'

একজন জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'মহারাজ, দেশভ্রমণে কি মনের সত্যকারের কিছু উন্নতি হয়?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'হয় বৈকি। তবে সে'কথা তো আমি পূর্বেও অনেকবার বলেছি। গ্রন্থের পাতায় কাশীর বর্ণনা পড়া, আর গিয়ে নিজের চোখে কাশী দেখার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা এক রকম কথা নয়। তেম্‌নি শাস্ত্রে ঈশ্বরের কথা পড়া ও নিজে ঈশ্বরকে দেখার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সংসারের সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতারই দাম বেশী। দেশভ্রমণে অনেক উপকার হয় বৈকি। তাছাড়া দেশভ্রমণে মনের বা চিত্তের প্রসারতা বাড়ে। একটা স্থানে মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে থাকাটা মোটেই ক্ষতিকর নয়,—যদি তুমি ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য সাধন-ভজন করো, কিংবা জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যানুশীলন করো। কিন্তু কেবলই বিচারবিহীন একটানা কাজের মধ্যে, কিংবা সংসারের নানান্ কাজের ভিতর ডুবে থাক্‌লে একটা স্থানে পড়ে থাকাটা ভাল নয়, তাতে মনে ময়লা জমে,—অর্থাৎ মন তাতে আড়ষ্ট হয়, মনের প্রসার হয় না। সংকীর্ণতা ও পরের দোষদৃষ্টিই মনের ময়লা। দেশভ্রমণে নানান্ লোকের ও নানান্ দেশের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে চাক্ষুষ-পরিচয় হয়, আর তাই থেকে যে অভিজ্ঞতা হয় তাতে ক'রে মনের সংকীর্ণ ভাব কমে যায়। আবার তা' একেবারে দূর হ'য়ে যায়,—যদি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও অনুরাগ থাকে। কাজেই দেশভ্রমণ করা ভাল বৈকি।

'তবে উদ্দেশ্যহীন দেশভ্রমণ ভাল নয়। অনেকে কাজ করে না—ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সেটা কিন্তু কাজে ফাঁকি দেওয়ারই ভাব। তবে ঈশ্বরের সৃষ্টি কত বিরাট, কত বিচিত্র—এটা প্রত্যক্ষ করাও কি কম ভাগ্যের কথা! এই পৃথিবী-ছাড়া ঈশ্বর তো আরও কত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ঃ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, অনন্ত আকাশমণ্ডল—কত কি। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টি! আবার অনন্ত সৃষ্টির অনন্ত রহস্য। বিজ্ঞানীরা বলেন ঃ 'Within the solar system is the sun, nine planets, 32 moons, 30,000 asteroids, 100 billion comets, innumerable dust specks and gas molecules.' তাই ভেবে দেখ কাণ্ডকারখানাটি কি!

'সূর্যের ডায়ামিটার (ব্যাস) কত জান? —৮,৬৪,০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর চাইতে ১০০ গুণ বড়। সূর্য ক্রমাগতই জ্বল্‌ছে—অসংখ্য বছর ধ'রে, ধর—১০,০০০ লক্ষ বছর। ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) তাঁর Astronomy-তে এ'সব সংবাদের বিবরণ দিয়েছেন।

'গ্রহ-নক্ষত্রের কথা যদি বলো, তবে বিজ্ঞানীরা বলেন ঃ 'Our sun is but an average star among a spiral of 100,000,000,000 light years[৭] in diameter and 10,000 light years thick at the centre.

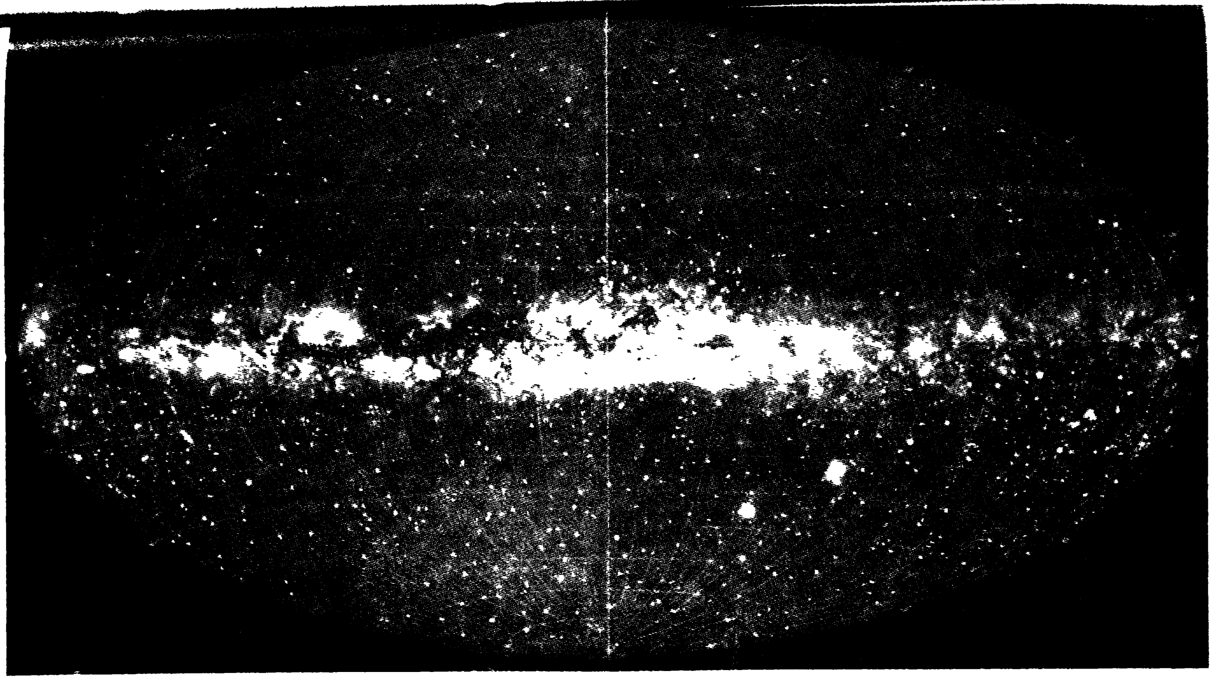
'তারপর ছায়াপথ যে আকাশে দেখো,—ওটা সমস্তটাই জ্বলন্ত গ্রহ-নক্ষত্র দিয়ে ভরা। বিজ্ঞানীরা বলেন ঃ 'Our sun is but one tiny part of the Milky Way galaxy. The sun is around 30,000 light years from the centre of the Milky Way.

'Milky Way বা ছায়াপথে সর্বদাই প্রবল ঝড় উঠ্ছে এবং তা থেকে কত সহস্র সহস্র গ্রহ ও উপগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। তারপর আকাশে নক্ষত্রগুলো দেখো—যেন পাশাপাশি অসংখ্য বিন্দুর মতো জ্বল্‌ছে। কিন্তু এক-একটা নক্ষত্রের কাছে যেতে সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ হাজার মাইল বেগে ছুটলে সময় লাগে সাড়ে-বারো বছর। তারপর কত গ্রহের গতিপথ এত দীর্ঘ যে, তাদের সমস্ত গতিপথ ঘুরে আস্‌তে লাগে হয়তো ৭৫ বছর বা ১০০ বছর। তাহলেই ভেবে দেখ আকাশের depth কত গভীর, কত বিস্তৃত।

'অনন্তের ধারণা কি সহজে হয়! বিশ্বচরাচর, পশুপক্ষী, গাছপালা, বিশাল সমুদ্র, নদ-নদী এবং অরো কত কিছু—তার কি আর ইয়ত্তা আছে! এই সকলের জ্ঞান এক জীবনে হয় না। তবে সব-কিছু জান্‌বো, সব জিনিস শিখ্‌বো—এ'ধরনের আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে থাকা ভাল। জীবনে বড় ও মহৎ হওয়ার ইচ্ছা সর্বদাই ভাল, তাতে মনের পরিধি বেড়ে যায়। Individual mind-কে (ব্যক্তি-মনকে) Cosmic Mind-এ (বিরাট মনে) পরিণত করার নামই সাধনা, নইলে আসনে একটু বস্‌লে—কি চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ মালা জপ কর্‌লে—এটাই কেবল সাধনা নয়। মনের পরিধিকে বড় করতে হবে, individual mind-কে Cosmic Mind-এ পরিণত করতে হবে! নিজের ছেলেপুলে ও ভাই-বোনদের যেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসো, দুনিয়ার সকল মানুষকে শুধু নয়—জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সকলকেই তেম্‌নি প্রাণঢালা ভালবাসতে হবে, তবেই না মন হবে বিরাট ও বিস্তৃত। সংকীর্ণ মন নিয়ে যতই সাধন-ভজন, দেশভ্রমণ ও শাস্ত্রপাঠ করোনা কেন, সবই পণ্ডশ্রম হবে, আসল কাজ কিছুই হবে না।'

ঠিক সেই সময়ে একজন ভদ্রলোক এসে স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করলেন। স্বামীজী মহারাজ ভদ্রলোককে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন ক'রে তাঁর

৭। এক light-year (আলোক-বর্ষ) বলতে বোঝায় আলো (গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল) এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে সেই পরিমাণ দূরত্ব।



আকাশে ছায়াপথ (Milky Way)

।। এ্যাণ্ড্রোমেডা-নেবিউলা ।।

আকাশে অসংখ্য নেবিউলা (Nebula) তারকাপূর্ণ হয়ে নিজেদের অক্ষপথে ঘুরছে। এদের মধ্যে এ্যাণ্ড্রোমেডা-নেবিউলার (Andromeda Nebula) পৃথিবী থেকে দূরত্ব ১০ লক্ষ মিলিয়ন-ট্রিলিয়ন আলোক-বর্ষ। ঐ জ্বলন্ত নেবিউলায় ১০০,০০০,০০০,০০০ নক্ষত্রের সমাবেশ আছে। ১ সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে (গতিতে) ঐ নেবিউলা থেকে পৃথিবীতে আলোক আসতে (পৌঁছুতে) ২ লক্ষ মিলিয়ন বৎসর লাগে। ঐ নেবিউলার মতো বৃহৎ ছায়াপথ (Milky Way) আর নাই। ঐ এ্যাণ্ড্রোমেডা-নেবিউলার ব্যাস (diameter) প্রায় ১০০,০০০ লক্ষ আলোক-বর্ষ (light-years)। এ্যাণ্ড্রোমেডার ঘনত্ব (depth) ২৩,০০০ লক্ষ আলোক-বর্ষ। দু'টি ছোট নেবিউলা বা গ্যালাক্সি (galaxy) ঐ এ্যাণ্ড্রোমেডার চারদিকে ক্রমাগত ঘূর্ণায়মান। ঐ দুটি গ্যালাক্সিও পৃথিবী থেকে ১০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। সুতরাং আকাশের প্রসারতা (base) ও গভীরতা (depth) অভাবনীয় ও নির্ণয়ের অতীত!

বিঃ দ্রঃ ১ মিলিয়ন = ১,০০০ × ১,০০০ ;
১ ট্রিলিয়ন = মিলিয়ন × মিলিয়ন × মিলিয়ন ;
১ আলোকবর্ষ = ১ সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল গতিতে আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে সেই পরিমাণ দূরত্ব।

কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে স্বামীজী মহারাজকে তাঁর কুশলাদি দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন ঃ 'আমি মনে হয়, আপনাদের কথাপ্রসঙ্গের কিছুটা বিঘ্ন ঘটালাম?' আমরা সে'কথার উত্তরে কিছু বলার পূর্বেই স্বামীজী মহারাজ নিজেই বল্লেন ঃ 'না, না, সেকি কথা। কথা তো আমাদের দিনরাত্তিরই চল্ছে। আপনি এলেন এতদূর থেকে, একটু-আধটু কথায় বাধা এলো তো কি এসে যায়। আপনিও আমাদের সভার এখন একজন শ্রোতা হলেন। ভালই হ'ল। শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে বক্তার মনেও আনন্দ আসে।' তারপর মহারাজ বল্লেন ঃ 'তবে কি জানেন?—এদেশের আর ওদেশের (পাশ্চাত্যের) আচার-ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্যে কোন লোক কথা বল্লে লোকে স্থির থাকে যতক্ষণ কথা চলে, আর এদেশের কথা স্বতন্ত্র।' তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন ঃ 'কি বলো তোমরা, আমি সত্যই তো বল্ছি! আমি অবশ্য দু'রকম কথাই বল্লাম।' আমরা সকলে একসঙ্গে বললাম ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। আপনি দু'রকমই বল্লেন।'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'তাহ'লে আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। শ্রোতৃবর্গের নিশ্চয়ই এতে সম্মতি আছে?'

হঠাৎ স্বামীজী মহারাজের এই ধরনের রসিকতায় আমরা প্রথমে একটু হতভম্ব ও বিস্মিত হলাম, কিন্তু অবশেষে কেউ আর হাসি চেপে রাখ্তে পারলাম না। আমাদের হাসির সঙ্গে স্বামীজী মহারাজও যোগ দিলেন। কেবল আগন্তুক ভদ্রলোককে একটু যেন গম্ভীর দেখ্লাম। আমরা মনে মনে তাই তাঁকে বেরসিক পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

এরপর সেবক তামাক নিয়ে এলে স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'ভালই করেছিস, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়া যাক্।' তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন ঃ 'কি বলো তোমরা?' আমরা বল্লাম ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ বলা ছাড়া আর উপায় কি তোমাদের। তোমরা তো সকলে এই রসে (তামাক-রসে) বঞ্চিত।'

আমরা নির্বাক্। স্বামীজী মহারাজের মুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব। প্রায় একমিনিট পরে পূর্বের মতোই তিনি আবার বল্লেন ঃ 'আমেরিকা থেকে ফিরে এসে গ্রীষ্মের দু'মাস আমি শিলঙে কাটাই। শিলঙ থেকে ফিরে আসি কলকাতায়। তারপর সম্ভবতঃ ১৪ জুলাই সন্ধ্যায় পাঞ্জাব-মেলে আবার কাশ্মীরে রওনা হই।

'তার পরের দিন সকাল দশটায় বেনারস (কাশী) ষ্টেশনে পৌঁছাই। সেখান

থেকে যাই কাশী-সেবাশ্রমে। হরিভাই (স্বামী তুরীয়ানন্দ) তখন অসুস্থ হ'য়ে সেখানে ছিলেন। পৃষ্ঠব্রণরোগে তিনি শয্যাগত। অনেক দিন পরে হরিভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে'দিন যে কি আনন্দ হয়েছিল তা বল্‌তে পারছি না। হরিভাই মহাজ্ঞানী ও নির্লিপ্তচিত্ত ছিলেন। পৃষ্ঠব্রণের কোন কষ্টই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। সর্বদাই তাঁর হাসিমুখ। আমাকে দেখে তিনি আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন।

'কাশী থেকে সারনাথ ও পরে হিন্দু-ইউনিভার্সিটী প্রভৃতি দেখ্‌লাম। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী আমায় সাদর-অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি নিজে ঘুরে ঘুরে ইউনিভারসিটীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখালেন। পরিশেষে তিনি বল্লেন ঃ 'স্বামীজী, আপনি তো প্রায় ২৫ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে এলেন। এখন ২৫ দিন অন্ততঃ কাশীতে কাটান। আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু বেদান্তের কথা শুনি।

'পণ্ডিতজী (মালব্যজী) অত্যন্ত অমায়িক লোক ছিলেন। পাণ্ডিত্যও ছিল তাঁর অসাধারণ। পণ্ডিতজীকে আমি জানালাম যে, অমরনাথ-দর্শনের সময় অত্যন্ত নিকট, কাজেই শীঘ্রই কাশ্মীর রওনা হ'তে হবে। অন্য সময়ে কাশী এলে নিশ্চয়ই আপনার কথা রাখার চেষ্টা করবো।

'কাশী থেকে পাঞ্জাব-মেল ধ'রে লাহোর রওনা হলাম। লাহোরের সুশীলকুমার মুখার্জীর বাড়ীতে উঠ্‌বো ঠিক ছিল। লাহোরে তখন অত্যন্ত গরম। লাহোরের মোটামুটি দ্রষ্টব্য স্থান—জুম্মা-মসজিদ, সালেমারবাগ, ঠাণ্ডি-সড়ক, সাহদ্বারা প্রভৃতি দেখে পরের দিন রাওলপিণ্ডি রওনা হলাম। সেখান থেকে মোটরবাসে কাশ্মীর যেতে হয়। ২২ টাকা দিয়ে ফ্রন্ট্‌-সিট্‌ (front seat) রিজার্ভ ক'রে বাসে ওঠা গেল। আমাদের গাড়ীতে ২০ জন উদাসী-সাধু ছিলেন। তাঁদের গাঁজার ধোঁয়ায় গাড়ীর ভিতরটা একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেল। গাঁজার কল্‌কে-টানার শব্দ ও সঙ্গে-সঙ্গে উদাসীদের মুহুর্মুহুঃ 'ব্যোম্‌ ব্যোম্‌'-শব্দের মধ্যে আমাদের বাস ছুটে চল্‌লো রাওলপিণ্ডি থেকে বারকাও-এর দিকে। বার্‌কাও রাওলপিণ্ডি থেকে তের মাইল দূরে। তারপর ছত্তরগ্রাম। সেখানে পথ বেশ সমতল। প্রাকৃতিক দৃশ্যও অত্যন্ত সুন্দর। চড়াই-উৎরাইয়ের পথ অতিক্রম করতে করতে মারি বা কুমারী-পার্বত্য-সহর পার হ'য়ে ক্রমশঃ আমরা ব্রিটিশ-ভারতের সীমানা কোহলায় উপস্থিত হলাম। সেখানে বিতস্তানদীর উপর একটি ঝোলানো লোহার ব্রিজ (সেতু) ছিল। নদীর অপর পারে ছিল ছোট একটি বাজার ও ডাকবাঙলো। আঁকাবাঁকা পথ ধ'রে কখনোও বা জঙ্গল অতিক্রম ক'রে আমাদের বাস ছত্তর নামক স্থানে উপস্থিত হ'ল।

ছত্তর থেকে ক্রমাগতই উৎরাই,—নীচের দিকে নাম্‌তে হয়। ঢালুপথ পেয়ে বাস গড়গড় ক'রে দ্রুত নীচের দিকে নাম্‌তে লাগ্‌লো। ড্রাইভার বাসের ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে দিল। আমরা ক্রমশঃ ৭১/২ মাইল দূরে দুলাই নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালাম। সেখানেও একটি সুন্দর ডাকবাঙলো ছিল। সেখান থেকে পাহাড়ের ধার কেটে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। মুজাফরাবাদের কাছে কার্‌নাল নামক একটি পাহাড়ের মাথায় বরফ জমা হ'য়ে আছে দেখ্‌তে পেলাম। কার্‌নাল-পাহাড়টি সম্ভবত ১৪০০০ ফিট উঁচু। আমরা ক্রমে দোয়েল-এ গিয়ে পৌঁছালাম। বৈকাল তখন সাড়ে চারটা হবে। সেখানেও একটি ডাকবাঙলো ছিল। সেখানে নেমে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে চা-পান শেষ কর্‌লাম। জায়গাটি ছিল ২১৭১ ফিট উঁচু। সেখানেও একটি ডাকঘর, চ্যারিটেবল-ডিস্পেন্সারী ও বাজার দেখ্‌লাম। তার কিছু-দূরে কৃষ্ণগঙ্গা ও বিতস্তা-নদীদু'টি মিলেছিল। সেই জায়গাটাকেই দোয়েল বলা হয়।

'সেখানে আধঘণ্টা বিশ্রাম করার পর আবার আমাদের বাস চল্‌লো কাশ্মীরের পথে। মোটামুটি ঘণ্টায় ১২ মাইল ক'রে বাস ছুটে চল্‌ছিলো। নানান্‌ স্থান অতিক্রম ক'রে আমরা প্রথমে দোয়েল ও পরে গারি নামক স্থানে পৌঁছালাম। দোয়েল থেকে গারি ১৪ মাইল দূর ও ২৬২৮ ফিট উঁচু। গারিতে গিয়ে রাত্রি কাটালাম। গারি ছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা-জায়গা। গ্রীষ্মকালে সেখানে নাকি মশার উপদ্রব ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয়।

'সকালে চা-পান সেরে আবার রওনা হ'লাম। কখনো নদীতীর দিয়ে, কখনো বা ছোট-ছোট পাহাড়ের গা দিয়ে পথ অতিক্রম ক'রে আমরা হাতিয়ান নামক গ্রামে পৌঁছালাম। এ'দিকে-সে'দিকে দু'-একটা চানারগাছ দেখলাম। সেখানে পাথরে মাটি মেশানো ও ছোট-বড় নুড়ি চারদিকে ছড়ানো ছিল। কিছু দূরে কার্‌নাল-উপত্যকায় যাওয়ার একটি পথ দিয়ে আমাদের বাস ছুট্‌তে লাগ্‌লো। সেখানে ছোট-একটি ঝোলানো ব্রিজ (সেতু) ছিল। চারদিকে অসংখ্য চীড় ও দেবদারু-গাছ জন্মেছিল। নদীর অপর পারে একটি শিখদুর্গের ভগ্নাবশেষ আমাদের চোখে পড়্‌লো। সেই দুর্গ নিয়ে পার্বত্যবাসীদের সঙ্গে শিখদের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল একদিন। শতসহস্র শিখের দেহ-শোণিতে একসময়ে সেখানে রক্তগঙ্গা বয়েছিল। কিছুদূরে চেনারির একটি ছোট্ট বাজার ও তার এক মাইল দূরে একটি জলপ্রপাত দেখ্‌লাম। চেনারিগ্রাম গারি থেকে ১৬ মাইল দূরে।

'বিচিত্র আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে আমাদের বাস ছুটে চল্‌ছিল। ক্রমে উরিগ্রামে বাস গিয়ে পৌঁছালো। সেখানেও একটি পুরাতন দুর্গ দেখ্‌লাম। স্থানটি ছিল সৌন্দর্যে-ভরা,—অতুলনীয়। উরির উচ্চতা ছিল ৪৩৭০ ফিট। 'উরি' নামে

একজন মুসলমান রাজা সেখানে নাকি রাজত্ব কর্‌তেন, আর তাঁর নামানুসারেই জায়গাটার নাম হয়েছিল উরি। ক্রমে হাজিপীর নামক একটি পাহাড়ের উপর দিয়ে পুঞ্চরাজ্যের পথে গিয়ে পৌঁছালাম। পথটি ছিল অত্যন্ত অপ্রশস্ত সরু। সেই রাস্তা অতিক্রম ক'রে ব্রাণকুত্রিগ্রামে পৌঁছালাম। সেখানে কতকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌লাম। তার চারদিকে ছিল নানারকমের ফুলের গাছ। উঁচু-উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় ঘন-বরফ জমেছিল ও তাদের উপর সূর্যকিরণ পড়ে কি যে এক অপূর্ব শোভা হয়েছিল তা' বর্ণনা করা যায় না! কাছেই ছিল একটা ইলেকট্রিক-পাওয়ার-হাউস (বিজলী-ঘর)। তখন সেই পাওয়ার-হাউস থেকেই সারা কাশ্মীররাজ্যে বিজলী সরবরাহ করা হ'ত। তার কিছুদূরে রামপুর-বস্তি দেখা যাচ্ছিল। জায়গাটা খুব সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। সমুদ্র থেকে তার উচ্চতা হবে ৪৮৪২ ফিট। উরি থেকে গ্রামটার দূরত্ব ছিল ৯৩ মাইল উত্তরে। গ্রামটি সমতল-জায়গার উপর অবস্থিত। ক্রমশঃ রামপুর-বস্তি ছাড়িয়ে আমরা বানিয়ার-নদী অতিক্রম কর্‌লাম। কাছে ছিল একটা ছোট রকমের বাজার ও করাতের কারখানা। বাস পূর্বেকার মতোই ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে ছুটে চলেছিল। ক্রমে নওসেরা-গ্রামে হাজির হলাম। সেখানে একটি প্রাচীন দুর্গ ছিল। রাস্তার একদিকে উঁচু-পাহাড়, আর অন্যদিকে ছিল গভীর খাদ। খাদের নীচে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। নীচেকার বড়-বড় গাছগুলোও দেখাচ্ছিলো ছোট ঝোপের মতো। চারদিকে পাহাড়ের গায়ে দেবদারুর জঙ্গল। অতি-মনোরম তার দৃশ্য! মাঝে-মাঝে বাগান। বাগানের ভিতর সব পাহাড়ী-গ্রাম। দু'এক জায়গায় ঝরণাও দেখ্‌লাম। ক্রমে কতগুলো বরফে-ঢাকা পাহাড় আমাদের চোখে পড়্‌লো। সেই পাহাড়গুলোর মাঝখানের উপত্যকাতে নাকি কাশ্মীরের প্রধান সহর শ্রীনগর। আমরা যতই শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হ'তে থাক্‌লাম, ততই উৎকণ্ঠা বাড়্‌তে লাগ্‌লো। দূরে তুষারধবল নাংগা ও হরমুখ-পর্বত-দু'টি দেখা যাচ্ছিল। নাংগা-পর্বতের উচ্চতা ২৬৯০০ ও হরমুখ-পর্বতের ৬৯০০ ফিট। তাদের দক্ষিণে গুলমার্গের অভ্রভেদী চূড়াগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কিছুদূরে কোলোহাই-পর্বতকে যেন একটা বৃহৎ সিংহ দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছিল। কোলোহাই-পর্বতের উচ্চতা ১৮০০০ ফিট। কোলোহাইয়ের আশেপাশে ছিল ছোট-ছোট পর্বতশ্রেণী। প্রকৃতির সৌন্দর্য যেন সেখানে ভেঙে পড়েছিল। আমাদের বাস সেইসব জায়গা ছাড়িয়ে ক্রমশঃ বরামূলা-সহরে পৌঁছুলো। অতটা পথ অতিক্রম ক'রে ও বাসের ঝাঁকুনিতে আমার শরীর বেশ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। বরামূলায় গিয়ে তাই খানিকটা বিশ্রাম কর্‌লাম। রামপুর থেকে সেই সহরটি ১৬ মাইল দূরে। তার উচ্চতা ছিল ৫১৯৩ ফিট।

একটি রোম্যান-ক্যাথলিক-মিশন-স্কুল সেখানে দেখ্‌লাম। তার পাশ দিয়ে গুলমার্গ-সহরে যাওয়ার রাস্তা। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা দিয়ে চলে গেছে।

'বরামূলা-সহরটির আসল নাম বরাহমূল। কাশ্মীরের হিন্দুদের বিশ্বাস যে, ওখানেই নাকি বিষ্ণু বরাহ্‌-অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সহরটি বিতস্তানদীর উভয় দিকে বিস্তৃত ছিল। প্রায় ৮০০ বাসিন্দা সেখানে বাস করে। ঐতিহাসিক কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী'-তে বারমূলার বিবরণ দেওয়া আছে। রাজা অবন্তী-বর্মার প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসূর্য নাকি ঐ সহরকে জলপ্লাবন থেকে বাঁচানোর জন্য বিতস্তানদীর উপর একটা পাথরের বড় বাঁধ তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে একবার ভীষণ ভূমিকম্পে সহরটার খুব ক্ষতি হয়েছিল। সেখানে মুঘলসৈন্যদের একটা প্রাচীন সরাইখানা ছিল। মুঘলরাজত্বের আমলে মুঘলরা ঐ দুর্গম পার্বত্য-অঞ্চলেও তাদের ঘাঁটী তৈরী করতে কসুর করেনি। শিখদের রাজত্বের সময়ে শিখরা আবার ঐখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করেছিল। দুর্গটা দেখ্‌লাম ধ্বংসপ্রায় ও জীর্ণ। তার কাছে দু'টি গন্ধকমিশ্রিত জলের ঝরণা দেখ্‌লাম। হিন্দুদেরও সেখানে একটা প্রাচীন শিবমন্দির ছিল। বিতস্তানদীর পূর্বতীরে একটি নগর-তোরণের ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছিল। হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের উপর্যুপরি অভিযানগুলির স্মৃতিচিহ্ন সেখানে সুস্পষ্ট দেখ্‌লাম।

'বরামূলায় ঠাণ্ডা একটু কম, কেননা শ্রীনগর থেকে প্রায় ১০০০ ফিট নীচে ছিল সেই সহর। শীত কম ব'লে শ্রীনগর ও গুলমার্গ থেকে অনেকে শীতকালে সেখানে গিয়ে বাস করে। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য সফেদাগাছের শ্রেণী দেখা গেল। আমাদের বাস তখন একটু দ্রুত চল্‌তে লাগলো, কেননা সন্ধ্যার পূর্বেই শ্রীনগরে পৌঁছানো দরকার। পূর্বদিকে ১৪ মাইল অতিক্রম করার পর পাটান (পত্তন) নামক গ্রামে পৌঁছালাম। গ্রামে অসংখ্য চানারগাছ দেখা গেল। সেখানকার জায়গার উচ্চতা ছিল ৫২২০ ফিট। সেখান থেকে নাংগাপর্বত বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। শ্রীনগর সেখান থেকে আর বাকী ছিল ১৮ মাইল। বরাবর সমতলভূমি। দু'ধারে সফেদাগাছের শ্রেণী দেখ্‌তে বেশ সুন্দর লাগ্‌ছিল। তারই ভিতর একটা কাঠের সেতু আমাদের পার হ'তে হ'ল। তারপর আমরা পৌঁছালাম মিরগুণ্ড। সেখানে কাশ্মীরের রক্ষীসৈন্যরা তাঁবু খাটিয়ে বাস কর্‌ছে দেখ্‌লাম। তার এক মাইল দূরে ডানদিকে গুলমার্গ যাওয়ার আর-একটি রাস্তা চলে গেছে। সন্ধ্যার ঠিক কিছু পূর্বে আমরা শ্রীনগরে গিয়ে পৌঁছালাম।

'শ্রীনগরে পৌঁছে বেলুড় মঠের পাণ্ডা সুদামাকে খুঁজে বার কর্‌লাম। তার সাহায্য নিয়ে ডাক্তার এ. মিত্রের বাঙলোতে গিয়ে উঠ্‌লাম। আলওয়ারের মহারাজের (মহারাজ জয় সিং) সঙ্গে আমার পূর্ব থেকেই বেশ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বলেছিলেন কাশ্মীর মহারাজকে তার (টেলিগ্রাম) ক'রে কাশ্মীর ও অমরনাথ-ভ্রমণের সব কিছু বন্দোবস্ত ক'রে দিতে। করেছিলেনও তাই। শ্রীনগরে আমরা পৌঁছানোর সংবাদ পেয়ে কাশ্মীরের মহারাজা (প্রতাপ সিং) আমায় আমন্ত্রণ জানিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওদেশের দেশাচার-অনুযায়ী আমি মাথায় গেরুয়া-পাগ্‌ড়ী বেঁধে রাজদর্শনে রওনা হ্‌লাম। স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) মতো আমিও পাগড়ী-বাঁধায় সিদ্ধহস্ত ছিলাম। গাড়ী বিতস্তানদী (Bias) পার হ'য়ে বাজারের ভিতর দিয়ে রাজপ্রাসাদের সাম্‌নে দাঁড়ালো। একজন গাইড (পথপ্রদর্শক) আমাদের[৮] সসম্মানে রাজপ্রাসাদের ভিতর নিয়ে গেল। বিতস্তানদীর সাম্‌নের দিকে বারান্দায় একটা কারুকার্যময় কাশ্মিরী-গালিচা পেতে আমাদের বসার স্থান করা হয়েছিল। ষ্টেট্‌-সেক্রেটারী পণ্ডিত জগৎরাম জ, মুতাবিন্দ দরবার রায়-বাহাদুর, পণ্ডিত মনমোহনলাল লঙ্গর ও অন্যান্য রাজকর্মচারীরা সকলেই শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা ক'রে আমাদের বস্‌তে বল্লেন। আমরা বস্‌লে তাঁরাও আমাদের চারদিকে উপবেশন করলেন। কিছুক্ষণ পরে কাশ্মীরের মহারাজ এলেন। তিনি আমায় হাত তুলে নমস্কার কর্‌লে আমিও প্রতিনমস্কার জানালাম। আমেরিকায় প্রচারকার্য, বেলুড় মঠ ও মিশনের কর্মপ্রণালী প্রভৃতি নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলেন। মহারাজ প্রতাপ সিং অমায়িক, সাদাসিদে ও নিরহংকারী লোক ছিলেন। আলোচনার পর তিনি আমাদের সুখ-সুবিধার সকল রকম বন্দোবস্ত করার জন্য সেক্রেটারীকে আদেশ দিলেন। তাছাড়া অমরনাথ-যাত্রার সকল রকম আয়োজনও ক'রে দিতে বল্লেন।

'অমরনাথ-যাত্রার তখন আর চারদিনমাত্র বাকী। কাজেই শ্রীনগর ও কাশ্মীরের প্রধান প্রধান স্থানগুলি আমরা ঘুরে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। কাশ্মীর ও তিব্বতের বিস্তৃত বিবরণ আমার 'কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ' বইয়ে পাবে।

'তিব্বতে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্মেরই প্রভাব দেখ্‌লাম। মুসলমানদের আক্রমণও তিব্বতে বিশেষভাবে হয়েছিল। তিব্বতে তন্ত্রবাদের প্রচারও বড় কম হয়নি। তন্ত্রবাদ বল্‌তে বজ্রযান-মতাবাদেরই প্রচার বেশী। তিব্বতের ভিন্ন

৮। আমার সঙ্গে আমার সেবক ছিল।

ভিন্ন গুম্‌ফা বা মঠে-মন্দিরে হিন্দু-দেবদেবীরা বৌদ্ধধর্মের পরিবেশ ও ছদ্মনাম নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজো পাচ্ছেন। অবশ্য বর্তমানে আমরা তাঁদের বৌদ্ধ-দেবদেবী ব'লেই জানি। তিব্বতের লামাউরু, লিকির, লে, হিমিস, ত্রিত্‌শ, ফিয়াং, পিতুক, কাওচী ও শে-গ্রামের গুম্ফা-গুলিতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থ দেখ্‌লাম। দেবদেবীদের মূর্তি বেশ সুন্দর। প্রতিটি গুম্ফার (মঠের) দেওয়ালে বড় বড় তৈলচিত্র (ফ্রেস্কো-পেন্টিংস্‌) দেখ্‌লাম। তবে সমস্ত তৈলচিত্রই টিবেটিয়ান্‌-টেক্‌নিকে বা স্টাইলে আঁকা।

'লামাউরু-গুম্ফা বা মন্দির প্রায় ১২,০৭০ ফিট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। গুম্ফার উচ্চতা হবে ৩০ ফিট এবং দৈর্ঘ্য তার-কিছু বেশী। পাথর, মাটি, কাঁচ ও ইট দিয়ে গুম্ফাটি তৈরী। ছাদ সমতল ও চতুষ্কোণ। ছাদের উপর পাঁচ-ছ'টি কালো কাপড় দিয়ে মোড়া ঝাণ্ডা ও ত্রিশূল আছে। প্রত্যেক ত্রিশূলে আবার ভেড়ার সিঙ্‌ ও চামর বাঁধা! দু'টি বড় মণিচক্রও দেখলাম। বাতাসের বেগে মণিচক্রদু'টি প্রায়ই ঘুরতে থাকে। গুম্ফায় জানালার সংখ্যা অত্যন্ত কম। দরজাগুলি মজবুত মোটা কাঠ দিয়ে তৈরী। গুম্ফার ভিতরটা বেশ অন্ধকার, দিনরাত্তির তাই সেগুলিতে বাতি জ্বলে। লামাউরু-গুম্ফার ভিতর একটি কাঠের তাকে প্রায় চারশো' তিব্বতী-ভাষায় লেখা পুঁথি আছে। পুঁথিগুলি রেশমের কাপড় দিয়ে মোড়া। সেটাই গুম্ফার লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার)। লাইব্রেরীর অন্যদিকে অতীশ-দীপঙ্কর, পদ্মসম্ভব, কুশক প্রভৃতি লামাদের মূর্তি। তাছাড়া সাকাথুব্‌পা (শাক্যস্থবির), থুকজে-ছিন্‌পো (অবলোকিতেশ্বর), শাকামুনি (শাক্যমুনি), চেঁরে-জি (বিশালাক্ষী) প্রভৃতি আরো কতকগুলি দেবদেবীদের মূর্তি ছিল। থুকুজে-ছিন্‌পো বা অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির এগারোটি মাথা ও এক হাজার হাত। মূর্তির প্রত্যেকটি হাতে একটি ক'রে আবার চোখ (চক্ষু) আছে। ঐ মূর্তির মাথাগুলি থাকে-থাকে সাজানো,—যেমন প্রথম থাকে ৩টি, দ্বিতীয় থাকে ৪টি, তৃতীয় থাকে ৩টি, চতুর্থ থাকে একটি ও সকলের উপরে একটি অমিতাভ-বুদ্ধের মাথা। অবলোকিতেশ্বরের পূজায় কোনরকম শুচি ও অশুচির বিচার নেই। সাকা-থুব্‌পা বা শাক্য-স্থবির পদ্মাসীন-বুদ্ধ। তিনি ভূমিস্পর্শমুদ্রায় আসীন। প্রচারক শাক্যমুনি-বুদ্ধের মূর্তি কিন্তু দাঁড়ানো। গুম্ফার আর একটি ঘরে প্রায় দেড়তলা-সমান-উঁচু আর-একটি অবলোকিতেশ্বরের, বজ্রতারার ও বুদ্ধদেবের দাঁড়ানো মূর্তি ছিল। তারাদেবীর মূর্তির সংখ্যা বেশী। মূর্তিগুলির কোনো-কোনোটি ছিল কাঠের তৈরী। কাঠের উপর সোনা ও রূপো দিয়ে মূর্তিগুলি মোড়া। কতকগুলি মূর্তি আবার নিরেট-পিতলের তৈরী ছিল। বৌদ্ধ-দেবদেবী

ও বুদ্ধমূর্তি-ছাড়া আরো অনেকগুলি ছোট-ছোট স্তূপের মতো 'মণি' ছিল। মণিগুলি দেখ্‌তে প্রায় মুসলমানদের তাজিয়ার মতো। সে'গুলি সোনা ও রূপোর পাত দিয়ে মোড়া। মণিগুলি বহুমূল্য পাথরের দ্বারা খচিত। প্রত্যেকটি মূর্তির সাম্‌নে ছোট-ছোট পিতলের বাটিতে পানীয় জল রাখা ছিল। সেগুলিকে কারণবারির (মদ্যের) অনুকল্প বলা যায়। বেশীর ভাগ লামা তান্ত্রিক-আচারের পক্ষপাতী এবং সেটা স্বাভাবিকই। অতীশ দীপঙ্কর ভারতের তন্ত্র তিব্বতে প্রবর্তন করেন। দীপঙ্কর নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন সেকথা বলেছি।[৯] তাছাড়া শীতপ্রধান দেশ ব'লে তিব্বতের সাধারণ অধিবাসীদের মতো লামারাও সামান্য সামান্য 'কারণ' (মদ্য) গ্রহণ করেন। মদ্যকে তিব্বতীরা বলে 'ছাং'। তাঁরা বেশী পরিমাণে চা-ও খান। তবে তাঁরা দুধ ও মিষ্টি না দিয়ে মাখন দিয়ে চা তৈরী করেন।

'লামাউরু-গুম্ফার ভিতর দেওয়ালের চারদিকে স্বর্গ, নরক, শাক্যমুনির দশ অবস্থা ও তাঁর ছ'রকম গতি, যমরাজ ও বিভিন্ন লামাগুরুর হাতে আঁকা রঙিন-ছবি সাজানো ছিল। মূর্তিগুলির সামনে নানান্ রকমের ঝালর ও পিছনে সৌখিন-রেশমে বোনা পর্দা টাঙানো দেখ্‌লাম। উপরে ছোট-ছোট চাঁদোয়া (canopy)। মেঝের উপর কতকগুলি তক্তাপোষ পাতা ছিল। তাদের উপর ওদেশের ভেড়ার লোমে তৈরী কম্বল বিছানো ছিল। ঐ কম্বলের উপর ব'সে লামারা পূজা প্রভৃতি করেন। রাত্রের প্রথম দিকে দেবদেবী ও পূর্ব-পূর্ব লামাগুরুদের প্রতিদিন আরাত্রিক হয়। আরাত্রিকের পর সকলের যিনি প্রধান লামা—তিনি শাস্ত্র পাঠ করেন ও অন্যান্য লামারা তা একাগ্রচিত্রে শোনেন।

'লামাদের ধর্মশাস্ত্র দু'রকম ঃ তানজুর ও কানজুর। 'কানজুর' বল্‌তে ত্রিপিটক গ্রন্থ। সে'গুলি ছিল তিব্বতী-ভাষায় অনুবাদ করা। তানজুর কানজুরের ভাষ্য। কানজুরে ১০৮টি পরিচ্ছেদ ও প্রতিটি পরিচ্ছেদে ১০০০ খানি ক'রে পাতা। তানজুরের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ সর্বশুদ্ধ ২২০টি।[১০] দু'টি ধর্মগ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদই এক-একখানি পৃথক পুঁথির মতো দেখ্‌তে। তাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ ইঞ্চি, উচ্চতা ও বিস্তার হবে ৫ ইঞ্চি ক'রে। পুঁথিগুলির মলাট কাঠের তৈরী। মলাটের উপর নানান্ রকম রঙে চিত্র আঁকা ছিল।

৯। অতীশ-দীপঙ্কর বিক্রমশীলা-মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

১০। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বৌদ্ধগান ও দোহা'-গ্রন্থের পরিশিষ্টে তানজুর ও কানজুরের অন্তর্গত সুদীর্ঘ একটি বৌদ্ধ-পুঁথির তালিকা দিয়েছেন।

'তিব্বতে গুম্ফাগুলিতে পূজার পূর্বে জমায়েৎ হওয়ার জন্য শিঙ্গাধ্বনি ক'রে উপাসকদের আহ্বান করা হয়। ঐ শব্দ শুনে লামারা যে-যার ঘর থেকে বার হ'য়ে আরাত্রিক ও পূজার স্থানে সমবেত হয়। একত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নীরবে দেবদেবীদের মূর্তির দিকে মুখ ক'রে ব'সে মন্ত্র পড়ে ঃ 'ওঁ অর্ঘং চার্ঘং বিমনসে, উৎসুম্ম মহাক্রোধে হুং ফট্।' এই মন্ত্র পড়ে তারা মনে করে তাদের মনের সকল পাপ দূর হ'য়ে গেছে। তারপর আবার শিঙ্গাধ্বনি করা হয়। তখন তারা সমস্বরে আরাত্রিকের মন্ত্র শুরু করে। মন্ত্র আবৃত্তির বা গানের সঙ্গে করতাল, দামামা, দোর-জে বা কাঁসার তৈরী ঝুমঝুমির মতো একরকম বাজনা বাজাতে থাকে। গুম্ফার ঘরের কোণে আধমণ পুরাতন মাখনের একটি প্রদীপ জ্বালা থাকে। প্রদীপটা থাকে একটি বড় পিত্তলের পাত্রের উপর, আর পাত্রটা রাখা হয় কাঠের তৈরী একটি তেপায়ার উপর।

'তিব্বতে কিভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল তা' বিস্তৃতভাবে আমি আমার 'কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। তবে বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রবাদ ভারতবর্ষ থেকেই তিব্বতে প্রচারিত হয়েছিল। পূর্বেই বলেছি যে, অতীশ দীপঙ্কর এবং নালন্দা ও বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্ত্রের পণ্ডিতরা তিব্বতে তন্ত্রবাদ প্রচার করেছিলেন। তিব্বতীরা আসলে ছিল গ্রহ-নক্ষত্র ও ভূত-প্রেতাদির উপাসক। তান্ত্রিককর্মের সঙ্গে যোগের সাধনপ্রণালীও তিব্বতী-লামাদের ভিতর প্রবেশ লাভ করেছিল। তিব্বতী-লামারা অনেকে সূর্যের উপাসক ছিলেন। তারা 'ওঁ মরিচিনম্ স্বাহা'-মন্ত্রে উষাকালীন লোহিতবর্ণ-সূর্যকে শ্রদ্ধা-সহকারে প্রণাম জানায়। লামারা দিনের বেলায় ও রাত্রে মোট ন'বার আহার করে। আহারের পূর্বে তারা বুদ্ধ, অন্যান্য দেবতা ও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে 'ওঁ গুরু বর্জ নৈবেদ্য অং হুং' প্রভৃতি মন্ত্রে আহার্য নিবেদন করে। মন্ত্রপূত না ক'রে তারা কোন খাদ্যদ্রব্যই গ্রহণ করে না।

'লামাউরু-গুম্ফা দেখার পর লিকিরগুম্ফা দেখ্‌তে গেলাম। লিকির-পর্বতের উপর গুম্ফাটি অবস্থিত। লিকির-পর্বতের উচ্চতা প্রায় ১৪,০০০ ফিট। লিকির-গুম্ফার উপরে উঠ্‌তে নীচতলা থেকে ১৫০টি পাথরের সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়। আমরা গুম্ফার তোরণে পৌঁছাতেই ২৫ জন লামা 'জুলে জুলে' ব'লে প্রণাম ক'রে অভ্যর্থনা জানালেন। লামারা আমায় প্রথমে একটি বড় হলে (Hall) নিয়ে গেল। হল্‌টি কারুকার্যময় ও নানান্ বৌদ্ধ-দেবদেবীর মূর্তিতে সাজানো। হলের মেজেতে নামদা ও লুই বিছানো। তার উপর এ'দিকে-সে'দিকে বহু ছাপা-পুঁথি ছড়ানো। কতকগুলি ওদেশী (তিব্বতীয়) বাদ্যযন্ত্র

আছে। হল্-এর পাশেপাশে লাল ও নীলরঙের সিল্কের কাপড় দিয়ে সাজানো থামওয়ালা বহু ঘর দেখ্লাম। ঘরগুলিতে লামারা থাকে। ঐসব ঘরে 'গেদুম-গ্রুব' প্রভৃতি দালাই-লামাদের (গ্যাল-বা-রিণ-পোছে) প্রতিমূর্তি সাজানো আছে, গেদুম-গ্রুব খ্রীষ্ট্রীয় ১৪শ থেকে ১৫শ শতকের ভিতর 'গ্যাল-বা-রিণ-পোছে' এই উপাধি নিয়ে দালাই-লামা হয়েছিলেন। তিব্বতে লামাদের বিশ্বাস যে, চেনরেজী বা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মানুষের দেহে প্রবেশ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং তাঁদেরই বলা হয় 'দালাই-লামা'। তাসি-লামারাও চেন্‌রেজী-র পিতা অমিতাভের অবতাররূপে পূজা পান।

'গুম্ফার ভিতর লামাদের ঘরগুলির মাঝখানে কতকগুলি 'মেনদাং' বা স্মৃতিস্তূপ আছে। স্মৃতিস্তূপে বিখ্যাত লামাদের মৃত্যুর পর তাদের নখ, চুল, অস্থি প্রভৃতি রাখা হয়। স্তূপগুলি সোনা, রূপা ও দামী পাথর দিয়ে তৈরী। স্তূপগুলির আশেপাশে বজ্রপাণি লোকনাথ বা লোকেশ্বর, বজ্রতারা[১১], অবলোকিতেশ্বর[১২] প্রভৃতি বৌদ্ধ-দেবদেবীর মূর্তি সাজানো ছিল। তাছাড়া

১১। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের মধ্যেই তারাদেবীর বিভিন্ন রকমের মূর্তি পাওয়া যায়। তারাদেবী আসলে হিন্দু—কি বৌদ্ধদেবী এ' নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকের অভিমত যে, প্রথমে যে শক্তি বৌদ্ধসমাজে পূজিত হয়েছিলেন তাঁর নাম 'তারা'। প্রাচীন হিন্দুতন্ত্রে তারাদেবীর নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় অনেকে এঁকে বৌদ্ধদেবী ব'লে অনুমান করেন। 'তারারহস্যবৃত্তিকা' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে তারার 'প্রজ্ঞাপারমিতা' এই বৌদ্ধ-নাম দেখা যায়। তিব্বতে মেলারেপার গুরুমার-পা, মেলারেপা, সরোহা, নারো-পা—এঁরা নাকি তারাদেবীর উপাসক ছিলেন। বৌদ্ধ-তারামঠের ঋষি অক্ষোভ্য। অক্ষোভ্য ধ্যানীবুদ্ধ। এই ধ্যানীবুদ্ধের পরমজ্ঞানের নামই প্রজ্ঞাপারমিতা বা তারাদেবী। হিন্দুতন্ত্রে তারাদেবী জ্ঞানশক্তিরূপে পরিচিতা। বৌদ্ধতন্ত্রে ২১ রকম তারার মূর্তিভেদের উল্লেখ আছে, যেমন মহত্তরী বা শ্যামতারা, খদিরবাণীতারা, সিতাতারা, জঙ্গুলীতারা, ভ্রূকুটিতারা, বজ্রতারা, রক্তা বা কুরুকুল্লা-তারা, নীলতারা বা একজটা প্রভৃতি। কথিত যে, ঋষি বশিষ্ঠ নাকি তারাদেবীকে চীনদেশ থেকে ভারতে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে একথা সমর্থিত নয়। শ্বেত, নীল, রক্ত, হরিদ্রা, সবুজ প্রভৃতি ভেদে তারার বর্ণভেদের উল্লেখ আছে। হিন্দুতন্ত্রে তারাদেবী শক্তির দ্বিতীয়া মূর্তি, যেমন কালী, তারা, ষোড়শী।

১২। অবলোকিতেশ্বর ধ্যানীবোধিসত্ত্ব। এই বোধিসত্ত্বকে ষড়ক্ষর, লোকেশ্বর বা লোকনাথও বলে। ইনি ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁর শক্তি পাণ্ডরাদেবী থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। বৌদ্ধ-'সাধনমালা'-গ্রন্থমতে ৩১ রকম মূর্তিতে অবলোকিতেশ্বর বিকশিত। অবলোকিতেশ্বর বা ষড়ক্ষর-লোকেশ্বরের শক্তি ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা ও মণিধর। ইনি একটি কল্প বা যুগের নিয়ামক।

হলটির ঠিক পাশের ঘরে বিরাট একটি শাকা-থুবা (শাক্য-স্থবির), মঞ্জুশ্রী[১৩] ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি দেখ্‌লাম। মূর্তিগুলির সাম্‌নে ছোট-ছোট বাটিতে কারণবারির অনুকল্পরূপে জল দিয়ে সাজানো আছে। তিব্বতের গুম্ফাগুলি যেমন অন্ধকারময়, লিকির-গুম্ফায়ও তাই। একজন লামা মাখমের প্রদীপ জ্বেলে মূর্তিগুলির মুখের সাম্‌নে ধ'রে আমাদের দেখাতে লাগ্‌লো। মূর্তিগুলির মুখ ও দেহ কমনীয় এবং প্রেম ও করুণার ভাবে পূর্ণ। ঘরটির দু'পাশে কাঠের তাকে প্রায় ২৫০ শত পুঁথি কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখা ছিল। ওটাই গুম্ফার লাইব্রেরী। লামাদের অনেকে বেশ শিক্ষিত ও বিদ্বান। লামাদের ভিতর যৌগিক-বিভূতিসম্পন্ন অনেকে আছেন। এমন কি অনেকে জন্মান্তর-সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞ।'

তারপর স্বামীজী মহারাজ বাস্‌গোর-গুম্ফার প্রসঙ্গ তুল্লেন। তিনি বল্লেন ঃ 'বাস্‌গো-গুম্ফাতে মৈত্রেয়-বুদ্ধের[১৪] মূর্তির তুলনা নাই। মূর্তিটি কাঠ, তামা ও সোনার পাত দিয়ে তৈরী। মৈত্রেয়বুদ্ধের বয়স ৮০ বছর, সুতরাং সেই রকম বয়সের মূর্তিই তৈরী করা হয়েছে। মূর্তি তিনতলা-প্রমাণ উঁচু। বাস্‌গো-গুম্ফাটি নাকি ইংরাজী ১৭শ (১৫৯০-১৬২৫) খ্রীষ্টাব্দে দেল্‌দানের পিতা রাজা সেংগে-নামজাল-কর্ত্তৃক নির্মিত। সেংগে-নামজালের মা ছিলেন মুসলমান-ধর্মাবলম্বী, কিন্তু তাহ্‌লেও বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক-ধর্মের উপর তাঁর বিশেষ অনুরাগ ও আসক্তি ছিল। তাই তিব্বতী-লামাদের মতো তিনি রক্তবর্ণ পোষাক পরে থাক্‌তেন। রাজা সেংগে-নামজাল 'স্তাগ-সঙ্গ-রস-চেন' বা ব্যাঘ্র-লামাকে তিব্বতে নিমন্ত্রণ

১৩। মঞ্জুশ্রীর রূপভেদ আছে। মঞ্জুশ্রীর গুরু অক্ষোভ্য। ইনি 'বাগীশ্বরী' নামেও পরিচিতা। বড়ুচণ্ডীদাসের দেবী বাশুলী, বাসলী বা বিশালাক্ষী বাগীশ্বরীদেবীরই অভিন্ন রূপ বা মূর্তি। মঞ্জুশ্রী বা বৌদ্ধ-বাগীশ্বরী বৌদ্ধধর্মে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অধিকাংশ মূর্তিতেই তাঁর একহাতে পদ্ম ও অপর হাতে একখানি গ্রন্থ থাকে। ঐ দুটিই মঞ্জুশ্রী-দেবতার আসল চিহ্ন। হিন্দুদেবী বাগীশ্বরী বা সরস্বতীর সঙ্গে এঁর তুলনা করা যায়। মঞ্জুশ্রীর শক্তির নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। এঁর কিরীটে কিংবা জটায় গুরু ধ্যানী-অক্ষোভ্যের মূর্তি থাকে ঃ 'সিংহাসনস্থং অক্ষোভ্যাক্রান্তমৌলিনম্'। মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষ পীতবর্ণ, ধর্মচক্রমুদ্রাধর ও তাঁর বাম হস্তে উৎপল বা পদ্ম। অনেকের মতে এই মঞ্জুশ্রী ও অক্ষোভ্যের কল্পনা হিন্দুদেবী দুর্গা ও শিব থেকে হয়েছে,—যদিও বৌদ্ধ-মঞ্জুশ্রী স্ত্রী নন,—পুরুষ দেবতা।

১৪। মৈত্রেয়-বুদ্ধ ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধিরই বিকাশ,—পঞ্চম মানুষীবুদ্ধ। বুদ্ধগণ সকলেই প্রায় সমান, তবে তাঁদের হস্তের মুদ্রাভেদ রূপভেদ কল্পিত হয়। এঁকে ইংরাজীতে *'Messiah of Buddhism'* বলা হয়।

ক'রে নিয়ে যান। ব্যাঘ্র-লামা বেশ উন্নত ধরনের তিব্বতী-সন্ন্যাসী ছিলেন। তিব্বতে হিমিশ-চেমরে, এশিসসঙ্গ ও হান্‌লে গুম্ফাগুলি ব্যাঘ্রলামাই নির্মাণ করান।

'পিতুক-গুম্ফাটিও সুন্দর। পাঁচশো বছর পূর্বে গ্যান্‌পো-বুমলডে ঐ গুম্ফাটি নির্মাণ করেছিলেন। গুম্ফাটি 'লে'-উপত্যকার উপর অবস্থিত। পিতুক-গ্রামখানি গুম্ফার অপর দিকে গড়ে উঠেছে। নীচু থেকে প্রায় ১০০০ ফিট চড়াই ক'রে উঠে গুম্ফার প্রবেশপথে উপস্থিত হলাম। একজন লামা সসম্মানে আমাদের গুম্ফার ভিতর নিয়ে গেল এবং বসার জন্য পিঁড়ি দিলে এবং কাঠের বাটিতে লাসার চা-সিদ্ধ জল, মাখন ও একটু ক'রে লবণ খেতে দিলে। তাছাড়া আর-একটি কাঠের বাটিতে ভাজা যবের ছাতু ও হাড়ের ছোট একটি চামচও দিলে। ঐভাবেই লামারা অতিথিদের সেবা করে।

'আহার শেষ ক'রে আমরা গুম্ফাটি ঘুরে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। গুম্ফাতে অসংখ্য কুলুঙ্গি! প্রত্যেক কুলুঙ্গিতে লামা, তাসিলামা বা কোন-না-কোন পিত্তল ও তামার তৈরী দেবদেবীর মূর্তি আছে দেখ্‌লাম। কোন-কোন কুলুঙ্গিতে পুঁথিও রাখা আছে। দু'একটিতে 'সূর-সুন্দরী' ও 'কর্ণ-পিশাচ-সুন্দরী' দেবীর মূর্তি আছে। তাঁরা সকলেই তান্ত্রিক-দেবী। যারা সিদ্ধাই বা সাধনায় বিভূতি (ঐশ্বর্য) চায় তাদের এঁরা সফলকাম করেন।[১৫] তিব্বতের লামাদের ভিতর এরকম অনেক তান্ত্রিক ও যোগসাধক আছেন—যাঁরা সিদ্ধাইয়ের (মানসিক-ক্ষমতার) পক্ষপাতী। যোগ-সিদ্ধাই-ক্ষমতাম্পন্ন অনেক লামাদের সন্ধানও তিব্বতে মেলে।

'পিতুক-গুম্ফার অল্প দূরে কাওচ-গুম্ফার ধ্বংসাবশেষ বিগত বালতিযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়কাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গে কলঙ্ককীর্তিও ঘোষণা করছে। খ্রীষ্টীয় ১৭শ অব্দে-মুসলমান-শাসনকর্তা শের-আলির তিব্বত অভিযানের কথা ঐতিহাসিক-মাত্রেই জানেন। 'লে'-বাজারের শেষে অত্যুচ্চ একটি পাহাড়ের মাথার উপর একটি প্রাচীন প্রাসাদ ও লামাদের মঠ ছিল। শের-আলি ঐ প্রাসাদ ও মঠ থেকে বহু দেববিগ্রহ ও বৌদ্ধ-পুঁথি আগুন লাগিয়ে ধ্বংস ক'রে দেয়। লামাদের শ্মশানভূমির মতো তিব্বতের কোথাও মুসলমানদের কবরভূমি দেখা যায় এবং তা' থেকে মুসলমানরা তিব্বতে যুদ্ধযাত্রায় গিছ্‌লো তা প্রমাণ হয়।

১৫। কি হিন্দু ও কি বৌদ্ধ এই উভয় তন্ত্রের দু'টি দিক আছে ঃ একটি পরমার্থজ্ঞানের ও অপরটি জাগতিক ঐশ্বর্য বা বিভূতির দিক। তন্ত্র-সাধনার আসল দিকই তত্ত্বজ্ঞান লাভ, অন্যটি ভোগের দিক।



হিমিস-গুম্ফা, লাদাক



Jesus Christ
This Picture is the oldest known,
found on a Tomb in the Catacombs.

কয়লায় অঙ্কিত যীশুখ্রীষ্টের প্রতিকৃতি

'এখন তিব্বতে বৌদ্ধধর্মই প্রবল আর তন্ত্রবাদের প্রচার যা আছে তা মহাযান-বৌদ্ধতন্ত্রবাদের প্রভাব বলা যায়। আমার মনে হয় যে, তিব্বতে তন্ত্রযান ও বজ্রযান ধর্মেরই প্রভাব অধিক। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের চমকপ্রদ ইতিহাস রেভারেণ্ড এ. এইচ. ফ্র্যাঙ্কে (Rev. A. H. Francke) ঃ *A History of Western Tibet*-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিব্বত-সম্বন্ধে আরও অনেক গ্রন্থ আছে। 'কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ'-গ্রন্থে আমি সামান্যভাবে পশ্চিম-তিব্বতে বা লাদাকে, চীনে, কোরিয়ায় ও জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। ওয়াভেল সাহেবের *Buddhism in Tibet*-গ্রন্থে তিব্বতের culture (সংস্কৃতি) ও religion (ধর্ম)-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা আছে।

'পূর্বেই বলেছি যে, তিব্বতের আদিম-অধিবাসীরা ভূত, প্রেত, পিশাচ ও গ্রহ-নক্ষত্রের উপাসক ছিল। মানুষের মাংসও তাদের আহার ছিল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, ভূত ও পিশাচরা গাছ, পাথর, সাপ প্রভৃতির দেহ আশ্রয় ক'রে পৃথিবীতে বাস করে, তাই মঙ্গল কামনার জন্য তারা ঐ'সবের পূজা ক'রে।

'ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির পূজাকে তিব্বতীরা 'বন্' বা 'পন্'-ধর্ম Bon-Religion বলে।[১৬] এই ধর্ম প্রবর্তন করেন সেন্‌রাব-মি-ভো নামে পশ্চিম-তিব্বতের একজন সাধক। সেনরাব-মি-ভো নিজে পিশাচসিদ্ধ ছিলেন। নানান্ ভাষা, বিদ্যা ও ঔষধ তাঁর জানা ছিল। ৩৬৬টি স্ত্রী ও অসংখ্য সন্তানের তিনি অধিকারী। প্রথম বয়সে তিনি সংসার-জীবন যাপন করেন। ৩১ বছর বয়সের সময়ে উগ্র তপস্যা ক'রে তিনি নাকি সিদ্ধিলাভ করেন ও 'বন্'-দেবতা 'সেন-হাও-কার' (শ্বেতবর্ণের জ্যোতির্ময় 'বন্')-এর আরাধনায় অলৌকিক সিদ্ধাই বা যোগশক্তির অধিকারী হন। তিনি ২৫ বছর ধরে চীনদেশে গিয়ে 'বন্‌ধর্ম' প্রচার করেন। সেই সময়কার কন্-গং-সিকে তিনি বন্‌ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর অমঙ্গল নিবারণের জন্য কবচ, মাদুলি ধারণের মন্ত্র, মুদ্রা, যন্ত্র প্রভৃতি নানান্ রকমের ম্যাজিক ও তুক্‌তাক্‌ও তিব্বতীদের শিখিয়েছিলেন। তাঁর প্রচারিত 'বন্‌ধর্ম' ধীরে ধীরে চীন ও তিব্বত ছাড়িয়ে মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান ও মধ্য-এশিয়ার নানান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

'বন্‌ধর্মের পুরোহিতদের বলা হয় 'বন্-পো'। বন্-পোরা নানান রকমের মন্ত্র উচ্চারণ ও তাদের প্রয়োগ ক'রে ভূত, প্রেত ও ডাকিনীদের সন্তুষ্ট ও

১৬। ইতালীর মনীষী 'টুচি' (Tucci) *The Religion of Tibet*-গ্রন্থেও 'বন্‌ধর্ম' সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

বশীভূত করে এবং তা দিয়ে রোগ-ব্যাধিরও আরোগ্য করে। বন্‌ধর্মের প্রধান দেবতার নাম 'লা-ছেনপো-মিগ-দুংপা,' অর্থাৎ ন'টি চোখবিশিষ্ট মহাদেব। এই মহাদেব-দেবতা মহাপরাক্রমশালী পৃথিবীর পতি অর্থে অধিপতি। বন্‌ধর্মের প্রধান দেবীর নাম 'জি-বৃজিদংথা-যস্মা',—অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের মুখশ্রী ও দু'হাতবিশিষ্ট দেবী। দেবী সিংহাসনাসীনা। সুতরাং আমাদের দেশে (বাংলায়) সিংহবাহিনী দুর্গার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে বাংলাদেশের দুর্গার বাহন একটি, আর বনধর্মের দুর্গার বাহন চারটি। তিব্বতের বন্‌-দুর্গা[১৭] চারটি সিংহের পিঠে সিংহাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। বন্‌-দুর্গা আদ্যাশক্তি ও লা-ছেন্‌পো নামক মহাদেবের পত্নী। লা-ছেন্‌পো শ্বেতবর্ণের মহাদেব। তিনি বৃষারূঢ়। দেবী জি-বৃজিদংথা দু'হাতে যেমন দু'টি দর্পণের উপর দু'টি প্রজ্জলিত মশাল ধ'রে আছেন, মহাদেব লা-ছেন্‌পা তেম্‌নি এক হাতে একখানি রুপার পুস্তক ধারণ ক'রে আছেন। সুতরাং বন্‌ধর্মের শিব ও পার্বতী রূপে ও আকারে একটু ভিন্ন হলেও আসলে তাঁরা যে হিন্দুধর্মের দেব-দেবী সেই-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিব ও দুর্গা-ছাড়া বাগ্‌দেবী-লক্ষ্মী, দয়াময়ী, বুদ্ধিদাত্রী প্রভৃতি দেবীরাও আছেন। তাঁরা সকলে সিংহাসনে উপবিষ্টা। এই প্রত্যেকটি দেবী বা শক্তির একজন ক'রে দেবতা আছেন। সেই দেবতাদের নাম বাগ্দেবতা, লক্ষ্মীদেবতা, দয়াময়ী-দেবতা প্রভৃতি। শক্তিদের দেবতারা সকলেই বৃষারূঢ়। বন্‌ধর্মে পাঁচটি দেবতা প্রধান। দেবী ও দেবতারা সকলেই শিব ও শক্তির বিকাশ, সুতরাং সকলে বৌদ্ধদেবীর ছদ্মবেশে যে হিন্দু দেবী বা দেবতা তা' বেশ বুঝা যায়।

১৭। তিব্বতের 'বন-দুর্গা' ও বাঙলাদেশের 'বনদুর্গা' সমশ্রেণীভুক্ত। পাশ্চাত্য মনীষী কেলেট্‌ তাঁর *A Short History of Religion* (পৃঃ ১০৫) গ্রন্থে 'বন-দিয়া' (Bono-Dea) দেবীর নামোল্লেখ করেছেন। 'বন-দিয়া' বনদেবী দুর্গা। রাজপুতনা-অঞ্চলে নারীদের মধ্যে এই দেবীর পূজার প্রচলন আছে। বাংলাদেশে সুন্দরবনে 'বন-বিবি'র পুজা আসলে বনদেবী 'শাকম্ভরী'-দুর্গার পূজা। মাননীয় টড তাঁর *Annals & Antiquities of Rajasthan* পুস্তকে (পৃঃ ৪৫৫) গৌরী, অন্নপূর্ণা ও একলিঙ্গ-শিবের নামোল্লেখ করেছেন গৌরী, অন্নপূর্ণা বা শাকম্ভরী বা বনদুর্গাই (—Cf. প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 'শ্রীদুর্গা,' পৃঃ ৭২-৭৪)। বনদুর্গা বা বন্‌-দুর্গার মতো 'লা-মো' ও 'সাই-লা-মো' তথা মহাকালী-দুর্গার পূজাও তিব্বতে প্রচলিত আছে। মনীষী ওয়াডেল তাঁর *Lamaism in Tibet*- গ্রন্থে 'লা-মো'—দেবীকে 'শ্রী'-দেবী এবং like her great prototype the goddess Durga of Brahmin' বলেছেন। আসলে সকলেই দেবী দুর্গার ভিন্ন-ভিন্ন নাম ও রূপ।

॥ তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন ও প্রচার ॥

'তিব্বতে-বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের প্রায় এক হাজার বৎসরের মধ্যে তাঁর ধর্মমতে নানান্ রকমের পরিবর্তন এসেছিল। বৌদ্ধধর্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য চারবার কিংবা পাঁচবার ধর্ম-সংসদ (Buddhist Council—বৌদ্ধ-মহাসংসদ) আহ্বান করা হয়।[১৮] খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিথিয়ান-রাজ কণিষ্ক জলন্ধরে যে সংসদ (Council) আহ্বান করেছিলেন, তাতে বৌদ্ধধর্ম দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল ঃ একভাগ পোষণ করলো প্রাচীন মতবাদ, আর অন্য ভাগ অন্যান্য জাতির দেব-দেবী প্রভৃতি ও নানান্ নূতন সংস্কারকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো *Northern Buddhism* নামে। প্রথমটিকে বলা হয় *Southern Buddhism,*-যা বিস্তারলাভ করলো সিংহল, শ্যাম, বর্মা প্রভৃতি দেশে। *Northern Buddhism* ছড়িয়ে পড়্লো উত্তর-ভারতের বাইরে চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে। বৌদ্ধরা প্রথমটিকে নাম দিলেন 'হীনযান', আর দ্বিতীয়টিকে 'মহাযান'। 'যান' অর্থে পথ বা ধর্মমত। তাছাড়া একযান, দ্বিযান, ত্রিযান প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্মমতের প্রচলন আছে। তাছাড়া তন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, প্রভৃতি ১৮টি বৌদ্ধমতবাদের উল্লেখ আছে।[১৯] হীনযান ও মহাযান ধর্মমত-দু'টির চরম-উদ্দেশ্য 'নির্বাণ'। এই উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে তাদের মধ্যে প্রথমে কোন মতভেদ ছিল না, কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে নাগার্জুন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মহাযান-মতবাদ প্রচার করেন,—যেটি আসলে মাধ্যমিক বা শূন্যবাদের প্রচার। হীনযান-মতাবলম্বীরা নিজেদের নির্বাণমুক্তির পথযাত্রী বলেন। আসলে 'সৌগত-প্রস্থান' নামে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মে মাধ্যমিক, যোগাচার সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই চারটি মতবাদের অভ্যুত্থান হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে

১৮। Buddhist Council কারু মতে চার বার, আবার কারু মতে পাঁচবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

The Buddhist Councils--

(ক) প্রথম বৌদ্ধ মহাসংসদ বুদ্ধের পরিনির্বাণের কিছুদিন পরে রাজগৃহে অনুষ্ঠিত হয় মহাকশ্যপের পরিচালনায়।

(খ) দ্বিতীয় মহাসংসদ হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণের ১০০ শত বৎসর পরে বৈশালিতে।

(গ) তৃতীয় মহাসংসদ পাটলিপুত্র-শহরে হয় সম্রাট অশোকেরই অধীনে।

(ঘ) চতুর্থ মহাসংসদের অনুষ্ঠান হয় কাশ্মীরে। শোনা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতকে সিথিযান বা শকরাজ সম্রাট কণিষ্ক নাকি জলন্ধরে একটি বৌদ্ধমহাসংসদ আহ্বান করেছিলেন।

১৯। এছাড়া স্থবিরবাদ, সর্বাস্তিবাদ, থেরাবাদ, প্রভৃতি মতবাদ আছে।

বাহ্যসত্তা বা external existence নিয়েই এই চারটি মতবাদের বাদানুবাদ।[২০] পূর্বোক্ত ঐ চারটি মতবাদী বৌদ্ধরা 'বিনয়পিটক'-অনুযায়ী প্রধানত সাধন করতেন। মহাযানীরা নিজেদের ছাড়াও সকল প্রাণীর মুক্তির কামনা করেন। তবে বিনয়পিটকে হীনযানীদের নিন্দা ও মহাযানীদের প্রশংসা করা হয়েছে। একই ধর্মসম্প্রদায়ের উপাসকদের মধ্যে বিবাদের মূল প্রাচীনকাল থেকেই পাওয়া যায়। ইসলাম এবং খ্রীষ্টধর্মেও তাই।'

'খ্রীষ্টপূর্ব ২৭২-২৩১ শতকে সম্রাট অশোক পাটলিপুত্রনগরে (পাটনা) তৃতীয় বৌদ্ধসংসদ (3rd Council) আহ্বান করেন। পরে তিনি নেপাল, কাশ্মীর, তিব্বত, লাদাক, ইয়ারকন্দ, চীন, মঙ্গোলিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন। পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় বৌদ্ধধর্মপ্রচারকরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল সম্রাট ধর্মাশোকের প্রচেষ্টায়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ব্রাহ্মীভাষায় লিখিত একটি প্রস্তরফলক থেকে জানা যায় যে, ভারতীয়-বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণই প্রথমে লাদাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে অসঙ্গ, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে শান্তরক্ষিত, ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মসম্ভব ও পরে ধর্মকীর্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ্য, শান্তিগর্ভ, বিশুদ্ধসিংহ, কমলশীল, কুমার, শঙ্কর-ব্রাহ্মণ, শীলমঞ্জু, অনন্তবর্মা, কল্যাণমিত্র, ধর্মপাল, প্রজ্ঞাপাল, গুণপাল ব্যতীত পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণ তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারসাধন করেন। এই বৌদ্ধাচার্যদের অনেকেই নালন্দা ও বিক্রমশীলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তক্ষশীলা এবং ওদন্তপুর-বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যাকেন্দ্রের দানও উল্লেখযোগ্য। মহারাজ থিস্রং-দৈৎসানের সাহায্য নিয়ে পদ্মসম্ভব যেমন ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধ মঠ বা বিহার প্রতিষ্ঠা করেন, খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে তাঁর পৌত্র রালপাচন তেম্‌নি তিব্বতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলিকে তিব্বতীভাষায় অনুবাদ করতে পণ্ডিতদের নিযুক্ত করেছিলেন। তাতে ক'রে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম দ্রুতভাবে প্রসারলাভ করেছিল।'

এমনি ক'রে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বামীজী মহারাজের (স্বামী অভেদানন্দের) কাছ থেকে তিব্বত ও দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি-সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং সংগ্রহও করেছিলাম প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য।

২০। সর্বাস্তিবাদীরা realist. এরা সকল বাহ্যবস্তুর সত্তা স্বীকার করে। এরাই পরে বুদ্ধের মূর্তিগঠনের পক্ষপাতী হয়।

॥ স্মৃতি ঃ তেইশ ॥

আমরা ঃ. 'মহারাজ মুক্তি তো দু'রকম—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'যতদূর মনে পড়ে, এ'সম্বন্ধে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি পূর্বে। মুক্তি সাধারণত তিন রকম,—জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। ক্রমমুক্তির কথা গীতা স্বীকার করে। অদ্বৈতবেদান্তে প্রধানত জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির আলোচনা আছে,—তাও শঙ্করপন্থীদের মধ্যে দু'রকম। অদ্বৈত-যুক্তিবাদীদের মধ্যে শঙ্কর জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন। আমরাও তাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের সিদ্ধান্তও তাই।

'কি জানো?—শরীর থাক্‌বে এবং জীবিতকালেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হবে—এর নামই জীবন্মুক্তি, আর শরীর বা অজ্ঞান থেকে সৃষ্টি জড়শরীর নষ্ট হ'লে, কিংবা অদ্বৈতসাধনায় বিচার করতে করতে জড়শরীরের নাশের বা মৃত্যুর পর যে ব্রহ্মের উপলব্ধি, তার নাম বিদেহমুক্তি। বি-দেহ,—অর্থাৎ অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য বা পরিণাম শরীর এবং তার নাশের পর ব্রহ্মোপলব্ধি—এর নাম বিদেহমুক্তি। প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে চৈতন্যময় আত্মা এবং সমস্ত প্রাণী, পদার্থ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত যে বৃহৎ ও অখণ্ড-চৈতন্য পরমাত্মা এ'দুটির মধ্যে যখন ঐক্য-জ্ঞান হয় তখনই ব্রহ্মানুভূতি হয়। ব্রহ্মের জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নয়, ব্রহ্মই জ্ঞান। বেদান্তে একে সার্বিকজ্ঞান বলে,—অর্থাৎ যে ব্রহ্মের স্বরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীতে ও পদার্থে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান। এরই নাম সার্বিকজ্ঞান। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রই তাই—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্, যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' এই জ্ঞান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়েছিলেন তাঁর অজ্ঞান ও মোহ নষ্ট করার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—

> 'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
> দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ (১১।৮)

অর্জুনের ঐ দিব্যচক্ষুই অলৌকিক ও অসাধারণ জ্ঞানময় চক্ষু। জড়-চর্মচক্ষু দিয়ে চৈতন্যকে দর্শন করা যায় না।'

আমরা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ঃ 'মহারাজ, শুনেছি যে, অদ্বৈতজ্ঞানরূপ জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ না পেলে ব্রহ্মানুভূতিলাভ করা যায় না, কিন্তু জীবন্মুক্তিও

তো সকল অদ্বৈতবাদীরা স্বীকার করেন না, তাই অনেকে বলেন যে, বিদেহমুক্তিই শাস্ত্রসঙ্গত, কেননা জীবন্মুক্তিতে দেহ থাকে, সুতরাং কিছুটা অজ্ঞান থাকে, আর কিছুটা অজ্ঞান থাক্‌লে ব্রহ্মজ্ঞানই বা হবে কেন? শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কার্য ধ্বংস করে,—'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মাসাৎ কুরুতেঽর্জুন।' দেহরূপ একটু অজ্ঞান থাক্‌বে, অথচ ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হবে—এটাই বা কেমন ক'রে হয়! একটু অজ্ঞানও তো অজ্ঞান বা অবিদ্যা?—সুতরাং অবিদ্যা থাক্‌তে বিদ্যা বা জ্ঞান হয়—একথা অসঙ্গত বলে মনে হয়।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'সে'কথা তো পূর্বেও তোমাদের বলেছি যে, শঙ্কর ও বহু শঙ্করমতাবলম্বীরা জীবন্মুক্তি মানেন, কিন্তু আবার বহু অদ্বৈতবাদী শরীর থাকা-কালে মুক্তি অর্থাৎ জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে, অজ্ঞানরূপ শরীর থাক্‌লো আবার ব্রহ্মজ্ঞানও হ'লো,—এ' ক্যামন ক'রে হয়?

'তোমরা ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ সূত্র—'তত্তু সমন্বয়াৎ'-এর উপর শঙ্করভাষ্যটা পড়্‌বে, তাহলেই শঙ্করের বক্তব্য বুঝ্‌তে পারবে।'

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'হ্যাঁ মহারাজ, গীতায় তো জীবন্মুক্তির কথা স্পষ্টই বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'হ্যাঁ, সে'কথাও তো বলেছি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪ থেকে ৫৮ শ্লোক-পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতপ্রজ্ঞ-পুরুষের স্বভাব ও প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে। এই স্থিতপ্রজ্ঞই জীবন্মুক্ত-পুরুষ। তাঁর স্বভাব বা প্রকৃতি হ'ল 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'।

'তাছাড়া স্থিতপ্রজ্ঞের বা জীবন্মুক্ত-পুরুষের কথা আছে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগের আলোচনাপ্রসঙ্গে। সেখানে (১৮শ অধ্যায়ে) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।'

*   *   *   *

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥' (১৮।৫৪)

'একেই 'বুদ্ধিযোগ' বলে, আবার 'জ্ঞাননিষ্ঠা' বলে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মধুসূদন সরস্বতী তাঁর 'গূঢ়ার্থদীপিকা'-ভাষ্যে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিব প্রসঙ্গে জীবন্মুক্তি যে শাস্ত্রসঙ্গত ও প্রমাণসম্মত তা স্বীকার করেছেন। তোমরা ঐখানে মধুসূদনীভাষ্যের বিচার দেখে নেবে। মোটকথা অজ্ঞান বা অবিদ্যার পরিণামরূপ শরীর থাকাকালেও মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান

উপলব্ধি করতে পারে—তাতে কোন দোষত্রুটি হয় না। শঙ্করও তাঁর গীতাভাষ্যে ও বিশেষ ক'রে বেদান্ত-সূত্রের 'তত্তু সমন্বয়াৎ' (১।১।৪)-ভাষ্যে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন, সুতরাং তা' তোমরা দেখে নেবে। এ'সম্বন্ধে আলোচনা আমি পূর্বে তোমাদের কাছে করেছি,—তোমরা ভুলে গ্যাছো।'

আমরা ঃ 'আচার্য শঙ্কর 'তত্তু সমন্বয়াৎ'-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মানুষ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা-কালেই জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ লাভ করে,—'তস্মাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ সশরীরত্বস্য, **সিদ্ধং জীবতঃ অপি বিদুষঃ অশরীরত্বম্**।' ১।১।৪।১৯৪ তাছাড়া একবার ব্রহ্মজ্ঞান যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন তাঁদের আর কোনদিনই সংসার-বন্ধনরূপ অজ্ঞান আসে না,—'তস্মাৎ ন অবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্বং সংসারিত্বম্।' ১।১।৪।১৯৭ বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৪।৪।৭) আছে যে, সাপের খোলস যেমন সাপের মতো দংশন ক'রে অনিষ্ট করে না, তেম্‌নি জীবতকালেও ব্রহ্মানুভূতির পর আর অজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন (সংসারবন্ধনরূপ) অনিষ্টসাধন করতে পারে না,—'অহির্নির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতা এবমেব ইদং শরীরং শেতে, অথ অয়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্ম এব তেজ এব।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'হ্যাঁ, দেখ্‌ছি তোমাদের তো ঠিক উপনিষদের কথা মনে আছে। ঠিক বলেছ। বৃহদারণ্যকেই আছে ঃ 'সচক্ষুঃ অচক্ষুঃ ইব, সকর্ণঃ অকর্ণঃ ইব, সবাক্ অবাক ইব, সমনা অমনা ইব, সপ্রাণঃ অপ্রাণঃ ইব।' ১।১।৪।১৯৫ সেজন্য গীতা বলেছে ঃ 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা।' ব্রহ্মানুভূতির পর আর অন্য ভাষা কি?—আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত-ব্রহ্ম।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে যেখানে জীবন্মুক্তির কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ, সেখানে মধুসূদন সরস্বতী তাঁর ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর থেকে বিচার কি কিছু ভিন্নভাবে করেছেন?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'এখন মধুসূদন সরস্বতীর ভাষ্য কি আর হুবহু কণ্ঠস্থ আছে যে তোমাদের ব'লে শোনাব? আচ্ছা দাও। শেল্‌ফে ঐ তিনটি মোটা বই যে পাশাপাশি আছে, তাদের ঐ third part-টা (তৃতীয় ভাগটা) আমায় এনে দাও, পড়ে বলি।'

এখানে উল্লেখ করি যে, স্বামীজী মহারাজ গীতার যখন নিয়মিতভাবে ক্লাশ করতেন, তখন শ্রদ্ধেয় দামোদর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত তিনখণ্ড গীতা নিয়েই ক্লাশ বা আলোচনা করতেন। দামোদর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত গীতায় শঙ্কর,

রামানুজ, শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি সাত-আটটি ভাষ্য একসঙ্গে আছে। সুতরাং আমাদের মধ্যে একজন স্বামীজীর সেল্‌ফে রাখা ঐ গীতার তৃতীয় ভাগটি এনে অষ্টাদশ অধ্যায়টি খুলে স্বামীজী মহারাজকে দিলেন। স্বামীজী মহারাজ পড়ার চশমাটি চোখে দিয়ে বল্লেন ঃ 'যদিও গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫১ থেকে ৫৩ শ্লোকগুলি জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞানী বা জীবন্মুক্ত-পুরুষের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, তাহলেও ৫৪ শ্লোকটি ব্যাখ্যা করলেই জীবন্মুক্ত-পুরুষের প্রকৃতিসম্বন্ধে জানা যায়। গীতার ১৮।৫৪ শ্লোকটি হ'ল—

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥'

'এই ১৮।৫৪ শ্লোকের ভাষ্যে মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন ঃ 'ব্রহ্মভূতঃ অহং ব্রহ্মাস্মীতি দৃঢ়নিশ্চয়বান'...প্রভৃতি। এর পূর্বে ১৮।৫৩ শ্লোকের ভাষ্যে মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন ঃ 'স্বশরীরযাত্রার্থমাদায় পরমহংসপরিব্রাজকো ভূত্বা নির্ম্মমো দেহজীবনমাত্রেঽপি মমকাররহিতঃ। অতএব অহংকারাভাবাৎ অপগতহর্ষবিষাদত্বাৎ শান্তশ্চিত্তবিক্ষেপরহিতো যতির্জ্ঞানসাধনপরিপাকক্রমেণ ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় কল্পতে সমর্থো ভবতি।'[১]

'এরপর ১৮।৫৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥'

'এখানে বুদ্ধিযোগের ফল জ্ঞাননিষ্ঠার কথা বিশেষভাবে বলেছেন মধুসূদন সরস্বতী। তিনি বলেছেন ঃ 'নিদিধ্যাসনাত্মিকয়া জ্ঞাননিষ্ঠয়া মাং অদ্বিতীয়মাত্মানমভিজানাতি সাক্ষাৎকরোতি। ...মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা

১। সদানন্দ-যতিকৃত 'বেদান্তসার-গ্রন্থে'ও আছে—

(১) 'ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।' 'বৃত্তি'-ই সংস্কার ও অজ্ঞানের কার্য। এজন্য 'ব্রহ্মাস্মীতি-অখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরুদেতি। সা (বৃত্তিঃ) তু চিৎপ্রতিবিম্বসাহিতা সতী প্রত্যগভিন্নমজ্ঞাতং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য তদগতাজ্ঞানমেব বাধতে।'

এজন্য 'জীবন্মুক্তানাম্ স্বস্বরূপ-অখণ্ডশুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানেন-তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে সতি অজ্ঞানতৎকার্যসঞ্চিতকর্মসংশয়বিপর্যয়াদীনাং অপি বাধিতত্বাৎ অখিলবন্ধরহিতোব্রহ্মনিষ্ঠঃ।'

ব্রহ্মবৃত্তি (ব্রহ্মসংস্কারের) দ্বারা অজ্ঞানসংস্কার ধ্বংস হয় এবং ব্রহ্ম (আলোকস্বরূপ) নিজের বৃত্তিসংস্কারকেও ধ্বংস করে। এভাবেই ব্রহ্মের উপলব্ধি সার্থক হয়।

অহমস্ম্যখণ্ডানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকৃত্য বিশতে অজ্ঞানতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ সর্বোপাধিশূন্যতয়া মদ্রূপ এব ভবতি।' 'মদ্রূপ' বল্‌তে ব্রহ্মরূপ,—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানদশায় সাধক ব্রহ্মস্বভাব প্রাপ্ত হন। এরপর প্রারব্ধকর্মভোগের জন্য দেহপাতের আর কোন দরকার হয় না, দেহ-থাকাকালেই ব্রহ্মরূপ, ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মস্বভাব প্রাপ্ত হন সাধক।

'এখানে মধুসূদন সরস্বতী জীবন্মুক্তিই স্বীকার করেছেন। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সমকালেই কৈবল্য বলতে ব্রহ্মানুভূতির পর অজ্ঞান থেকে চিরমুক্ত হন সাধক। এই অজ্ঞান বা জীবাশ্রিত অজ্ঞান অথবা অজ্ঞানসংস্কার ব্রহ্মজ্ঞানসংস্কারের দ্বারা নষ্ট (ধ্বংস) হয়। এখানে মধুসূদন সরস্বতী বিবরণকার শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদ ও অন্যান্য বিবরণমতের আচার্যদের কথা ও তাঁদের প্রমাণের উল্লেখ ক'রে বলেছেন ঃ 'সাক্ষাদাত্মাশ্রয়াদেবাজ্ঞানসংস্কারাৎ তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারনিবর্ত্ত্যাদন্তঃ-করণস্থিত্যবধেরিতি বিবরণকৃতঃ।

'এই প্রসঙ্গে অজ্ঞানসংস্কার বলতে 'অজ্ঞানলেশ' বুঝ্‌তে হবে। ব্রহ্মজ্ঞানের পর শরীর ও ইন্দ্রিয়েরা থাকে, তারা অজ্ঞানের কার্য বা পরিণাম ব'লে তাদেরই অজ্ঞানলেশ বা 'সামান্য-কিছু অজ্ঞান' বলা হয়। মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন ঃ 'অজ্ঞানলেশপদেনাপ্যয়মেব সংস্কারো বিবক্ষিতঃ।' এই অজ্ঞানলেশ নষ্ট বা ধ্বংস হয় শরীরপাতের পর,—'তচ্চ মৃতিকালে দু'খটমিতি তত্ত্বজ্ঞান-সংস্কারনাশ্যতা তস্য অভ্যুপেয়া', সুতরাং অজ্ঞানসংস্কার তত্ত্বজ্ঞানরূপ ব্রহ্মজ্ঞানসংস্কারের দ্বারা নষ্ট বা ধ্বংস হয়।

'শোন,—এই প্রসঙ্গে বিশদ বিচার করেছেন বিভিন্ন অদ্বৈতবাদীরা (বার্তিককার, ও বিদ্যারণ্য মুনি প্রভৃতি)। তবে বিবরণাচার্য প্রকাশাত্ম-যতি অজ্ঞানসংস্কাররূপ অজ্ঞানলেশ (দেহ-ইন্দ্রিয়াদি) বা অবিদ্যালেশ থাক্‌লেও জীবৎকালে ও দেহথাকাকালে ব্রহ্মানুভূতি স্বীকার করেছেন। তাঁরা চক্রভ্রমণের মতো ('চক্রভ্রমিবৎ'),—অর্থাৎ কুম্ভকারের ঘট-শরাবাদি তৈরী করার চাকায় ঘট-শরাবাদি তৈরী হ'য়ে গেলেও (সমাপ্ত হলেও) চক্রযন্ত্র (কুলাল) আরও কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকে, সুতরাং বিদেহমুক্তির পরিবর্তে জীবন্মুক্তি সিদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত। ন্যায়-বৈশেষিকদের মতবাদ এ'ভাবেই খণ্ডিত হয়েছে। তাই গীতার ১৮।৫৫ শ্লোকে 'ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ' কিংবা 'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা' কথাগুলি বেশ মনে রাখ্‌বে, কেননা দু'বার 'তত্ত্বতঃ'-শব্দ ব্যবহার করার অর্থই হ'ল যে, ব্রহ্ম পরমচৈতন্যরূপে বিভু ও নিত্য এবং শাশ্বত ও সর্বব্যাপী আনন্দঘন—এ' তত্ত্বই উপলব্ধি করতে হবে। এজন্য এখানে

'তত্ত্বতঃ'-শব্দের অর্থ মধুসূদন সরস্বতী করেছেন,—'যশ্চ পরিপূর্ণসত্যজ্ঞানানন্দ -ঘনঃ সদা বিধ্বস্তসর্বোপাধিরখণ্ডৈকরস' এবং 'অহমস্ম্যখণ্ডানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকৃত্য' প্রভৃতি। অজ্ঞান ও তার কার্য নিবৃত্ত (নষ্ট) হ'লে তবেই সকল উপাধিশূন্য একরস বা অখণ্ডৈকরস সত্য-জ্ঞান আনন্দঘন ব্রহ্মভাবকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই ব্রহ্মানুভূতির পর সাধক সর্ববন্ধনহীন অখণ্ড ও একরস ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করেন। মনুষ্যদেহধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও অবস্থা এখানে সর্বদা স্মরণ করবে।'

স্বামীজী মহারাজ পড়ার শেষে গীতাটি আমাদের হাতে দিয়ে সেল্‌ফে রাখ্‌তে বল্লেন। তারপর আমাদের লক্ষ্য ক'রে বল্লেন ঃ 'মধুসূদন সরস্বতী দুর্ধর্ষ নৈয়ায়িক ও বেদান্তী দু'ই ছিলেন, এজন্য তাঁর গূঢ়ার্থদীপিকার বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত খুবই সুন্দর ও প্রামাণিক। ব্রহ্মানুভূতি নিজের জীবনে না হ'লে এতো সুনির্দিষ্ট ও সঠিকভাবে বিচার ক'রে অদ্বৈতমত স্থাপন করা বড় কঠিন। তোমাদের জীবনকেও এ'ভাবে পরিচালিত করতে হবে,—অর্থাৎ তোমরা যখন সংসার ত্যাগ করেছ ও সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিয়েছ, তখন 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্',—এই রকম বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে যে, হয় এই জীবনে ব্রহ্মোপলব্ধি হবে,—নয় মৃত্যু। শরীর তো আজ আছে—কাল নেই। সংসারও তাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এজন্য সংসারকে ঊর্দ্ধমূল ও অবাক্ বা নিম্নদিকে বিস্তৃত শাখাবিশিষ্ট অশ্বত্থগাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সংসার আজ আছে কাল নেই, সুতরাং অনিত্য ও অশ্বত্থ!'

আজ এখানেই আমাদের আলোচনার শেষ হয়।

॥ স্মৃতি ঃ চব্বিশ ॥

সে'দিন স্বামী অভেদানন্দের ডায়েরী "জীবন-কথা" নকল করার কথা উঠতে আমরা এটা-সেটা প্রশ্ন শুরু করলাম। তিনি বল্লেন ঃ 'একটু বসো, এই চিঠিটা পড়েনি।' চিঠি পড়া শেষ হ'লে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন ঃ 'ইংল্যাণ্ডের ঘটনা তো আমাদের 'বিশ্ববাণী'-পত্রিকায় কিছু-কিছু বেরিয়েছে, বাকি সব ঘটনা, আমেরিকার পঁচিশ বছরের ঘটনাই আমার ডায়েরীতে লেখা আছে। তবে অসাধারণ খাট্‌তে হবে, কারণ ডায়েরীতে যা লিখেছি তা এতই সংক্ষিপ্ত যে, বিস্তৃত-কিছু জানার জন্য আমার কাছে বসে জেনে নিতে হবে। আমার প্রচারকার্যের ঘটনা ঘাঁট্‌তে ঘাঁট্‌তে স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) জীবনেরও বহু নতুন অপ্রকাশিত ঘটনা পাবে। স্বামীজীর জীবনের বহু ঘটনা তো এখনো অপ্রকাশিত আছে।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, আপনার জীবন যে কত বিরাট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ তা' ইংরাজী-ডায়েরীর কয়েকটা পাতা ওল্‌টাতেই বুঝ্‌তে পেরেছি। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অতীত-ইতিহাসের বহু উপাদানই ছড়ানো আছে আপনার ডায়েরী-বুকে। এ'গুলির প্রকাশ হওয়া একান্ত আবশ্যক।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'তা তো বুঝি, কিন্তু নিজের ঢাক নিজে আর কত পেটাবো বলো! তাই তো বলি যে, আমার মুখ থেকে তোমরা সব-কিছু শুনে নাও, তারপর লেখ। তাছাড়া দেখ্‌তে পাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা, ভাব ও আদর্শ ওদেশের (পাশ্চাত্যের) লোকেরা কিভাবে ও কত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।'

স্বামীজীকে তামাক দেওয়া হ'ল। তিনি তামাক খেতে খেতে বল্লেন ঃ 'আমেরিকায় একদিন[১] ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি ক্যামন ক'রে হ'তে পারে এই ছিল আমার আলোচনার বিষয়। কিংস্‌-কলেজে তার পূর্বের দিন *Relation of Soul to God* (আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক) বিষয়ে বক্তৃতা ছিল। কর্ণওয়েল-ইউনিভারসিটিতে সেই বক্তৃতা হয়। অধ্যাপক টাইলরের (Prof. Tylor) সঙ্গে দর্শনের বিষয় নিয়ে বহুক্ষণ আলোচনা হয়েছিল। কিংস-কলেজে আমার বক্তৃতার পূর্বে ডঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড, ডঃ রাইট প্রভৃতি অধ্যাপকরা

১। ইংরেজী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫ই জানুয়ারী, বুধবার।

বক্তৃতা করেন। প্রায় একঘণ্টা ধ'রে নানান্ দিক থেকে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কি ক'রে উন্নতি হ'তে পারে সেই সম্বন্ধে বল্লাম। ডঃ সাণ্ডারল্যাণ্ডের সঙ্গে পূর্বে থেকে আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আমায় একান্তভাবে ভালবাসতেন।

'আর একদিন ডাঃ স্মিথ (Dr. Smith) নিউ-চার্চ-ক্লাবে কিছু বলার জন্য আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন।[২] ডাঃ স্মিথ ছিলেন সোয়েণ্ডেন-বর্গিয়ান্-মিনিষ্টার *(Swendenborgian Minister)*। সেখানে আমি 'বেদান্ত'-সম্বন্ধে কিছু বল্লাম। খ্রীষ্টান মিনিষ্টারদের (ধর্মাচার্যদের) ভিতর ডাঃ স্মিথ অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মন দিয়ে আমার বক্তৃতা আগাগোড়া শুন্‌লেন, কোন প্রতিবাদ করেন নি।

'কিন্তু একবার হলো কি?—একদিন মট্ মেমোরিয়াল-হলে *(Mott Memorial Hall)* আমার সাধারণ বক্তৃতা ছিল *Sin and Sinner* (পাপ ও পাপী) সম্বন্ধে।[৩] বক্তৃতার পরের দিন আমেরিকার 'আউট্‌লুক' *(Outlook)*-পত্রিকায় বেশ দীর্ঘ একটা সমালোচনা প্রকাশিত হ'ল। 'আউটলুক'-পত্রিকা ছিল নিউইয়র্কের গোঁড়া-খ্রীষ্টানমহলের একখানি বিখ্যাত পত্রিকা। তার সম্পাদক ও সত্তাধিকারী ছিলেন মিষ্টার ব্র্যাড্‌ফোর্ড (Mr. Bradford)। তিনি সমালোচনার রিপোর্ট (বিবরণ) পড়ে তাঁর সঙ্গে দেখার করার জন্য আমায় নিয়ন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম, ভাবলাম দেখাই যাক্—কি হয়। পরের দিন বেলা সাড়ে-বারোটার সময়ে ব্রাড্‌ফোর্ডের সঙ্গে আমি দেখা করি। তিনি সসম্মানে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন। আলোচনার সূত্রপাত হ'ল খ্রীষ্টান-বাইবেলের ওল্ড-টেষ্টামেন্টে যে আদমের (Adam) কথা আছে—তাই নিয়ে। খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, ইভের পাপেই আদমের পৃথিবীতে অবতরণ হয়েছিল। সয়তান (Satan) ইভকে প্রলোভন দেখিয়ে স্বর্গরাজ্য থেকে পৃথিবীতে টেনে এনেছিল। 'দি হায়ার-অথরিটি-অব-চার্চিয়ানিটি' (খ্রীষ্টানচার্চের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক লোক) সেণ্ট পলও (St. Paul)[৪] সেই ধারণার কোন সংশোধন করেন নি, বরং সমর্থনই করেছিলেন। ফলে খ্রীষ্টানদের ভিতর আদম ও ইভের ঘটনাটি চিরদিনের জন্য রহস্যাবৃতই থেকে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আদম

২। ইংরেজী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ, ২২শে জানুয়ারী, সোমবার।

৩। ইংরেজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২০শে মার্চ রবিবার।

৪। সেন্ট পল যীশুখ্রীষ্টকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেন নি, তবে একবার নাকি স্বপ্নে দেখেছিলেন।

ও ইভের বংশধরদের (পৃথিবীর হতভাগ্য মানুষদের) কপালেও *eternal damnation*-এর (অনন্ত নরকের) ব্যবস্থা কায়েমী হ'য়ে গেল। *Last day of Judgement*-এর (শেষ-বিচারের) দিন ট্রাম্‌পেটের (*trumpet*—ভেরী বা শিঙ্গা) শব্দে মৃতাত্মারা যে যার কবর থেকে উঠে জিহোবার কাছে যায়। জিহোবা ব'সে থাকেন হাতে দণ্ড নিয়ে (*'with a rod in hand'*) স্বর্ণ-সিংহাসনের উপর। ক্রোধে তাঁর চক্ষু-দু'টি রক্তবর্ণ। তারপর বিচার আরম্ভ হয়। তখন আত্মাদের ভাগ্যে হয় অনন্ত নরক,—নয় অনন্ত-স্বর্গ। আমি ব্র্যাড্‌ফোর্ডকে বল্লাম ওল্ড-টেষ্টামেন্টের মতবাদ (অভিমত) সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পাপের অর্থই *imperfect knowledge* (অসম্পূর্ণ জ্ঞান) বা *ignorance* (অজ্ঞান)। অজ্ঞানতাই মানুষকে সংসারে স্বার্থপর করে। স্বার্থপরতাই মহাপাপ, নইলে পাপ ব'লে পৃথক কোন বস্তুর অস্তিত্ব সারা-দুনিয়ায় নেই। জ্ঞানোন্মেষে সত্যজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে ভ্রম বা অজ্ঞানতা (মিথ্যাজ্ঞান) নষ্ট হয়। মানুষের অজ্ঞানতারূপ মিথ্যাজ্ঞানই পাপ এবং পাপকেই খ্রীষ্টানরা 'নরক' (eternal damnation) বলে। আসলে জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান-অন্ধকারের নাশকে তারা নরক থেকে স্বর্গে যাওয়ার কল্পনা করে।

'ব্রাড্‌ফোর্ড আমার কথার কোন প্রতিবাদ না ক'রে নিবিষ্ট মনে শুনে যাচ্ছিলেন। তারপর আমি বল্লাম ঃ 'Punishment and reward are the reactions of man's own actions' (শাস্তি ও পুরস্কার মানুষের নিজেরই কৃতকর্মের ফল)। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও তাই। Action brings its reaction (কাজই তার ফল সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে)। যে কর্মের ফল আমাদের অনুকূলে হয় তাকে আমরা বলি 'পুণ্য', আর ভাল বা *pleasing* (সুখকর) না হ'য়ে প্রতিকূল হ'লে তাকে বলি 'পাপ' বা মন্দ। দুনিয়ার সকল জিনিসই আপেক্ষিক (relative) ও changing (পরিবর্তনশীল)। পাপ ও পুণ্য তাই আপেক্ষিক। আলোক যেমন অন্ধকারের কথা জানিয়ে দেয়, গরম যেমন ঠাণ্ডার কল্পনা আনে, পাপ তেম্‌নি পুণ্যের ধারণা সৃষ্টি করে। এক্‌টা থাকলেই অপরটা থাকে। যেখানে এক্‌টা নেই, সেখানে অপরও নেই। বেদান্ত ব্রহ্মকে পাপ ও পুণ্যের অতীত বলে। ব্রহ্ম এক ও দু'য়ের অতীত। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-কথার সত্যকারের অর্থ এক ও অদ্বিতীয়ের অতীত-সত্তা,—'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্'। পাপ ও পুণ্য যেন *negative and positive poles of a magnet* (এক্‌টা চুম্বকপাথরের নেতি ও ইতি-বাচক দু'টো দিক)। *Negative* ও *positive* এর মাঝখানটা চুম্বকের *neutral point* (নিরপেক্ষ স্থান)। *Neutral point*

কিনা *negative* ও *positive* এই দু'টো দিকের *meeting* ও *balancing* (মিলন বা সমতারক্ষক) স্থান; অথবা বলা যায় *neutral point*-এ *negative* নেই, *positive*-ও নেই। এটা ঠিক 'no man's land'-এর (নিরপেক্ষ স্থানের) মতো। ব্রহ্মে নেতি বা ইতিবাচক কোন জিনিষেরই অস্তিত্ব নেই[৫], অথচ ব্রহ্ম সকলেরই আধার বা ground. ব্রহ্ম (সগুণ-ব্রহ্ম) থেকেই বিশ্বের সকল-কিছুর বিকাশ সম্ভব হয়েছে। বাদরায়ণ-ব্যাস 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-ব্রহ্মসূত্রে (১।১।২) এ'কথা স্বীকার করেছেন। শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে শক্তিমান ও সগুণ-ব্রহ্ম থেকেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। সগুণ-ব্রহ্মে তাই এক আছে, দুইও আছে। তাঁতে বহু আছে, আবার সব মিশে একাকার হয়েছে,—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত কোনটাই নেই। মিষ্টার ব্র্যাড্‌ফোর্ড নির্বাক হ'য়ে আমার কথা শুন্‌ছিলেন। দেখ্‌লাম—তিনি খুব খুসী হয়েছেন। ব্র্যাড্‌ফোর্ড পণ্ডিত ও নিরভিমানী মানুষ ছিলেন, কাজেই সত্যের মর্যাদা তিনি দেবেনই।'

আমরা বল্লাম : 'মট্-মেমোরিয়াল'-হলে যে সমস্ত বক্তৃতা আপনি দিতেন, 'নিউ ইয়র্ক-টাইমস্' *(New York Times)*-পত্রিকায় (March 21, 1898) তাদের অনেক কমেণ্টস্ (comments—মন্তব্য) বেরিয়েছিল। আপনার আলমারীতে রাখা পেপার-কাটিংস্-এ *(paper cuttings)* আমরা অনেকগুলি ঐরকম ধরনের মন্তব্য পড়েছি। তাথেকে ওদেশে আপনার বক্তৃতার যে খুব আদর হয়েছিল বুঝা যায়। 'নিউ ইয়র্ক-টাইমস্' পত্রিকায় একটি মন্তব্য যেমন : 'Swami Abhedananda has the advantage of a remarkable

৫। ঠিক এই ধরনের আলোচনা করেছেন স্বামী অভেদানন্দ তাঁর *Self-Knowledge* (১৭-২৮ পৃষ্ঠায়) এবং *True Psychology* গ্রন্থদুটিতে। তিনি বলেছেন : 'The positive pole is the subject, the negative pole is the object ; but they both exist in the same Substance, * *. That is monism, when we look at the neutral point of the magnet, we do not see the positive end and the negative end.' স্পিনোজা, ব্রার্টাণ্ড রাসেল, অধ্যাপক হোয়াইটহেড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকরাও ঈশ্বর বা ব্রহ্ম (God the Absolute)-সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে mental and physical, mind and matter অথবা thought and extension-কে positive ও negative poles বলেছেন। তবে তাঁদের আলোচনায় neutral zone ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ঠিক subject ও object থেকে নির্মুক্ত নয়, বরং সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ neutral zone বল্‌তে ব্রহ্মকে সর্বগুণবর্জিত এক ও অদ্বিতীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এদিক থেকে স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য মরমী ও দার্শনিকদের থেকে ভিন্ন।

winning personality and the ability to make interesting philosophic subject relating to religious life.' (স্বামী অভেদানন্দের একটা সুবিধা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আছে,—যা দিয়ে তিনি সকলের মনকে জয় করতে পারেন, আর আছে ধর্মজীবনের উপযোগী নিছক নিরস দার্শনিক বিষয়বস্তুকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করার কৃতিত্ব)। এই রকম মন্তব্য আমেরিকার আরও অনেক কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সবের পেপার কাটিংস্ আপনার আলমারীতেই আমরা দেখেছি। একজন ভারতবাসীর পক্ষে এইরকম সম্মান লাভ বড় কম নয়।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'বাবা, কমেন্টের (মন্তব্যের) ওয়ার্ড-বাই-ওয়ার্ড (কথার-পর-কথা) মনে রেখেছ দেখ্ছি। এ'রকম প্রশংসা ক'রে আমার লেক্চার (বক্তৃতা)-সম্বন্ধে কত-শত মন্তব্য ওদেশের কাগজ প্রকাশিত করেছে! সব তো (paper-cuttings) নিয়ে আসতে পারিনি, আন্‌লে দেখ্‌তে দু'তিন আলমারী ভর্তি হ'য়ে যেতো। তারপর শুধু কাগজে নয়, বড় বড় নামজাদা প্রফেসার, আর্টিষ্ট, নভেলিষ্ট, এ্যাক্টার-এ্যাক্ট্রেস্, টুরিষ্ট (অধ্যাপক, শিল্পী, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ভ্রমণকারী) এঁদের সকলের মন্তব্যও আছে। আমি সকল শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গেই সমানভাবে মেলামেশা করতে পারতাম। তাঁরাও অবাধে আমার সঙ্গে মিশ্‌তেন। ওঁরা আমাকে বিদেশী ব'লে কোনদিনই মনে করতেন না, আমি ছিলাম যেন ওঁদেরই সমাজের ও দেশের একজন। তাছাড়া ওঁরা ছিলেন সত্যসত্যই গুণগ্রাহী।'

আমরা ঃ 'এটাই কিন্তু নিয়ম মহারাজ। শুধু ধর্মপ্রচার কেন,—শিক্ষা, ব্যবসা, চাক্‌রী ও যে'কোন-কাজের জন্য যে'কোন-দেশে আমরা যাই না কেন, যদি সেই দেশের মতো হ'য়ে সেই সকল সমাজের লোকেদের সঙ্গে ঠিক-ঠিকভাবে মিশ্‌তে পারি তবেই তাদের সহানুভূতি ও ভালবাসা পেতে পারি।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'ঠিকই বলেছ। *Give and take rule* (দেওয়া ও নেওয়ার নীতি)। আসলে যতটুকু তুমি মানুষকে সত্যকারভাবে দেবে, ততটুকুই তুমিও ফিরে পাবে। একজনকে প্রাণখুলে যদি ভালবাস তো—নিশ্চয়ই তার ভালবাসা তুমিও পুরোপুরিভাবে পাবে, আর ভালবাসার মধ্যে যদি চাতুরী বা দোকানদারী ভাব থাকে তো পাওয়ার ঘরে শূন্য বস্‌বে। কিছুই দেবে না, অথচ চাইবে—সে ক্যামন ক'রে হয়! আমি ও'দেশে (পাশ্চাত্যে) ওদের মতো হ'য়েই মিশ্‌তাম। খেলায়, আমোদ-প্রমোদে, ভ্রমণে, গল্প করায়, পড়াশোনায় সকল ব্যাপারে ওদের সঙ্গে ও'দের মতো হ'য়েই মিশেছি, ওরাও আমাকে ওদেরই

সমাজের ও ওদেরই দেশের একজন ব'লে দেখেছে।'

তারপর একটু নীরব থেকে তিনি বল্লেন : 'দেখ্‌ছি—গল্প শুন্‌তে তোমরা ভারি ভালবাস। তবে আর একটা মিটিঙের (অধিবেশনের) কথা বলি শোন। সেটা হবে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা।[৬] সে'দিন ছিল রবিবার। ঐদিন *Buddhist Association*-এ (বৌদ্ধ-সম্মিলনে) ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি-উৎসব। জাপানের প্রধান পুরোহিত *(High Priest)* রেভারেণ্ড সোয়েন শাকাও (Rev. Soven Shaka) উপস্থিত ছিলেন। আমি সেই অনুষ্ঠান-সভায় একজন বক্তা ও গেষ্টরূপে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সান্‌ফ্রান্সিসকোর মাননীয় কেণ্টক্ হোরি (Mr. Kentok Hori) ছিলেন ঐ সভার সভাপতি। সেখানে বক্তৃতা শেষ হ'লে সভাপতি আমায় কিছু বলার জন্য অনুরোধ কর্‌লেন। আমি ভগবান বুদ্ধের জীবনী ও বৌদ্ধধর্ম জাপানে কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে চীন ও জাপানের সম্পর্ক কিরকম ছিল, চীন ভারতবর্ষ থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কি কি উপাদান গ্রহণ করেছিল, চীন ও জাপানকে ভারতবর্ষ কি কি দিয়েছিল—এই সকল প্রসঙ্গ নিয়ে প্রায় একঘণ্টা বক্তৃতা কর্‌লাম। জাপানের বিখ্যাত *Buddhist scholar* (বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত) ডি.টি. সুজুকিও (D.T. Suzuki)[৭] সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় সুজুকি সত্যকারের একজন গুণগ্রাহী ও পণ্ডিত লোক। ভারতবর্ষের উপর তিনি পরমশ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চীন ও জাপান যে ভারতবর্ষের কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী একথা তিনি স্বীকার করতেন। তিনি মহাযান-বৌদ্ধধর্ম, জাপানী-বৌদ্ধধর্ম, জেন্-বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন। আমি থেরাবাদ, সর্বাস্তিবাদ-ছাড়া মাধ্যমিক, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার এবং আরও ১৮টি মতবাদের কথা বল্লাম।

'আমার বক্তৃতার পর রেভারেণ্ড সোয়েন শাকা বক্তৃতা কর্‌লেন। তিনি ইংরেজী জান্‌তেন না, তাই জাপানীভাষায় প্রায় একঘণ্টা ধরে *Mahayana Buddhism* (মহাযান-বৌদ্ধধর্ম)-সম্বন্ধে বক্তৃতা কর্‌লেন। অধ্যাপক সুজুকি ইণ্টারপ্রিটারের (দোভাষীর) কাজ করেছিলেন। তিনি সোয়েন শাকার বক্তৃতা ইংরাজীভাষায় তর্জমা ক'রে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিলেন। বক্তৃতার পর

৬। ইংরেজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল, রবিবার। স্বামীজী মহারাজ তাঁর *Leaves from My Diary*-তে এই তারিখই লিখেছেন।

৭। অধ্যাপক ডি. টি. সুজুকির *An Introduction to Mahayana Buddhism, An Introduction to Lankavatara-sutra* প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট আদরণীয়।

রেভারেণ্ড সোয়েন-শাকা ও অধ্যাপক সুজুকির সঙ্গে আমার কিছুক্ষণ আলাপ হ'ল। দু'জনেই ছিলেন বেশ মিষ্টভাষী ও অমায়িক লোক।

'বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধে আমিও আমেরিকায় অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। *Buddha and His Teachings* (বুদ্ধ ও তাঁর শিক্ষা)-সম্বন্ধে আমার বক্তৃতাটি বড়।[৮] তা'ছাড়া *Lamaism in Tibet* (তিব্বতে লামাধর্ম), *Sintoism in Japan* (জাপানে সিন্টোধর্ম বা পিতৃপুরুষপূজা), *Buddhism in Japan* (জাপানে বৌদ্ধধর্ম) প্রভৃতি সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিয়েছিলাম আমেরিকায়। ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে এ'সব বক্তৃতা দিতে হয়েছিল।'

দু'চার মিনিট চুপ ক'রে থেকে সহাস্যে রহস্য ক'রে স্বামীজী মহারাজ আবার বল্লেন ঃ 'বাবা, (নিজের দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে) এই লোকটি আজকের নয়। লণ্ডনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যখন ডায়মণ্ড-জুবিলি হয় তখন ইনি লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন। সেটা হয়েছিল ইংরেজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে (২২শে জুন)। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ছিলেন একটু খর্বকায়। সাদাসিদে পোষাক। তাঁর ষাট বছর বয়সের হ'ল জন্মতিথি উৎসব। চার ঘোড়ার গাড়ী ক'রে মহারাণী বাকিংহাম-প্যালেস (প্রাসাদ) থেকে গেলেন সেণ্ট-পলস্-ক্যাথিড্রেলে আর্ক-বিশপের আশীর্বাদ নেবার জন্য। প্যালেস (প্রাসাদ) থেকে ক্যাথিড্রেল (গীর্জা)-পর্যন্ত রাস্তার দু'ধার সাজানো হয়েছিল। কাতারে কাতারে দর্শক। সমস্ত বাড়ী-ঘরদোরে নানা রকমের পতাকা প্রভৃতি সাজানো হয়েছিল। মহারাণীর বডিগার্ড (দেহরক্ষী) অনেক পাঞ্জাবীও ছিল। প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ (পরে যিনি সপ্তম এডোয়ার্ড) নিজে ঘোড়ায় চড়ে মহারাণীর আগে-আগে যাচ্ছিলেন। সে' এক অভিনব আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্য। সকলের রঙ-বেরঙের পোষাক-পরিচ্ছদ, জাঁকজমক, শান্তিপাহারা, নিয়মশৃঙ্খলা ছিল অপূর্ব ধরনের,—না দেখ্‌লে বোঝানো যায় না।

'লণ্ডনে গিয়ে প্রথমবার ব্লুমস্‌বেরি-স্কোয়ারে-খ্রীষ্টো-থিয়োসফিক্যাল-সোসাইটীতে আমার বেদান্ত বা 'পঞ্চদশী'-সম্বন্ধে বক্তৃতার কথা তোমরা শুনেছ। বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া ওদেশে (লণ্ডনে, আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে) বড় বড় লোকেদের বক্তৃতা শোনাও যথেষ্ট হয়েছে। ইংরেজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মাসে (তারিখ ১৮ই ফেব্রুয়ারী) অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর বক্তৃতাও ঐ সময়ে ইম্পিরিয়েল-ইনষ্টিউটে হয়েছিল। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড রিয়ে (Lord Reah) তাতে preside (সভাপতিত্ব) করেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম সেই বক্তৃতা শুন্‌তে।

৮। নূতন সংস্করণ *The Great Saviours of the World*-গ্রন্থে এ' বক্তৃতাটি ছাপা হয়েছে।

'বহু সুশিক্ষিত লোকের ভিড় হয়েছিল। বক্তৃতার পর ডক্টর বসুর (জগদীশচন্দ্র বসুর) সঙ্গে আমি দেখা করি। আমায় দেখে তিনি বিশেষভাবে খুসী হয়েছিলেন। তাঁর নব-আবিষ্কৃত 'আর্টিফিসিয়াল-আই' *(Artificial Eye,*—নকল চক্ষু) যন্ত্রটি তিনি আমায় দেখালেন। মিঃ ষ্টার্ডিও আমার সঙ্গে ছিলেন।

'ডঃ মায়ার্সের (Dr. Myers) লেকচারও[৯] আমি শুনেছি। পরলোকতত্ত্বের উপর তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বৈজ্ঞানিক-যুক্তি ও চাক্ষুষ-অভিজ্ঞতা থেকে তিনি প্রেততত্ত্বের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছেন। একবার 'হিপ্‌নোটিক-হিলিঙ্' *(hypnotic healing,*—অজ্ঞানাবস্থায় রোগ আরোগ্য করা)-সম্বন্ধে তিনি লণ্ডনের সাইকিক্যাল-রিসার্চ-সোসাইটীতে (প্রেততত্ত্বানুশীলন-সমিতিতে) বক্তৃতা দেন। হিপ্‌নোটিক-হিলিঙে যেকোন রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে তার subconscious mind-এ (অবচেতন-মনে) সাজেসচান্ *(suggestion*—কোন ধারণার ইঙ্গিত) দিয়ে রোগ সারানো যায়। তিনি যেভাবে লেকচার দিয়ে বিষয়টি সুন্দর ক'রে বুঝিয়েছিলেন তা' এখনো আমার মনে আছে। আমি ষ্টার্ডির সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা শুন্‌তে গিয়েছিলাম। বক্তৃতার পর ডক্টর মায়ার্সের সঙ্গে দেখা ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, সত্যই হিপ্‌নোটিক-হিলিঙের কোন *scientific basis* (বৈজ্ঞানিক ভিত্তি) আছে কিনা। তিনি আমার প্রশ্নে সন্তুষ্ট হ'য়ে একদিন তাঁর *practical demonstration* (হাতেনাতে প্রমাণ) আমায় দেখিয়েছিলেন। একটি অসুস্থ য়ুরোপীয়ান-মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে সাজেস্‌চান্ *(suggestion)* দিয়ে তিনি তার অসুখ ভাল করেছিলেন। এটি আমার নিজের চোখে দেখা।'

আমাদের মধ্যে থেকে একজন তখন জিজ্ঞাসা করলো : 'মহারাজ, সাজেস্‌চান্ *(suggestion)* দিলে দেহের অসুখ সারে এটা ক্যামন ক'রে হয়?'

স্বামীজী মহারাজ : 'কেন সার্‌বে না বলো? আসলে অসুখটা কার হয়? আত্মার, দেহের,—না মনের? তোমরা কেন, ডাক্তাররাও বল্‌বেন—অসুখ হয় দেহের। কিন্তু দেহ তো আসলে জড়যন্ত্র, দেহের পিছনে যদি মন না থাকে তবে দেহ আর কি করতে পারে বলো। মনের অভাবে *sensation* (সংবেদন বা চেতনা) বলো, *feeling* (অনুভব) বলো, বা যেকোন জ্ঞানই বলো—কোনটাই হ'তে পারে না। তাই সত্যকারের অসুখ হয় মনের। মনটাই অসুস্থ, চঞ্চল বা

৯। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কখনো কখনো 'লেকচার' ইংরেজী আবার কখনো কখনো 'বক্তৃতা' বাঙলা এই উভয় শব্দই ব্যবহার কর্‌তেন।

বিকৃত হয় দেহের অসুস্থতার জন্য। দেহ ও মনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক। মনে বিকৃতি বা চাঞ্চল্য এলে সেটাই সঙ্গে সঙ্গে দেহ বা শরীরে সংক্রমিত হয়। তখন লোকে মনে করে দেহের বিকৃতি হয়েছে, দেহের অসুখ করেছে। এই ধারণাই আমরা আরোপ করি মনে। পরে আবার জড়দেহের ধারণা চৈতন্যময় আত্মায় আরোপ করি। আরোপ কিনা মিথ্যা-আরোপ অথচ তাকে সত্য মনে করি।'

আমরা ঃ 'এটা ঠিক বুঝতে পার্‌লাম না মহারাজ। শরীরে যখন কোন আঘাত লাগে, তখন মনটা খারাপ বা অসুস্থ হয়। দেহে কোন ক্ষত বা দেহটা আহত বা যেকোন কারণে অসুস্থ হ'লে তবেই সেটা অনুভব করে মন। তখনই মন হয় অসুস্থ। শরীর সুস্থ থাক্‌লে মনও সুস্থ থাকে। সুতরাং প্রথমে শরীর, তারপর মন। প্রথমে শরীরের হয় বিকৃতি বা অসুস্থ অবস্থা, তার পরে হয় মনের অসুস্থতা। এটাই ঠিক ব'লে মনে হয়।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'সাধারণত এটাই তো মনে হয় সকলের। সকল লোকই চিন্তা করে—দেহটা আগে, তারপর মন। তবে মনও জড় ও অচেতন। মন চেতন হয় চৈতন্যময় আত্মার প্রেরণায়। আসলে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই কথা। যারা বলে দেহটা আগে বা জড়বস্তু আগে, তারা জগতের সব-কিছুকে দেখে জড়বস্তুর ভিতর দিয়ে,—জড়বস্তুই হয় তাদের *medium* (মধ্যস্থ বা দ্বার)। একে ইংরেজীতে বলে *materialistic view* (জড়বাদসম্মত দৃষ্টি বা জড়দৃষ্টি)। *Materialism*-এ (জড়বাদে) মন ও চৈতন্যকেও ম্যাটারের (জড়বস্তুর) সামিল করা হয়। সেখানে *one primordial stuff of the world* (জগতের আদিবস্তু বা সত্তা) হ'ল 'ম্যাটার' (জড়বস্তু)। অর্থাৎ ম্যাটারই সেখানে একমাত্র সত্য সত্তা। মন, চৈতন্য ও এমন কি আত্মা-পর্যন্ত সেখানে *bye-product of matter* (জড়বস্তু থেকে উৎপন্ন বা সৃষ্ট বস্তু)। সুতরাং *materialistic viewpoint*-এ (জড়-দৃষ্টিভঙ্গিতে) মন ও আত্মাকে এক দিক থেকে অস্বীকারই করা হয়। জড়দৃষ্টিতে মানুষ দেখে তার দেহটা রক্ত-মাংস-পেশী-তন্তু এইসব দিয়ে তৈরী, অথচ modern science-এর (আধুনিক বিজ্ঞানের) কাজ একমাত্র জড়জগৎ নিয়ে হ'লেও সে *energy* (শক্তি) ব'লে একটা পদার্থ স্বীকার করে। বিজ্ঞান স্বীকার করে *energy* (শক্তি) বা *electricity*-ই (বৈদ্যুতিক শক্তি) হোক বা অন্য-কিছুই হোক, সেটা না হ'লে জড়ে ক্রিয়া বা স্পন্দন হয় না। ম্যাক্সওয়েল, আইনষ্টাইন, ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক, জিন্‌স, ক্রোথার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন *matter* (জড়) থাকার অর্থই তার পিছনে *energy*-ও (শক্তি বা

চৈতন্যও) আছে একথা স্বীকার করা।

'*Materialist*-রা (বস্তুতন্ত্রবাদীরা) প্রায় সকলেই *realist* (বাস্তববাদী)। তাদের মধ্যে অনেকে আবার ম্যাটার-ছাড়া 'গতি' অর্থাৎ movement ব'লে একটা জিনিষ স্বীকার করে।[১০] অন্তত ইংরাজ-দার্শনিক হব্‌সের (Hobbes) তাই অভিমত। এদেরকে বলা হয় *monistic materialists* (একত্বভঙ্গী-বস্তুতান্ত্রিক)। তেম্‌নি আবার *dualistic materialist*-রা (দ্বৈত-জড়বাদীরা) আছেন। তা'ছাড়া পাশ্চাত্য-দর্শনে *materialism*-এর আবার বহু ভাগ আছে।[১১]

'জড়বাদীরা *realist* (বাস্তববাদী) হয় কেন জান? তারা জড়বস্তু-ছাড়া সারা দুনিয়ায় মন, চৈতন্য বা আত্মা প্রভৃতি কোন জিনিষকেই স্বীকার করে না। সাধারণত মানুষমাত্রেই হয় *realist* (বাস্তববাদী)। *Realist*-দের (বাস্তববাদীদের) অভিমত হ'ল ঃ 'physical things are *out there* in the space',—অর্থাৎ জড়বস্তু মনের বাইরেই (মন-নিরপেক্ষ হ'য়ে) যথার্থভাবে থাকে বাহ্যজগতে, আর তাতে ক'রে ঘরবাড়ী সত্য, গাছ সত্য, চেয়ার সত্য ও দুনিয়ার সব-কিছু সত্য। *Materialism*-এর (জড়বাদের) মতো *realism*-ও (বাস্তববাদও) মন বা চৈতন্যকে *(consciousness)* স্বীকার করে না। তবে বাস্তববাদীরা জড়বাদীদের মতো স্বীকার করে না যে, মন বা চৈতন্য *bye-product of matter* (জড়বস্তু থেকে তৈরী বস্তু)—এই যা পার্থক্য।

'জগতে সকল বস্তুর ও বিষয়েরই *thesis* (স্বপক্ষ) ও *antithesis* (বিপক্ষ) আছে। তার অর্থ একজন একটি অভিমত *(opinion)* প্রতিষ্ঠা করলো, আর অন্যজন সেটা খণ্ডন ক'রে ভিন্ন মত স্থাপন করলো। এ'রকম রীতি সুপ্রাচীন কাল থেকে আজও-পর্যন্ত সকল দেশেই আছে। ভারতীয়-দর্শনে যেমন দ্বৈতমতের বিপক্ষে অদ্বৈতবাদ, আবার অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। পাশ্চাত্য দর্শনেও তেম্‌নি। *Materialism*

১০। এখানে মনে রাখা উচিত যে, movement বা গতি matter-এরই (জড়েরই) একটা ভিন্ন রূপ মাত্র। জড়ত্ব তার গুণ ও স্বরূপ। তবে জড় থেকে 'গতি' ব'লে একটি বস্তু স্বীকার কবে মনিষ্টিক বা একত্ববাদীতে বিশ্বাসী জড়বাদীরা।

১১। যেমন *theoretical* and *practical* materialism, attributive, causal, equative, monistic, dualistic প্রভৃতি materialism. তাছাড়া critical, neo, এবং direct প্রভৃতি realism বা materialism আছে। সত্তার বা বস্তুর অস্তিত্ব বাইরের জগতে—কি মনে, এই নিয়েই মতবাদ ও মতান্তর।

(জড়বাদ) সর্বসাধারণের জন্য। *Spiritualism* (জ্ঞান বা অধ্যাত্মবাদ) তার *antithesis* (বিপক্ষ)। *Realism*-ও (বাস্তববাদ)[১২] সর্বসাধারণের কাছে আদৃত, আর *idealism* বা *mentalism* (ভাববাদ, মনোবাদ বা বিজ্ঞানবাদ) দেখা দিল জড়বাদের *antithesis* (বিপক্ষ)-রূপে। *Idealism*-এর[১৩] প্রচার করেছিলেন পাশ্চাত্যদেশে বিশপ বার্কলে (Berkeley)।'

আমরা ঃ 'আইডিয়ালিজম্ জিনিসটা কি মহারাজ?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ '*Idealism*-এর (বিজ্ঞানবাদের) অর্থ জগতের সকল-কিছুকে দেখা, বোঝা বা বলা হয় *idea*-র (বিজ্ঞান বা ভাবের) ভিতর দিয়ে;—অর্থাৎ we see and realize things of the world *through* the glass of ideas or mind (জগতের সব-কিছু দেখি ও বুঝি ভাব বা মনের সাহায্যে)। অথবা বলা যায় every knowable and every object of experience lies in its original nature, অথবা as the content of mind or consciousness.[১৪] (আমরা যা-কিছু জানি ও অনুভব করি, সত্যকারের স্বরূপ তাদের মন বা জ্ঞান)। মোটকথা *idealism*-এ (বিজ্ঞান বা ভাববাদে) mind ও consciousness (চৈতন্য) হয় medium (মাধ্যম বা কারণ)। *Idealistic viewpoint*-এ (মানসিক-দৃষ্টিভঙ্গিতে) *idea* বা মনের ভাব বা ধারণাটিই প্রথমে ধরা পড়ে, তারপর আসে *matter* (জড়বস্তু)। *Idealism*-এর (ভাব বা বিজ্ঞানবাদের) মতো *spiritualism* (মন বা অধ্যাত্মবাদ) *realism* (বাস্তববাদ) ও *materialism*-এর (জড়বাদের) *antithesis* (বিপক্ষ) তা' পূর্বে বলেছি। স্পিরিচুয়ালিজম্ যা-কিছু প্রতিপন্ন করে—সমস্তই *mind* বা *spirit*-এর (মন ও বিজ্ঞান বা চৈতন্যের) ভিতর দিয়ে।'

১২। Realism বা বাস্তববাদের রূপও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। তবে প্রধানত *realism* বলতে direct, naive অথবা common sense realism বুঝায়। তাছাড়া representative, critical, scientific প্রভৃতি realism-ও আছে।

১৩। Idealism-ও অনেক রকমের। তবে প্রধানত এদের দু'টি রূপ প্রসিদ্ধ ঃ একটি *objective idealism* ও অপরটি *subjective idealism* কিংবা *solipsism*। তা'ছাড়া *transcendental idealism* আছে,—যা জার্মাণ দার্শনিক কাণ্ট, ফিক্টে, এঁরা স্বীকার করেছেন।

১৪। 'কনসাস্‌নেস্ (consciousness) বলতে আত্মচৈতন্যরূপ জ্ঞান নয়, এটি মনেরই ভিন্ন নাম বা রূপ, অথবা যাকে 'ধারণা' বলা যায়।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'বৌদ্ধদের ভিতর যারা বিজ্ঞানবাদী, অর্থাৎ যারা *consciousness*-ছাড়া অন্য-কিছু মানে না, তারাও ঐ একই কথা বলে তারাও প্রথমে বিজ্ঞান ও পরে জড়বস্তুকে স্বীকার করে। বিজ্ঞানবাদীদের ভিতর অনেকে একমাত্র বিজ্ঞান-ছাড়া অন্য-কিছুই স্বীকার করে না। তারা পাশ্চাত্য-দেশের *subjective idealist*-দের (বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদীদের) মতো। বৌদ্ধদের ভিতর সৌত্রান্তিকরা বার্কলের মতো। অদ্বৈতবাদী শঙ্করও বিজ্ঞান স্বীকার করেন, তবে ঐ চরম-বিজ্ঞানবাদীদের মতো নয়। শঙ্কর পাশ্চাত্যের কাণ্ট, ফিক্টে, শেলিঙ প্রভৃতিদের মতো *objective idealist*-এর (বিষয়-বিজ্ঞানবাদীদের) অন্তর্ভুক্ত। শঙ্কর জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দেন নি, ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জগতের ব্যবহারিক-সত্তা স্বীকার করেছেন।[১৫] পাশ্চাত্যে কাণ্টও তাই। কাণ্টের মতে *world as appearance* (বিকাশরূপে জগৎ) *thing-in-itself*-এর (স্বরূপসত্তা ব্রহ্মের) তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হ'লেও তার *objective appearance*-এর (বস্তুতাত্ত্বিক-বিকাশের) একটা *relative* ও *phenomenal existence* (আপেক্ষিক ও জাগতিক বা ব্যবহারিক-সত্তা) আছে। তিনি তাই দুটো *viewpoints*-ই (দৃষ্টিভঙ্গিই) স্বীকার করেছেন ঃ একটা *phenomenal* (জাগতিক বা ব্যবহারিক) ও অপরটা *transcendental* (বিশ্বাতীত বা পারমার্থিক)। কাণ্টের মতে তাই *realism* ও *idealism* (বাস্তববাদ ও বিজ্ঞানবাদ) দুটোরই স্থান আছে।' তবে কিন্তু একমাত্র পারমার্থিক-ব্রহ্মসত্তাই শঙ্করের প্রতিপাদ্য বিষয়।

'যাক্, এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক্। তোমাদের প্রশ্ন ছিল *mental suggestion* (মানসিক-ইঙ্গিত বা প্রেরণা) দিয়ে দেহের রোগ বা অসুখ সারানো যায় কি-না! কেন যাবে না? আমি পূর্বেই বলেছি যে, অসুখ আসলে কার হয়?

১৫। আচার্য শঙ্করকে অনেকে 'মায়াবাদী' বলে সমালোচনা করেন, কেননা তিনি নাকি বস্তুসত্তাকে তুচ্ছ ও মায়া অর্থে অলীক বা মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়, শঙ্কর 'মায়া' অর্থে অলীক বা মিথ্যা বলেন নি, বলেছেন অসৎ,—অর্থাৎ পারমার্থিক সৎ নয়, কিন্তু ব্যবহারিক সৎ। মায়াবাদেরও তিনি সমর্থক বা প্রচারক নন, বস্তুত তিনি 'ব্রহ্মবাদী', অর্থাৎ মায়ার অস্তিত্ব প্রমাণ না ক'রে তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্বই প্রমাণ করেছেন ও একান্তভাবে মায়াবাদ খণ্ডন করেছেন পূর্ব-পূর্ব আচার্যদের অনুসরণ ক'রে। শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলেছেন ঃ 'বয়ং তু ব্রহ্মবাদিনঃ'। সেজন্য শঙ্করকে মায়াবাদী বলা একান্তই ভুল। শঙ্করের প্রতিপাদ্য বস্তু ও সিদ্ধান্তই ব্রহ্মবস্তু।

'প্রথমত, বলা যেতে পারে অসুখ হয় দেহের, সুতরাং মনটাকে দেহ থেকে পৃথক করে নাও, তাহ'লে দেহের অসুখ হ'লেই কি আর না হ'লেই কি, মন অর্থাৎ তুমি কিছু জান্‌তে পার্‌বে না। কাজেই অসুখের দিকে মন না থাকায় সেটা বস্তুত থাক্‌লেও না-থাকারই মতো হয়।

'দ্বিতীয়ত, অসুখ হয় দেহের এ'কথা যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলেও দেহের উপর মনের কর্তৃত্ব বা প্রভাব আছে অসীম স্বীকার করতে হয়। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক-পরিবেশের যদি পরিবর্তন করা যায়, তবে শরীরের বাইরে বা ভিতরে কোন অসুখ কর্‌লে ইচ্ছাশক্তি তা' সারাতে পারবে না কেন? মানুষের শরীরের মধ্যে যে সমস্ত জীবাণু আছে, তারা জীবিত,—living। তাদের ভিতরেও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ আছে। বিশেষ ক'রে রক্তের মধ্যে যে'সব রেড-কর্পাস্কেল-ছাড়াও হোয়াইট-কর্পাস্কেল (লাল ও সাদা রক্তকণিকা) আছে তারা আমাদের শরীরের মধ্যে সৈনিকের মতো কাজ করে। শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগ্‌লে বা কোন ক্ষত হ'লে তারা যোদ্ধার মতো বিষাক্ত জীবাণুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। জয়লাভ করলে ক্ষত, আঘাত বা অসুখ সেরে যায়, আর পরাজিত হ'লে তারা জীবন দেয়,—যার ফলে ক্ষতস্থানে বা আহত জায়গায় অনেক সময়ে pus form করে (পুঁজ জন্মায়)। ঐ pus form-এর (পুঁজ-জন্মানোর) দ্বারাই তারা শরীর দান ক'রে আমাদের কল্যাণ সাধন করে। *Hypnotic healing*-এ (হিপনোটিক্ হিলিঙে) প্রথমে রোগীকে নিজের ভিতর থেকে সম্মোহনশক্তি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে অজ্ঞান করা হ'য় ও পরে *suggestion* (ইঙ্গিত) দেওয়া হয়—'তুমি সেরে গেছো'। সাজেস্‌চান্‌টা *mental thing* (মানসিক বস্তু) বা কতকগুলো *vibrations*-এর (কম্পনের) সমষ্টি মাত্র। তাই *positive mental vibrations* (অস্তিমূলক-মানসিক কম্পন) দিয়ে শরীরে জীবাণুদের দেহে ইচ্ছাশক্তির সঞ্চার করা যায়। *Fighting corpuscle*-গুলোর (যুদ্ধকারী ক্ষুদ্র রক্তকণিকাদের) শরীরে ও শক্তিতে পরিবর্তন সৃষ্টি করা যায়, তাতে ক'রে জীবাণুগুলো যে'কোন অসুখ সারিয়ে দিতে পারে। *Mental suggestion* (মানসিক-ইঙ্গিত) সেখানে মিডিয়মের (মধ্যস্থতার) কাজ করে।

'তৃতীয়ত, অসুখটা সত্যকারের হয় মনে, তারপর তা' affect (বিকৃত) করে শরীরকে। নইলে শরীরে যদি কোন আঘাত লাগে ও মন অন্যমনস্ক থাকে, অর্থাৎ ঐ আঘাতের দিকে লক্ষ্য না রেখে মন যদি অন্যদিকে থাকে, তবে আঘাতকে তখন অনুভব কর্‌বে কে? ঘুমিয়ে থাক্‌লে পাশের ঘরে যদি

মারামারি বা একটা গণ্ডোগোল হয় তা' তুমি জান্‌তে পারো না, জান্‌বে যখন তুমি জাগ্‌বে বা বাইরের চেতনা তোমার মধ্যে আস্‌বে। তাহ্‌লেই এ'কথা সত্য যে, জ্ঞান বা চেতনা আসলে আত্মার,—শরীর বা ইন্দ্রিয়ের নয়। তবে আত্মার ঐ জ্ঞান বা চেতনা বাইরে প্রকাশ পায় মনের ভিতর দিয়েই। মন তাই একটা *instrument* (যন্ত্র) বা *medium* (সহায়ক) মাত্র। ভারতীয়-দর্শনে একে বলা হয়েছে 'অন্তরিন্দ্রিয়',—অর্থাৎ *internal organ* বা *instrument*।'

আমরা নির্বাক হ'য়ে স্বামীজী মহারাজের কথা শুন্‌ছি। তিনি আমাদের ভাবগতিক লক্ষ্য ক'রে বল্লেন : 'এই বিচারগুলো অবশ্য জটিল, দু'এক কথায় পরিষ্কার ক'রে বুঝানো যায় না! তবে তোমরা মোটামুটি এ কথা জেনে রেখো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মন শরীরের উপর থাকে, ততক্ষণই শরীরের চেতনা, ততক্ষণই শরীরের জ্ঞান বা অনুভূতি থাকে, নইলে মানুষ ম'রে গেলে জড়শরীর পড়ে থাকে, কিন্তু মন ও প্রাণ থাকে না ব'লে শরীরের কোন চেতনা বা অনুভূতি থাকে না। তখন শরীরকে ছুরি দিয়ে আঘাত করো বা অন্য যা-কিছু দিয়েই কেটে খণ্ড খণ্ড করো না কেন—শরীর তার কিছুই জান্‌তে পারে না, শরীরেরও তাতে কোন কষ্ট হয় না। তাহ্‌লেই সত্য যে, শরীরই কর্তা, —না শরীর, মন, প্রাণ ও চৈতন্যের নিয়ন্তা আত্মা কর্তা? এটাই প্রথমে ভাল ক'রে বুঝ্‌তে চেষ্টা করো।

'ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদশাস্ত্রী চরক, শুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যরা এ'কথা ভালো ক'রেই বুঝ্‌তেন। তাঁরা সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই স্বীকার করেছেন যে, প্রকৃতি জড় ও অচেতন, আর পুরুষ চেতন। প্রকৃতি একা কিছুই করতে পারে না, চেতন পুরুষের সঙ্গে মিশ্‌লে তবেই তার মধ্যে ক্রিয়া হয়। তাই জড়শরীরের চিকিৎসা করলেও আয়ুর্বেদীরা চৈতন্যের দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখেন। মনীষী হ্যানিম্যানও সাংখ্যের ঐ তত্ত্ব বুঝেছিলেন ব'লে মনে হয়। *Homeopathic treatment*-এ (হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসায়) হোমিওপাথ-ডাক্তাররা দেহের চিকিৎসা করেন বল্‌তে প্রথমে মনকে *study* (পর্যবেক্ষণ) ক'রে প্রথমে মনের চিকিৎসা করেন। *Homeopathic philosophy* (হোমিওপ্যাথিক-দর্শন) ঠিক এ'ভাবেই গড়ে উঠেছিল। মনীষী কেণ্ট (Kent) তাঁর হোমিওপ্যাথিক-দর্শনে এর কিছুটা আভাস দিয়েছেন।[১৬]

'সুতরাং সাজেস্‌চান্ (*suggestion*) দিতে গেলে মনের উপরই তা' দিতে হবে। আসলে মনই দেহের চালক। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণে বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে

১৬। Prof. Kent : *Philosophy of Homeopathy* (U.S.A) দ্রষ্টব্য।

উপদেশ দেওয়ার সময়ে বলেছিলেন ঃ 'মনো হি জগতাং কর্তৃ',—মনই জগতের সৃষ্টিকর্তা। কঠোপনিষদে ইন্দ্রিয়গণের প্রধান বা রাজা হ'ল মন, আর ঐ মনই কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের চালক—একথা বর্ণনা করেছে। দুনিয়া আছে ও তাতে ভাল-মন্দ ঘট্‌ছে—এই সমস্তেরই জ্ঞান হয় মন আছে ব'লে। মন যদি না থাক্‌তো তবে কেই বা দেখ্‌তো এবং কেই বা বল্‌তো যে, এই জগৎটা আছে বা নেই? তাই মনকে সাজেস্‌চান্ *(suggestion)* দেওয়ার অর্থই হ'ল মনের ভিতর নূতন idea ভাব) দেওয়া যে, 'তুমি এই করো বা এই কোরো না,' আর তাহলেই মন সক্রিয় হয় কিছু করা বা না-করার জন্য। সেই ক্রিয়াই সংক্রামিত হয় আবার দেহে ও দেহের সমস্ত জীবাণুদের মধ্যে, আর তখনই তারা সচেতন ও শক্তিমান হয় ও কাজ করে, লড়াই করে, অসুখ সারায় প্রভৃতি।

'দার্শনিক হিউম (Hume) বলেছেন, মন হ'ল *'a bundle of sensations'* (সংবেদন বা ভাবনার সমষ্টি)। ভারতীয় দর্শনেও মন বা অন্তঃকরণকে[১৭] বলা হয়েছে বৃত্তি বা সংস্কারের সমষ্টি। অন্তঃকরণের ক্রিয়ার নাম 'বৃত্তি',—যেমন মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। একই অন্তঃকরণ যখন সংকল্প ও বিকল্প করে, তখন 'মন', যখন বিচার করে 'এটা নয়—ওটা' ব'লে, তখন 'বুদ্ধি', যখন কিছুর ধারণা করে, তখন 'চিত্ত' ও যখন 'আমি' ও 'আমার' ব'লে জ্ঞান করে, তখন 'অহংকার'। এক্‌টাই বস্তু, চার রকমভাবে তা' প্রকাশ পায়। যেমন একই প্রকৃতি যখন স্থির থাকে, তখন সত্ত্বগুণ, যখন কাজ করে বা চঞ্চল হয়, তখন রজোগুণ, যখন মূঢ় বা কিংকর্তব্য হয়, তখন তমোগুণ। কাজ বা কর্ম গুণেরই পরিণতি বা product (ফল)। একই প্রকৃতি তিনটি গুণে তিন রকমভাবে নিজেকে প্রকাশ ক'রে কাজ করে। গুণগুলো প্রকৃতির বল্‌তে গুণ থেকে প্রকৃতি নয়. গুণগুলো মিলে বা গুণের সমষ্টিই প্রকৃতি।

'ইংরেজীতে সংস্কারকে বলে *impression* (ইম্‌প্রেসন্)। সংস্কারকে *ideas*-ও (ভাব বা ধারণাও) বলা যায়। মন আসলে সংস্কারের সমষ্টি। শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলেছেন—মন যেন সরষের পুঁটুলি, একবার ছড়িয়ে গেলে কুড়ানো মুস্কিল। আমাদের অবচেতন-মনে জন্ম-জন্মান্তরের অসংখ্য-অগণিত-সংস্কার পুঞ্জীকৃত হ'য়ে আছে। Western psychologist-রা পাশ্চাত্য-মনোবৈজ্ঞানিকরা) অবচেতন-মনকে বলেছেন 'ice-berg', বা boundless vast ocean'। অবচেতন মন যেন একটা বরফখণ্ডের মতো,—যার তিন ভাগ জলের মধ্যে ডুবে থাকে ও একভাগ থাকে জলের উপর ভেসে। কিংবা মন প্রকৃতপক্ষে মহাসমুদ্র,—যার কুলকিনারা নেই।

১৭। মন ও অন্তঃকরণ এক বস্তু নয়। সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনও অন্তঃকরণের একটি বৃত্তি বা কাজ। তবে সাধারণভাবে অন্তঃকরণ ও মনকে এক বলা হয়।

'সাজেস্‌চান্‌ *(suggestion)* আসলে *idea*-ই (ধারণাই)। এবং মন *ideas*-এর (ধারণার) সমষ্টি।[১৮] এই দুটোই আবার কম্পন-ছাড়া অন্য-কিছু নয়। সাজেস্‌চান্‌ *(suggestion)* দিলে মন সক্রিয় হয় তা' পূর্বে বলেছি। *Vibrations*-ই (কম্পনগুলি) *vibrations*-এর (কম্পনের) নাগাল পায়, কারণ দুটোই এক জাতীয় বস্তু। তেম্‌নি মনের বৃত্তি স্থির হ'লে মন তখন চৈতন্যে রূপায়িত হয় এবং তখ্‌নই সমজাতীয় মন-চৈতন্যের সঙ্গে ব্রহ্ম-চৈতন্যের মিলন হয়। অর্থাৎ তখন সমানে সমানে মিলন হয়। মন চঞ্চল হ'লে শরীরের জীবাণুগুলিতেও ক্রিয়া চল্‌তে থাকে, আর সেই ক্রিয়াই শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে অসুখ সারিয়ে দেয়। যোগীরাও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে নিজেদের রোগ সারিয়ে ফেল্‌তে পারেন। অপরের দেহের অসুখও তাঁরা মনে করলে ইচ্ছাশক্তি বা সাজেস্‌চান *(suggestion)* দিয়ে সারাতে পারেন।'

আমাদের মধ্যে থেকে একজন স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'রিয়ালিজ্‌ম' আইডিয়ালিজ্‌ম, স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম (বাস্তববাদ, বিজ্ঞানবাদ, অধ্যাত্মবাদ) প্রভৃতির কথা পূর্বে যা আলোচনা করেছেন সেগুলো তাহলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি-ছাড়া অন্য-কিছু নয়?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'হ্যাঁ, যে যেমন ভাবে অর্থাৎ চিন্তা করে, সে তেমনই দেখে ও বোঝে। প্রতিটি মানুষই তার নিজের নিজের জগতে (ধারণার জগতে) বাস করে, তাই তোমার জগৎ আমার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। *'Ism'* বা 'বাদ'-তথা অভিমতগুলো যেন এক-একটা চশমা বা কাঁচের পরকলা,—নীল, লাল, সবুজ, হল্‌দে—নানান্‌ রকমের। তুমি যদি নীল-চশমা দিয়ে দেখ তো দুনিয়ার সকল জিনিসই তোমার কাছে নীল ব'লে মনে হবে। লাল চশমা দিয়ে দেখ্‌লে দেখ্‌বে সবকিছু লাল। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, শাক্ত্যাদ্বৈতবাদ অথবা জড়বাদ, মায়াবাদ, ব্রহ্মবাদ ও পাশ্চাত্যের *realism, idealism, materialism, monism, pantheism, parallelism, phenomenalism, absolutism* এই সমস্তই মানুষের মনের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা বা ধারণা, আর এইগুলোই মতবাদ হ'য়ে দাঁড়ায়। যে যেমনভাবে জগৎ

১৮। এখানে মন যেন আধার ও ধারণাগুলো আধেয় বা মনের উপাদান। কিন্তু আসলে মনও যা, ধারণাও তাই। কারণ ধারণা অর্থ মনোবৃত্তি (vibrations), যা' মনেরই কম্পন-অবস্থা। ধারণা তাই মনই, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্রই, সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গের কোন অস্তিত্ব নেই। অনেকে আবার মনকে বলেন কারণ (cause) ও ধারণাগুলি তার কার্য (effect)। কিন্তু তাও ঠিক নয়, আসলে দুটোই এক ও অভিন্ন, তবে সাধারণভাবে প্রকাশের দিক থেকে মনে হয় একটা কারণ ও অপরটা কার্য।

ও ঈশ্বরকে বুঝেছে, সে তেমনিভাবে তাদের বর্ণনা করে। তাই বস্তু আসলে একটা হলেও বর্ণনায় ভিন্ন-ভিন্ন মনে হয়। *'Ism'* ও 'বাদ' বা মতবাদ কোনটারই পারমার্থিক-সত্তা নেই, তারা এক-একটি মানুষের নিজস্ব মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি-ছাড়া অন্য-কিছু নয়।

'শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) যে অন্ধদের হাতি দেখার গল্পটা বলেছেন—তা' জানতো? যে ল্যাজে হাত দিয়েছিল সে বল্লো হাতি সাপের বা দড়ির মতো। যে দিয়েছিল পায়ে হাত, সে বল্লো-হাতি গাছের গুঁড়ির মতো। যে হাত দিয়েছিল কানে, সে বল্লো হাতি কুলোর মতো। আসলে হাতি সাপ নয়, দড়ি নয়, গাছের গুঁড়ি বা কুলোও নয়, হাতি হাত-পা-নাক-মুখ-চোখওয়ালা একটি জন্তুবিশেষ। পরমবস্তু ভগবানকে সেই রকম ইজিমের (দৃষ্টিভঙ্গির) ভিতর দিয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন, আসলে কিন্তু তিনি অখণ্ড ও একই। তাই সত্যকারভাবে যিনি ভগবানকে দেখেছেন, তিনিই তাঁর যথার্থ স্বরূপ বুঝ্তে ও বলতে পারেন, আর যারা কেবল কল্পনা করে, তারা নানান্ রকম কথা বলে, অথচ নানান কোনটাই সত্য নয়, সত্য যা—তা' উপলব্ধির বস্তু, চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের-জিনিস। তাই সত্যকারের শান্তি ও মুক্তিকামী যাঁরা—তাঁরা দুনিয়ায় আসল কারণকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার নামই সাধনা। সাধনায় সিদ্ধির অর্থ হ'ল সৃষ্টির মূলে যে সত্য ও শাশ্বত বস্তু আছে তাকে ঠিকঠিকভাবে খুঁজে বার করা। বলতে বা বর্ণনা করতে না পারলেও সত্যদ্রষ্টা পুরুষ সত্যকে জানেন ও বোঝেন। সত্যের উপলব্ধিই মনুষ্য-জীবনের চরমলক্ষ্য। সত্য-ছাড়া অন্য যা-কিছু, সমস্তই সত্যস্বরূপ লক্ষ্যে পৌঁছোনোর উপায় বা পথমাত্র। *'Ism'* বা 'মতবাদ'-গুলো তাই পথেরই সামিল।'

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তখন একটু চঞ্চল হয়েছে ব'লে মনে হ'ল। স্বামীজী মহারাজ তা' লক্ষ্য করেছেন। তিনি একজনের দিকে তাকিয়ে বল্লেন ঃ 'হ্যাঁ, 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে', আর 'নীরসঃ তরুবরঃ পুরত ভাতি'—এই দু'রকম কথা। জিনিষও দু'রকম ঃ একটা নীরস আর একটা সরস। আমার কথাগুলো তোমাদের কাছে একটু শুক্নো লাগ্ছে,—ক্যামন?' এই ব'লে তিনি উচ্চহাস্য ক'রে উঠ্লেন। আমাদের মধ্যেও একটা হাসির রোল উঠ্লো। স্বামীজী মহারাজের অনুমান যে ঠিক তা লক্ষ্য করতেই বুঝ্লাম, কারণ আমাদের মধ্যে সে'দিন দু'তিনজন আগন্তুক নূতন ভদ্রলোক

ছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকে একজন সংযমের পরাকাষ্ঠা রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও দু' একবার হাই না তুলে পারেন নি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর স্বামীজী মহারাজ আবার বল্লেন ঃ 'মানুষের মন আর কি না পারে বলো! মন এতো বলীয়ান কেন?—কারণ তার পিছনে সর্বশক্তিমান আত্মা আছেন ব'লে। চন্দ্র যেমন সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার ক'রে জ্যোতিষ্মান হয়, মনও তেম্‌নি! নইলে মন তো আসলে জড়যন্ত্র, আত্মচৈতন্য তার পিছনে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে ব'লেই সে কাজ করে। মন সব-কিছু করে বলতে আত্মাই মনকে প্রেরণা যোগায়। মন তাই *medium* (সহায়ক) বা যন্ত্র। কিন্তু আত্মাতে কোন কর্তৃত্ব প্রভৃতি গুণ বা অভিমান নাই, অথচ 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি',—তাঁরই (ব্রহ্মেরই) আলোকে দুনিয়ার সব-কিছু আলোকিত হয়। জীবজন্তু সকলেই ব্রহ্মের বা আত্মার কাছ থেকেই শক্তি ও প্রেরণা পেয়ে কাজ করে। দেদীপ্যমান সূর্য সকলের উপর সমানভাবে কিরণ দেয়, *partiality* (পক্ষপাতিত্ব) তাতে কিছুমাত্র থাকে না। সূর্য কিরণ না দিলে আলোর অস্তিত্ব থাকতো না। জ্ঞানময় আত্মা আছেন বলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল-কিছুর সত্তা বা অস্তিত্ব আছে। মন আত্মার দ্বারী। সাধারণ লোক কিন্তু মনকেই কর্তা ভাবে, আর ভাবে বলেই সে মনের বশীভূত হয়, আর সৃষ্টি হয় যত-কিছু অনর্থের। সাধনার অর্থ হ'ল মনের 'অহং'-কর্তৃত্বাভিমানকে দূর করা; অর্থাৎ মনকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তুমি কর্তা নও, কর্তা হলেন শরীরী আত্মা,—যিনি শরীরে আছেন, আবার জগতের সর্বত্রও আছেন। আত্মা ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই-ই। আত্মা বিন্দু ও সিন্ধু দুই-ই। যখন এইরকম ভাব্‌তে পার্‌বে, তখনই তোমার মন বশীভূত হবে। তুমি মনের পারে যাবে[১৯]।' মনই মুক্তির

১৯। 'মনের পারে' বলতে মন থাকে, কিন্তু তা আত্মচৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। সংকল্প ও বিকল্প এই দু'টি বিরোধী বৃত্তি নিয়েই মনের মনত্ব। এ'দুটি নষ্ট অর্থাৎ শান্ত হ'লে মন আর মন থাকে না, মন তখন শুদ্ধচৈতন্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ব্রহ্মে যখন সংকল্প-রূপ ইচ্ছার আবরণ কল্পিত হয়, তখনই তিনি 'মন'-রূপে প্রতিভাত হন, নিশ্চয়াত্মিকা-বৃত্তির আবরণ কল্পিত হ'লে চৈতন্য আত্মপ্রকাশ করেন নিজেকে 'বুদ্ধি'-রূপে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন সাজ-পোষাক পরে একই লোক বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন অভিনয় করে, কিন্তু আসলে লোক একটাই ; তেমনি ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু নাম ও রূপের জন্য তিনি ভিন্ন ব'লে মনে হন। নাম-রূপের নাশ আছে, কেননা তারা কল্পিত। সুতরাং মনের পারে যাওয়া বা মনের ধ্বংস বলতে 'মন' এই নাম-রূপেরই কেবল ধ্বংস বা পরিবর্তন হয়, মনের নিয়ন্তা আত্মা চিরদিনই অবিকৃত ও শাশ্বত থাকেন।

অন্তরায় বা বাধা, আবার মনই মুক্তির সহায়ক। মন অন্তরায়, কেননা মনই আবার কর্তা সেজে নিজে আত্মা থেকে পৃথক এ'কথা জানিয়ে দেয়, আর মন সহায়ক, কেননা মনই বুদ্ধিরূপে আত্মাকে নিশ্চয় ক'রে জানিয়ে দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন, আর তাতে ক'রে বৃত্তির মধ্যে যে অজ্ঞান তা' নষ্ট হ'য়ে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানই আসলে শুদ্ধজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান,—ইংরেজীতে যাকে বলে *Self-knowledge* বা *Godconsciousness*। শ্রীরামকৃষ্ণ এ'কথাই বলেছেন একটু ভিন্নভাবে। তিনি বলেছেন ঃ 'মহামায়া অন্তঃপুর-পর্যন্ত যেতে পারেন না, তিনি ব্রহ্মকে দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হন।' এই দেখিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব কিন্তু বুদ্ধির। বুদ্ধিই আবার মায়া বা মহামায়া। স্বরূপে মনও তাই। মহামায়ার সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদ কেবল উপাধিভেদ নিয়ে পার্থিবদৃষ্টিতে, পারমার্থিক-দৃষ্টিতে দুইই এক।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন যে, মন প্রসন্ন হ'লে আত্মজ্ঞানও দিতে পারে। ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধমনের গোচর। তাই কি?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'হ্যাঁ, তাই বৈকি। মন প্রসন্ন হওয়ার অর্থ মন শুদ্ধ হওয়া। মনের সংকল্প ও বিকল্প বৃত্তিদুটি বিনষ্ট হলে মন শুদ্ধ হয়। মন শুদ্ধ হ'লে মন মনরূপে আর থাকে না, তখন শুদ্ধচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়। এটাকেই ভিন্নভাবে বলা হয়েছে মন প্রসন্ন হ'লে আত্মজ্ঞান দিতে পারে। একই কথা। সাপের গতি না থাক্‌লে তাকে স্থিরসাপ বলে। আসলে সচল-সাপ ও নিশ্চল-সাপের মধ্যে সাপ একটাই। চলা ও না-চলা তার উপাধি বা কর্ম।'

স্বামীজী মহারাজকে তামাক দেওয়া হ'ল। তিনি গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন ঃ 'বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়া যাক্।' তিনি তামাক খেতে লাগ্‌লেন। এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক (স্বামীজী মহারাজেরই শিষ্য) এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁর দিকে তাকিয়ে বল্লেন ঃ 'এই যে, ক্যামন আছেন? আপনার চিঠি পেয়েছি। বাড়ীর অসুখ-বিসুখ কিছুটা সেরেছে তো?' ভদ্রলোক শশব্যস্তে উত্তর দিলেন ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ সব আপনারই আশীর্বাদ।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'আমার আশীর্বাদ নয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের যন্ত্র বৈ তো নয়, তিনিই যন্ত্রী, তাঁর ইচ্ছায়ই সব-কিছু হচ্ছে। 'সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।'

ভদ্রলোক আমাদের পাশে এসে বস্‌লেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁর দিকে

তাকিয়ে বেশ খুসী মেজাজে আবার বল্লেন ঃ 'এখন আমেরিকার গল্প চল্‌ছে। অনেক দিনের কথা, এতদিন পরে সেই সব কথা বল্‌তে বেশ আনন্দ লাগ্‌ছে। আর আপনাদেরও লাভ,—বিনা-পয়সায় আমেরিকার সব খবর জানা হ'য়ে যাচ্ছে।'

ভদ্রলোক বল্লেন ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ।' স্বামীজী মহারাজ তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন ঃ 'স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর প্রসঙ্গে আমেরিকার এক দিনের কথা মনে পড়ে। যতদূর মনে পড়ে সেটি ইংরেজী ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে হবে।[২০] সে'দিন সন্ধ্যার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেকচার (বক্তৃতা) ছিল ট্রিনিটি-অডিটোরিয়মে *(Trinity Auditorium)*। রবীন্দ্রনাথ একটি ম্যানুস্ক্রিপ্ট্ *(manuscript*—বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি বা লেখা-কাগজ) পড়্‌ছিলেন *The World of Personality*-র ('ব্যক্তিত্বের বিকাশ'-এর) উপর। বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। লেক্‌চার (বক্তৃতা) শেষ হ'লে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা কর্‌লাম। তিনি আমেরিকায় আমার কাজের কথা খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কৃতকার্যতা ও কাজের প্রসারতার কথা শুনে খুব খুসী হয়েছিলেন।

'তাছাড়া আর একটি মিটিঙে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) *preside* (সভাপতিত্ব) করেন, আমি তাতে বক্তৃতা করেছিলাম। সেইবার আমার আশ্রম দেখার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করি। কিন্তু কাজের চাপের জন্য তিনি যেতে পারেন নি।

'লালা লাজপত রায়, ধর্মপাল (অনাগারিক দেবমিত্ত ধর্মপাল,—মহাবোধি সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা), আলোয়ারের মহারাজা (জয়সিংহ), বরোদার গাইকোয়াড় (সওয়াজী রাও) ও মহারাণীর সঙ্গেও আমার আমেরিকায় দেখা হয়েছিল। একবার বিশেষ একটা সভায় আমি *Worship of Buddha* (বুদ্ধের পূজা)-সম্বন্ধে বক্তৃতা কর্‌ছিলাম। অনাগারিক ধর্মপাল তাতে উপস্থিত ছিলেন।[২১] (আমেরিকায়) আমার আশ্রমে যাওয়ার জন্য একদিন তাঁকেও নিমন্ত্রণ করি। ঐদিন শরৎচন্দ্র রুদ্র (জিওলজিষ্ট ও মাইনিঙ্-ইঞ্জিনিয়ার এস. সি. রুদ্র) ও বোম্বের ডাঃ এস. বি. নায়েকের সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছিল।

'আলোয়ারের রাজা জয়সিংহ ছিলেন তখন (আমেরিকায়) হাইড-পার্ক-হোটেলে *(Hyde Park Hotel)*। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। মহারাজ বিশেষ বিদ্বান ও মিষ্টভাষী ছিলেন। অতি চমৎকার ইংরেজী বল্‌তে পারতেন,—ঠিক ইউরোপীয়ানদের মতো। আমি

২০। ইংরেজী ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

২১। ইংরেজী ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১২ই নভেম্বর, রবিবার।

নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর সঙ্গে হাইড-পার্ক-হোটেলে একদিন দেখা করি। আমেরিকায় আমার কাজ বেশ successfully (সাফল্যের সঙ্গে) হচ্ছে কিনা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 'বেদান্ত'-সম্বন্ধেও তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল। আমার সঙ্গে একঘণ্টারও বেশী সময় বেদান্ত-সম্বন্ধে তিনি আলোচনা কর্‌লেন'।[২২]

আমরা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ঃ 'মহারাজ, আপনি যে বরোদার গাইকোয়াড়ের কথা বল্লেন, ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কোথায়?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'আমেরিকায়ই গাইকোয়াড় ও মহারাণীর সঙ্গে আমার দেখা ও আলাপ-পরিচয় হয়।[২৩] গাইকোয়াড়ের ভাই ও তাঁর সেক্রেটারী মিঃ দাতারও (Mr. Datar) সঙ্গে ছিলেন। আশ্রমে একদিন তাঁদের সকলকে invite (নিমন্ত্রণ) ক'রে নিয়ে যাই।[২৪] গাইকোয়াড় ও মহারাণী আশ্রম দেখে খুব খুসী হয়েছিলেন। তাঁরা আমায় অনুরোধ জানালেন যে, ভারতে ফিরে বরোদায় তাঁদের সঙ্গে যেন আবার দেখা করি। নানান্ কাজের চাপে এখানে (ভারতে) ফিরে তাঁদের সঙ্গে আর দেখা কর্‌তে পারিনি। ইংরেজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথমবার ফিরে আসার ঠিক দু'একদিন পূর্বেই তাঁদের সঙ্গে আমেরিকায় আমার দেখা হয়েছিল। যে'দিন প্রথমবার আমায় *Farewell Address* (বিদায়-সংবর্ধনা) দেওয়া হয় সে'দিনও মহারাজা, মহারাণী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন'।[২৫]

তারপর কি জানি কেন হঠাৎ তিনি একটু গম্ভীর হলেন। রুমালে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে কিছুক্ষণ পরে আবার বল্লেন ঃ 'ভগবান যার সহায়, সংসারে তার আর ভাবনা কি বলো! ভক্ত মানে সত্যকারের সরল বিশ্বাসী একান্তচিত্ত মানুষ। এখানে আমার জীবনের একটি ঘটনার কথা তোমাদের বলি শোন,—যার পিছনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম কৃপা ও করুণা ছিল। তিনি যে সকল সময়েই পিছনে থেকে আমাদের (তাঁর সন্তানদের) সাহায্য ও রক্ষা করতেন এবং এখনও সদাসর্বদাই করেন, তার জ্বলন্ত নিদর্শন আমি অনেক পেয়েছি। তাঁর পবিত্র *presence*-ও (উপস্থিতি) জীবনে অনুভব করেছি বহুবার। তিনি যে অশেষ করুণাময়, আমাদের হাত ধরেই সর্বদা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—একথা

২২। ইংরেজী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫ই ও ২৪শে জুলাই, সোম ও মঙ্গলবার।

২৩। ইংরেজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই মে রবিবার।

২৪। ইংরেজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৪ই মে সোমবার।

২৫। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীজী মহারাজ ইংরেজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেও কোন এক সময়ে একবার বরোদারাজ্যে যাবার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু নানান কারণে তা সম্ভব হয় নি।

মর্মে মর্মে আমি বুঝেছি।'

আমরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে বসে আছি, কারু মুখে কোন কথা নেই। ঘরের পরিবেশ শান্ত ও গম্ভীর। স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'একবারের কথা। লণ্ডন থেকে সেইবার আমেরিকায় যাব। জাহাজের টিকিট কেনার সব ঠিকঠাক্। ইংল্যাণ্ডের বন্দর থেকে যে জাহাজ ছাড়বে তার নাম ছিল 'লুসিটেনিয়া'। টিকিট কিন্‌তে গিয়ে (৬ই মে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ) এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘট্‌লো। টিকিট কিন্‌বো এমন সময়ে মনে হ'ল যেন কে টিকিট কাট্‌তে আমায় নিষেধ কর্‌লো। আমি হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। ভাব্‌লাম মনের ভুল। এ'দিকে সে'দিকে তাকালাম, কাকেও দেখ্‌তে পেলাম না। সুতরাং আবার গেলাম টিকিট কিন্‌তে। সে'বারেও ঠিক সেই রকম। তখন টিকিট কেনা আর হ'ল না, বাসায় ফিরে আসাই ঠিক কর্‌লাম। ভাব্‌লাম—কালই না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি বড় বড় হরফে লেখা—'S. S. Lusitania is no more'—অর্থাৎ লুসিটেনিয়া আটলান্টিক-মহাসাগরের বুকে কাল রাত্রে ডুবে গেছে।[২৬] আমি অভিভূত হ'য়ে পড়্‌লাম। চোখে জল এলো। বুঝ্‌লাম শ্রীশ্রীঠাকুরই আমায় রক্ষা করেছেন।'

আমরা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ঃ 'মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দেরও এ'রকমের একটা ঘটনা ঘটেছিল কাশ্মীরে ক্ষীর-ভবানীদেবীর মন্দিরের সাম্‌নে? তিনি একটি অশরীরী বাণী শুনেছিলেন শূন্যদেশ থেকে।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'কি জানি বাপু, দৈববাণী—কি অশরীরী-বাণী—কিছুই তখন বুঝ্‌তে পারিনি। তবে এ'রকমের যে একটা হয়েছিল এটা ঠিক। অশরীরী-বাণীও শোনা যায়।[২৭] কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বাঁচিয়েছেন। তাঁর

২৬। ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডের যাত্রীবাহী জাহাজ (liner) 'লুসিটেনিয়া' (S. S. Lusitania) জার্মানদের কোনও একটি সাবমেরিনের আক্রমণে আয়র্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত কর্ক-এর (Cork) উপকূলের কিছু দূরে ৭ই মে, ১৯১৫ তারিখে ডুবে গিছ্‌লো। সেই জাহাজের ডুবিতে ১১৯৮ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতবাসীও ছিলেন।

২৭। অশরীরী-বাণী বা দৈববাণী-সম্বন্ধে অন্য সময়ে একবার স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। তিনি যা বলেছিলেন তার মর্ম হ'ল ঃ 'সবার পিছনেই একটা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি থাকা চাই। দৈববাণী আসলে চৈতন্যময় আত্মারই নির্দেশ বা ইঙ্গিতময়ী বাণী। সর্বান্তর্যামী ভগবান তো জ্ঞানরূপে সকলের ভিতরেই আছেন। বিবেক, দিব্যদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, ভবিষ্যৎদৃষ্টি, দূরশ্রবণ—এ'সবই আত্মারই শক্তি। সকলের আত্মা

অশেষ করুণা আমাদের উপর।'

আমরা ঃ 'মহারাজ শুনেছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী-লেখক শ্রদ্ধেয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ('মানসী'-পত্রিকার সম্পাদক) নাকি ঐ লুসিটেনিয়া-জাহাজেই ডুবে মারা যান?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'তা হবে।' এই বলে তিনি বেশ-একটু অন্যমনস্ক হ'লেন দেখ্‌লাম।

পুনরায় লণ্ডন যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠ্‌তে স্বামীজী মহারাজ সে'দিন তাঁর গুরুভাইদের কথা বল্‌তে বল্‌তে ভাবে বিভোর ও আত্মহারা হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু প্রথমে যে কথার আলোচনা হচ্ছিল তা বন্ধ ক'রে হঠাৎ তিনি লাটু-মহারাজের (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) কথা বলতে লাগ্‌লেন। তিনি বল্লেন ঃ 'লাটু মহারাজ তখন বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকেন। ইংরেজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে এই ঘটনা হবে। লণ্ডনে যাওয়ার সময়ে রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও আমার গুরুভাইয়েরা সকলেই আমায় আউটরাম-ঘাটে জাহাজে তুলে দিতে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন লাটু, যোগীন (স্বামী যোগানন্দ), সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ), হরি ভাই (স্বামী তুরীয়ানন্দ), তুলসী (স্বামী নির্মলানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), খোকা (স্বামী সুবোধানন্দ), গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ) প্রভৃতি। কিন্তু বেশী ক'রে মনে পড়্‌ছে লাটু মহারাজের কথা। আমাকে বিদায় দেওয়ার সময়ে লাটু মহারাজের কি কাতর দৃষ্টি। তার দু'টি চোখ জলে ভ'রে উঠেছিল দেখেছি।

'একবার একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল লাটু মহারাজকে নিয়ে। বরানগর-মঠে থাক্‌তেই আমি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার স্তোত্র রচনা করেছিলাম সংস্কৃতে। শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করতো। পূজার পর প্রতিদিন সকলে সমবেত হ'য়ে ঐ আমার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র পাঠ কর্‌তাম। স্তোত্রের শেষে প্রণাম কর্‌তাম এই ব'লে—

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং, ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং, তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ।

সকল সময়েই সকল-কিছু জান্‌তে পারে। তাই দৈববাণী নিজেরই জ্ঞানময় আত্মার নির্দেশ। তা মনের ভিতর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র, কিন্তু লোকে ভাবে শূন্য থেকে ঐ শব্দ আস্‌ছে।

এ'সম্বন্ধে তাঁর *Divine Inspiration*-বক্তৃতায় স্বামী অভেদানন্দ আরও ভালভাবে আলোচনা করেছেন।'

'একদিন প্রণামের পর দেখি, লাটু মহারাজ ভারি চটে গেলেন। শরৎকে (স্বামী সারদানন্দ) সাম্‌নে পেয়ে লাটু মহারাজ রাগে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন ঃ 'এ শর্‌ট, টোমরা শেষে ঠাকুরকে ভুলে গিয়ে কিনা যীশুকেষ্টকে পূজো কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে? তোম্‌রা কী সব হ'লে বোলো দিখিনি? এরি মধ্যে এমোন?' শরৎ তো হেসেই অস্থির। বুঝ্‌তে বাকী রইলো না যে, প্রণামমন্ত্রের 'ঈশাবতারং' কথাটা লাটুর প্রাণে ভারি দুঃখ দিয়েছে। আমি তারপর সেখানে গিয়ে উপস্থিত। শরৎ আমাকে দেখে বল্লে ঃ 'কালী ভাই, লাটু কি বলে শোন। এ' আজ ভারি চটেছে।' আমি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি ব্যাপারটা কি, এরই মধ্যে লাটু মহারাজ আমার সাম্‌নে এসে বল্লে ঃ 'কালী, তুই এরি ভেতর ঠাকুরকে বলিস্‌ কিনা যীশুকেষ্টর অবতার?' শুন্‌লাম লাটু মহারাজকে কেউ নাকি 'ঈশাবতারম্‌'-কথাটার অর্থ যীশুখ্রীষ্টের অবতার বলেছে। আমি তখন বুঝিয়ে বল্‌লাম ঃ 'ভাই তাও কি কখনো হয়? শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমরা ভুল্‌বো একথা মুখে আনাও অন্যায়। তিনি যে আমাদের মাথার মণি, তাঁকে ধরেই তো এতো বাধা-বিপত্তি ও ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে আমরা এখনো টিকে আছি।' তারপর লাটু-মহারাজকে শ্লোকটির অর্থ বুঝিয়ে বল্লাম। তখন লাটু মহারাজের মুখে হাসি আর ধরে না। কি সেই সরলতাপূর্ণ হাসি! লাটু মহারাজ আনন্দে ঘাড় নেড়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে ঃ 'ওঃ, তাই বলো, আমিই তাহ'লে ভুল বুঝেছিলাম।' শুনে শরৎ ও আমি হেসে অস্থির হলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর তার প্রগাঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার ভাব দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। গুরুর প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাই লাটু মহারাজকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছিল!

'এ'কথার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা স্বামীজী মহারাজের মধ্যে বেশ একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। দেখ্‌লাম চোখ-দুটো জলে ভরে উঠেছে। গুরুভাইয়ের প্রতি গুরুভাইয়ের নিবিড় ভালবাসার স্মৃতিই যেন তাঁকে বিচলিত করেছিল বলে মনে হ'ল। কি সরলতা ও প্রেমের প্রতিমূর্তিই না ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানরা! সকলে ছিলেন একই ছাঁচে ও একইভাবে গড়া! তাঁদের মধ্যে একই ভাব, একই ধরনের সহজ-সরল কথা ও আলাপ-আলোচনা। ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁদের সমান ব্যবহার।'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'লাটু মহারাজের স্বার্থহীন ভালবাসার কথা আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে! আলমবাজার-মঠে একবার আমার ভীষণ অসুখ কর্‌লো। ডাক্তার বল্লে ছোঁয়াছে অসুখ। লাটু মহারাজের সেই কথায় দৃক্‌পাত

নেই। শরৎও (স্বামী সারদানন্দ) তাই। দু'জনেই আমার কি সেবাই না করেছিল!

'লাটু মহারাজ মাঝে-মাঝে আমায় আমেরিকায় চিঠিপত্র লিখ্‌তো। একবার লিখ্‌লে যে, চোখের অসুখ, ছানি কাটানো দরকার, কিছু টাকা পাঠাতে হবে। আমি তখুনি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।[২৮]

'আর একবার একটি মজার ব্যাপারের কথা বলি শোন। লাটু মহারাজ আমায় লিখে পাঠালো আমেরিকা থেকে একটি ঘড়ি আর গেরুয়া-পাগ্‌ড়ি পাঠানোর জন্য। আমি কিন্তু তাঁকে একটা র‍্যাট্‌ল-সাপের (Rattle-snake)[২৯] ল্যাজ পাঠিয়েছিলাম। র‍্যাট্‌ল-সাপ ভারি বিষাক্ত, কাকেও কামড়ালে সে আর বাঁচে না। ভগবানের সৃষ্টি কি রকম দ্যাখো। তিনি তাই তার ল্যাজে ঝুমঝুমি দিয়েছেন। মানুষ বা যেকোন প্রাণী ঐ শব্দ শুনে বুঝ্‌তে পারে যে, র‍্যাট্‌ল-সাপ আস্‌ছে। শুনেছিলাম র‍্যাট্‌ল-সাপের ল্যাজ পেয়ে লাটু মহারাজ নাকি ভারি চটেছিলো, বলেছিলো ঃ 'দেখনা, কালীর কি বেপার! আমি বোল্লাম তাকে ঘড়ি আর পাগ্‌ড়ী পাঠাতে, আর সে পাঠালো কিনা আমায় একটা সাপের লেজ? এ' তো ভারি কথা গো!'

আমরা শুনে সকলে হেসে অস্থির।

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'আমাদের (গুরুভাইদের) ভিতর এ'রকম হাসি-ঠাট্টা-তামাসা প্রায়ই চল্‌তো।[৩০] এটা ভালবাসার লক্ষণ। আমি যখন আমেরিকায়, শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) এরাও প্রায়ই চিঠিপত্র লিখ্‌তো।[৩১] ঠিক সময়ে উত্তর না পেলে তারা অভিমান করতো,

---

২৮। এই ঘটনার কথা স্বামীজী মহারাজ তাঁর *Leaves from My Diary*-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "Tues, (Tuesday), Oct. 27, Prof Hiren Corson called about 11 A. M. Sent to Latoo £3—10s.=Over Rs. 50/-"

২৯। এই রকম সাপ আমেরিকায় সচরাচর পাওয়া যায়। কাকেও কামড়ানোর বা আক্রমণ করার পূর্বে সে লেজ আছড়ায় ও তাতে ঝুমঝুমি বাজানোর মতো শব্দ হয়।

৩০। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আরও একটি কথা। আমরা তখন কয়েকদিনের জন্য ছিলাম দার্জিলিঙ, রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রমে। ইংরেজী ১৯৩৩ কিংবা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হবে। সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দজী স্বামীজী মহারাজকে চিঠি লিখেছেন সে'খানকার ঠাকুর-ঘরের জন্য একটি ঘণ্টা ও আরো কি কি জিনিষ পাঠানোর জন্য! স্বামীজী মহারাজ চিঠি পেয়ে খুব একচোট হেসে বল্লেন ঃ 'গঙ্গাধরের ব্যাপারটা একবার দ্যাখো, পাহাড়ী-জায়গা দার্জিলিঙ, বাস করি হিমালয়ের চুড়োয়, আর আমায় কিনা লিখে পাঠিয়েছে একটা ঘণ্টা কিনে পাঠাতে। ভালো, আমিও পাঠাচ্ছি মজার একটা জিনিস।' পরে শুনেছিলাম স্বামীজী মহারাজ পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজকে কতকগুলি পাহাড়ী রঙিন ফুল পাঠিয়েছিলেন,—যা শুকিয়ে গেলেও বহুদিন টাট্‌কা ফুলের মতো থাকে। আর

রাগও করতো, কি ভালোবাসাই না তাদের ছিল গুরুভাইদের প্রতি!'

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর অভিন্নহৃদয় গুরুভাইদের কথা বল্‌তে বল্‌তে আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। মুখ প্রদীপ্ত, চোখ-দু'টি সামান্য ছলছল। তিনি আবার বল্‌তে উদ্যত হচ্ছেন, এমন সময়ে আমাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'মহারাজ, শ্রীশ্রীমা'র করুণা তো আপনার উপর অফুরন্ত ছিল! তাঁর প্রসঙ্গ কিছু আপনার মুখ থেকে আমাদের শুন্‌তে ইচ্ছা হয়।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'শ্রীমা-র অজস্র আশীর্বাদ ও করুণা আমার উপর ছিল। তিনি ছিলেন সবারই করুণাময়ী জননী। তিনি ছিলেন সরলা বালিকার মতো! বাইরের লোকের কাছে তিনি ছিলেন নিতান্ত লজ্জাশীলা, কিন্তু ভক্ত-সন্তানদের কাছে ছিলেন সর্বদাই হাস্যময়ী। শ্রীমা থাক্‌তেন স্বভাবতই অতি-সাধারণ মেয়েদের মতো, মনে হ'ত দুনিয়ার কোন-কিছুই যেন তিনি জানেন না। কিন্তু তাঁর ছিল ত্রিকালদর্শী চক্ষু! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সবই জ্ঞানচক্ষে তিনি দেখ্‌তে পেতেন! অসামান্যা বুদ্ধিমতী ও মহীয়সী নারী ছিলেন শ্রীমা, অথচ বাইরে ছিলেন সকল রকম ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরবিহীনা! এতটুকু অলৌকিক শক্তি বা বিভূতির বিকাশ তাঁর মধ্যে কখনো কেউ দ্যাখেনি! মোটকথা শ্রীমা ছিলেন একাধারে সাদাসিদে পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো সরলা, আবার সর্বজ্ঞানময়ী ও করুণাময়ী সাক্ষাৎ জগজ্জননী। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে কিছু-কিছু ঐশ্বর্যের প্রকাশ বরং ছিল, কিন্তু শ্রীমা ছিলেন সর্বৈশ্বর্যবিহীনা! সকল শক্তিকে তিনি নিজের মধ্যে চেপে রাখ্‌তে পেরেছিলেন। কি মহিয়সী নারীই না তিনি ছিলেন! তাঁর মহিমা উপনিষদের ভাষায় বর্ণনা করতে গেলে বল্‌তে হয় ঃ 'তং দুর্দর্শং গূঢ়ম্', —দুর্বিজ্ঞেয় ও অতীব নিগূঢ় শ্রীমার ভাব ও প্রকৃতি।

'আলমবাজার-মঠে থাক্‌তে শ্রীমার স্তোত্র[৩২] রচনা ক'রে শ্রীমাকেই প্রথম শোনালাম। তিনি শুনে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন ঃ 'তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।' 'মূকং করোতি বাচালম্',—সত্যই আমার মতো মূককে তিনি বাচাল

পাঠিয়েছিলেন একটি পূজার ঘণ্টা, একটি তিব্বতী লোমওয়ালা অদ্ভুত রকমের টুপী ও আরো-কিছু খেলনার জিনিষ। জিনিসগুলি পেয়ে পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ নাকি হেসেছিলেন ও যেমন, চটেছিলেনও তেম্‌নি—অবশ্য নিবিড় ভালবাসার ভাব নিয়ে।

৩১। স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের কয়েকটি পত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-মঠ থেকে প্রকাশিত "পত্র-সংকলন"-গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।

৩২। 'প্রকৃতিং পরমাং অভয়াং বরদাম্' প্রভৃতি ছন্দোময় শব্দে পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-রচিত 'শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্'।

করেছিলেন! নইলে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মতো দেশে ধুরন্ধর সব পণ্ডিত ও পাদরীদের কাছ থেকে আমার মতো অজ্ঞাত একজন ভারতবাসী কি জয়টীকা নিয়ে ভারতে ফিরতে পারে! সবই শ্রীমা ও শ্রীঠাকুরের অশেষ ও অসাধারণ কৃপা!'

আমরা ঃ 'মহারাজ, আমরা শুনেছি যে, শ্রীমা নাকি আপনার সঙ্গে সাম্‌না-সাম্‌নি কথা বল্‌তেন না, আপনাকে অন্যকে দিয়ে ব'লে পাঠাতেন?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'কে বল্লে। যোগীন (স্বামী যোগানন্দ), লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) ও আমি—এই চারজনের সঙ্গে শ্রীমা সাম্‌নাসাম্‌নি কথা বল্‌তেন। তবে শ্রীমা ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীলা, বাইরের যেকোন লোকের সাম্‌নে তিনি একহাত লম্বা ঘোমটা দিয়ে থাক্‌তেন। এমনকি স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ), রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতির কাছেও শ্রীমা মাথায় একটু কাপড় দিয়ে অপরকে দিয়ে কথা বল্‌তেন। অতিসরলা সাধারণ বালিকার মতো স্বভাবসম্পন্না ছিলেন শ্রীমা, তাই লজ্জাটা ছিল তাঁর প্রকৃতির একটা অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গভূষণ।

'শ্যামপুকুরের বাড়ীতে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পেটের অসুখ ডাক্তাররা পথ্যের ব্যবস্থা করলেন ভাত ও গুগ্‌লির ঝোল। শ্রীমা তখন আমাকে বল্‌তেন বাজার থেকে গুগ্‌লি কিনে আন্‌তে। আমি বাজার থেকে গুগ্‌লি কিনে এনে ইঁট দিয়ে খোলাগুলো ভেঙে তৈরী ক'রে দিতুম, শ্রীমা ঝোল রান্না ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে খেতে দিতেন। 'শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রটি' লিখে যখন শ্রীমাকে নিজে পড়ে শোনালাম, তখন শুনে তাঁর কি আনন্দ ও করুণাপূর্ণ প্রসন্নতার হাসি। যেন ছোট্ট একটি সরলা বালিকা! শ্রীমা আমার সঙ্গে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে কথা বল্লেন ও হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। এখন তোমরাই বলো যে, তিনি আমার সঙ্গে কথা বল্লেন,—না তো দেওয়ালের সঙ্গে বল্লেন?' এই ব'লে স্বামীজী মহারাজ হো হো শব্দে উচ্চহাস্য ক'রে উঠ্‌লেন। তাঁর হাসির সঙ্গে মেশানো ছিল করুণারূপিণী শ্রীমার উপর তাঁর অন্তরের একান্ত ও নিবিড় ভালবাসা।

'আমেরিকা থেকে নিয়মিতভাবে আমি শ্রীমাকে পত্র লিখ্‌তাম এবং শ্রীমাও সেগুলির উত্তর দিতেন। একবার ফ্রাঙ্ক্‌-ডোরাকের Oil-Painting-এর

(তৈলচিত্রের) একটা ফটো শ্রীমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।[৩৩] শ্রীমা ফটো পেয়ে অত্যন্ত খুসী হয়েছিলেন। তিনি আনন্দের সঙ্গে চিঠি লিখে আশীর্বাদও করেছিলেন!

'শ্রীমার দয়ার কথা কি কোনদিন ভোলা যায়! শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ্ যাওয়ার পর শ্রীমা যান বৃন্দাবন। আমি, যোগীন ও লাটু এই তিনজনে শ্রীমার সঙ্গে গেলাম। মহাপুরুষ (স্বামী শিবানন্দ) তার পরে গিয়েছিলেন। ঐ সময়েই্ তো শ্রীম-র (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার মাষ্টার মশায়ের) স্ত্রীকে আমি সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় আসি। শ্রীমা-ই্ আমায় বলেছিলেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। শ্রীম-র স্ত্রীর মাথা তখন একটু খারাপ ছিল।'

এরই মধ্যে একজন ভদ্রলোক এসে স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করলেন। স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'বসো।' ভদ্রলোক অবশ্য আমাদের ও স্বামীজী মহারাজের পরিচিত। তিনি আমাদের একপাশে বস্‌লেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁকে উদ্দেশ ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন ঃ 'কি সংবাদ বলুন?' ভদ্রলোক বল্লেন ঃ 'মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে সব ভাল। পূর্বে একদিন এসে আপনার মুখে আমেরিকার অনেক কথা শুনে আশ্চর্য হয়েছিলাম। কি নিষ্ঠাবান ও জিজ্ঞাসুই না ঐসব দেশের (আমেরিকার) লোকেরা।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'ওরা তো নিষ্ঠাবান হবেই। সাংসারিক ভোগের সুখ ওদের একরকম চরমে উঠেছে। কাঁহাতক আর জড়ের উপাসনা নিয়ে আজীবন থাকে বলুন! ঐশ্বর্য ওদের বিপুল। এখন ওরা চায় ধর্ম ও মনে একটু শান্তি! ওরা জান্‌তে চায় জড়বস্তু-ছাড়া আর কোন-কিছু আছে কিনা,—যা ওদেরকে পার্‌মেনেন্ট (স্থায়ী) সুখ ও শান্তি দিতে পারে। তাই স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন শিকাগোতে প্রথমবার (১৮৯৩ খ্রীঃ) গেলেন, তখনই্ ঐদেশের মানুষ এক নূতন পথের পরিচয় পেলো! নিরাশার অন্ধকারে আশাময় আলোর তারা সন্ধান পেলো।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, শুনেছি নাকি ওরা ভারতীয়-আদর্শের প্রতি

৩৩। শ্রীমাকে লিখিত একখানি পত্রের ফটো দেওয়া হ'ল (৯২ পৃষ্ঠায়)। স্বামীজী মহারাজ সম্ভবতঃ ইংরেজী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল এই পত্রখানি লিখেছিলেন ও পত্রখানি অন্য-একজনের পত্রের মধ্যে শ্রীমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সন্তান বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করেন।

পরমশ্রদ্ধাশীল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবকেও নাকি ওরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে ও ভালবাসে।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'হ্যাঁ, সত্যই তাই। কিন্তু তাই ব'লে মনে করো না যে, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের সমস্ত লোকই একেবারে হিন্দু হ'য়ে গেছে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবকে গ্রহণ করেছে। তবে ঐদেশের অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ও সার্বভৌমিক ভাবের ও আদর্শের উপর যে আকৃষ্ট হয়েছে—একথা ঠিক।'

হিন্দুধর্মের ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবধারার উপর পাশ্চাত্যবাসীরা যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাই আমরা স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের পাশ্চাত্যে প্রচারকার্যের গৌরবময় জয়যাত্রা দেখে। পরিপূর্ণ বস্তুতান্ত্রিকতার উপাসক ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অগণিত নরনারী, কিন্তু প্রাচ্যের মহিমময় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ তারা নির্বিচারে গ্রহণ করেছিল। এখনও ভারতীয়-অধ্যাত্ম-সম্পদের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবমুখে বলেছিলেন ঃ 'সাগরপারে আমার আরো কত ভক্ত-সন্তান আছে!' সেই ভক্ত-সন্তানদের আবিষ্কার করার জন্যই তো দিব্যনির্দেশ ও প্রেরণা পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ! শিকাগোর স্মরণীয় ধর্ম-মহাসম্মিলনের আয়োজনের পিছনে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণেরই আশীর্বাদ। পাশ্চাত্যদেশে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ-পদার্পণ সৃষ্টি করলো তাই অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর এক পরিবেশ। কলম্বস্ আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকার জড়-রক্তমাংসের দেহ, শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ আবিষ্কার করলেন আমেরিকার প্রাণ! সার্থক হ'ল তাঁর বিজয়-অভিযান, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার জয়গাথা হ'ল সমগ্র বিশ্বেই বিঘোষিত, সীমায়িত দৃষ্টিসম্পন্ন পাশ্চাত্যের নরনারী পেলো প্রাচ্যের শান্তিময় আলোক, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার প্রতি তাই জানালো তারা পরমশ্রদ্ধার প্রণতি ও অন্তরের কৃতজ্ঞতা! স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি প্রাচ্য-আদর্শবাহীদের পদার্পণকেও জানালো তারা অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অভিনন্দন।

॥ শ্রীশ্রীমা-কে লিখিত স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র ॥

বেদান্ত আশ্রম
১৮ই এপ্রিল

পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রী-মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণ-কমলেষু

মা, সেবকগণ-সহ-আমার
শারীরিক কুশল-সংবাদ জানিবেন।
আপনারই আশীর্বাদে ভাল আছেন।
শ্রীশ্রী-গুরুদেব তাঁহার প্রিয় সন্তান
গুলিকে এক-২ করিয়া লইতেছেন
কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহাপেক্ষা
দুরদৃষ্ট আর কি হইতে পারে?
শ্রীশ্রীগুরুদেবের এক পরম ভক্ত
তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া আমাকে
পাঠাইয়া দেয়। সেই ছবির ফটো
প্রায় আপনার জন্য পাঠাইতেছি

[পর পৃষ্ঠায়

আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র
উপহার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ
করিবেন — ইহাই আমার প্রার্থনা।
আপনার আশীর্বাদে আমি
ভাল আছি। আমার অসংখ্য ও
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন এবং
আশীর্বাদ করিবেন। আপনার
কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখী
করিবেন। অধিক আর কি লিখিব

— ইতি আপনার
দাসানুদাস
স্বামী
অভেদানন্দ

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণী
সারদা দেবী

For Sarada Devi.
Swami Saradananda
Udbodhan Office
Baghbazar P.O.
Calcutta India.

॥ স্মৃতি ঃ পঁচিশ ॥

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অভেদানন্দ মহারাজ কিছু দিনের (ছ'মাসের) জন্য ভারতে এসেছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ ৬ই মে বুধবার আমেরিকা থেকে তিনি ভারতাভিমুখে রওনা হ'ন সকাল ন'টায়। 'হোয়াইট ষ্টার লাইন পায়ার্স' *(White Star-Line Piers)* দিয়ে ম্যাজিষ্টিক-ষ্টিমারে ভারতের পথে তিনি এসে পৌঁছুলেন লণ্ডনে। সেখান থেকে পেনিন্‌সুলার-এ্যান্ড-ওরিয়েন্টাল-ষ্টিমার 'এস. এম. সুলতান'-জাহাজে কলম্বোয় উপস্থিত হলেন ১৬ই জুন রবিবার বেলা দেড়টার সময়ে। মাননীয় নারায়ণ-স্বামী, ডাঃ বেঙ্কটরঙ্গম-প্রমুখ কলম্বোর বিশিষ্ট নাগরিকগণ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন কলম্বোবন্দরে। মাননীয় ত্যাগরাজের পৌরহিত্যে সেখানে বিরাট এক অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সেই সভায় পাশ্চাত্যদেশে প্রাচ্যের বিজয়-কাহিনী সম্বন্ধে কিছু-কিছু বলেন। অনাগারিক-ধর্মপালও সে'দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সিংহলের বিভিন্ন রাজপথ ও বিশিষ্ট স্থানগুলিকে পুষ্পমাল্যে ও নারিকেল-পাতায় সুসজ্জিত করা হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সিংহল থেকে ক্রমে জাফনা, অনুরাধাপুরম, তিউতিকোরিন, ভিন্নেভেলি, তেনকাসি, মদুরা, ত্রিচিনপল্লি, শ্রীরঙ্গম্‌, পাদুকোটা, তাঞ্জোর, কুম্ভকোনম, কুড্ডালোর, মাদ্রাজ, ময়লাপুর, ত্রিপ্‌লিকেন, বানিয়াম্বাড়ি, ধর্মছুরি, বাঙ্গালোর, উলসুর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে উপনীত হন। সর্বত্রই শোভাযাত্রা ও সভার অনুষ্ঠান ক'রে নগরবাসিগণ জানিয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দকে বিপুল সম্বর্ধনা। কলিকাতায় উপস্থিত হলেন স্বামী অভেদানন্দ ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬। বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে পুরোতন হাওড়া-পুলের উপর দিয়ে তাঁকে জাষ্টীস্‌ সারদাচরণ মিত্রের আর্য-ইনষ্টিটিউসনে আনা হ'ল ও সেখানেই অভিনন্দন সভার আয়োজন ক'রে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হ'ল। কলেজের ছাত্ররা তাঁর গাড়ী টেনে তাঁদের বিজয়ী অতিথির প্রতি সম্মান জানালো। কিছুদিন বেলগাছিয়ায় মাননীয় পশুপতি বসুর বাগানবাড়ীতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা টাউন-হলে একটি বিরাট নাগরিক অভ্যর্থনাও তাঁকে দেওয়া হ'ল। সর্বত্রই তাঁর বক্তৃতার আয়োজন হয়েছিল এবং বিশেষ ক'রে চিন্তাশীল যুবক ও স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দের হৃদয়ে তাঁর বক্তৃতা এক প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। হাওড়া-টাউন-হলে, চন্দননগর প্রভৃতি

স্থানে তাঁকে অভিনন্দনদানের আয়োজনও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

৫ই অক্টোবর (১৯০৬ খ্রীঃ) স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বাঁকিপুর যাত্রা করেন। বাঁকিপুর-টাউন-হলে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বিরাট এক জনসভার আয়জন করা হয়। সেখানেও তিনি বক্তৃতা করেন। বাঁকিপুর থেকে পাটনায় ও পাটনা থেকে বেনারসে উপস্থিত হলেন স্বামী অভেদানন্দ। বেনারসে উপস্থিত হ'লে হিন্দু-কলেজে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানালো ছাত্রগণ। মাননীয় জি. এস. আরুণ্ডেল সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বেনারস থেকে এলাহাবাদ, আগ্রা, আলোয়ার, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থান তিনি ভ্রমণ করেন। সর্বত্রই বিরাট জনতার উল্লাস ও শুভেচ্ছা তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছিল।

১লা নভেম্বর (১৯০৬) তিনি বোম্বাই-সহরে উপনীত হলেন। বিপুল-সাগ্রহ-জনতার জয়োল্লাস ও 'বন্দেমাতরম্'-সঙ্গীতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো সকলে। বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে ওয়ার্ডেন-রোডে শান্তিভবনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ফার্মজি-ইনষ্টিটিউট-হলে বোম্বাই-সহরের পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র অভিনন্দন দেওয়া হ'ল। বোম্বাই থেকে তিনি ইলোরা, কার্লে প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করেন।

১০ই নভেম্বর (ইং ১৯০৬) শনিবার ভারতভূমি ও ভারতের বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'পি. এ্যান্ড ও. এস্ এস. মার্মোরা'-জাহাজে আবার লণ্ডন-অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে নিলেন আমেরিকায় তাঁর প্রচারকার্যে সাহায্য করার জন্য। ১৮ই নভেম্বর (১৯০৬) রবিবার অপরাহ্ন চারটার সময়ে তিনি সুয়েজ-ক্যানেল ও ১৯শে নভেম্বর পোর্ট-সৈয়দ অতিক্রম করেন। মেসিনা-প্রণালী (Messina Strait) পার হওয়ার সময়ে তিনি এট্নার আগ্নেয়গিরি দর্শন করেন। বিসুবিয়াস-আগ্নেয়গিরিও তিনি ইতিপূর্বে দেখেছিলেন ও পরবর্তীকালে তার সম্বন্ধে কৌতুহলোদ্দীপক গল্পও করেছিলেন তিনি সকলের কাছে। বিসুবিয়াস-আগ্নেয়গিরি-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ 'যেন জীবন্ত রাক্ষসের মতো চব্বিশ ঘণ্টাই তার মুখ দিয়ে একটু-না-একটু আগুন বার হচ্ছে। আমি পাশ থেকে দাঁড়িয়ে তার মুখে একটা পোষ্টকার্ড ধরামাত্র তার খানিকটা তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠেছিল।' স্বামীজী মহারাজের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-মঠে সেই বিসুবিয়াসের আগুনে-পোড়া পোষ্টকার্ডটি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।

বনিফেসিড্-প্রণালী (Banifacid Strait) পার হ'য়ে ২৪শে নভেম্বর

(১৯০৬) শনিবার স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মার্শেলস্-বন্দরে উপনীত হলেন। সকাল তখন সাড়ে-ন'টা। ২৬শে নভেম্বর জিব্রাল্টার, ২৭শে কোষ্ট-অব-পর্টুগাল ও ২৮শে বিস্কে-উপসাগর পার হ'য়ে তিনি ২৯শে নভেম্বর (১৯০৬) বৃহস্পতিবার প্লাইমাউথে উপস্থিত হলেন। বেলা তখন বারোটা। লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছুলেন ১লা ডিসেম্বর (১৯০৬) শনিবার।

॥ স্মৃতি ঃ ছাব্বিশ ॥

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনের শেষ তিন-চার বৎসর আমাদের কাছে এক মহামূল্য-স্বর্ণময়-স্মৃতিরূপে এখনও জাগ্রত আছে। শ্রদ্ধেয় মহারাজ তখন দার্জিলিঙ-রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রমে। খবর এলো কলকাতার মঠে তিনি আস্‌ছেন। ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৬) রওনা হলেন তিনি দার্জিলিঙ থেকে কলকাতা অভিমুখে। দার্জিলিঙ-আশ্রমকে দেবোত্তর করার কাজ শেষ হয়েছে তার পূর্বেই। তাঁরই দীক্ষিত কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-শিষ্যদের ট্রাষ্টী ক'রে আশ্রম উৎসর্গ করেছিলেন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) নামে।[১] সে'দিনের কথাই এখানে কিছু বল্‌বো।

ইংরেজী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর (২৬শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪৩ সাল)। ঐদিন দার্জিলিঙ রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রমের ট্রাষ্টডিড্-রেজেষ্টারী করার জন্য স্বামীজী মহারাজ কৃতসংকল্প হয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ দেখা দিল এক দৈব-দুর্বিপাক। রাত্র থেকেই আরম্ভ হ'ল বৃষ্টির অবিরল ঝরঝর-জলধারা। তার পরের দিনও বৃষ্টির বিরাম নেই। গাছপালা, রাস্তা-ঘাট, পাহাড়-পর্বত সমস্তই অন্ধকারে ঢাকা! বরফসিক্ত দম্‌কা-ঠাণ্ডা-বাতাস বইছিল চারদিকে এলোমেলোভাবে। ঘরের বাইরে প্রবল বাতাস ও ঝড়। ঝড় ও বৃষ্টির ঘনঘটায় স্বামীজী মহারাজ কিছুটা চিন্তিত হলেন। তিনি অফিস-ঘরের চেয়ারে গিয়ে ব'সে সেবককে বল্লেন একজন ব্রহ্মচারীকে ডাক্‌তে। ব্রহ্মচারিজী[২] এলে স্বামীজী মহারাজ তাঁকে বল্লেন ঃ 'দেখ্‌লে তো শ্রীশ্রীঠাকুরের কি খেলা! কিন্তু ডিড্ রেজিষ্টারী করতেই হবে আজ যেমন করেই হোক্। তুমি শচীনবাবুকে[৩] গিয়ে বলো আমার কথা, তিনি ডিডের হবেন একজন সাক্ষী। বৃষ্টির মধ্যেই রওনা হলেন ব্রহ্মচারিজী স্বামীজী মহারাজের আদেশ শিরোধার্য ক'রে। কিন্তু শচীনবাবু ছিলেন অসুস্থ, তাই তাঁর অপারগতার কথা জানালেন তিনি ফিরে

১। 'The said messuage lands, hereditaments and premises hereby granted shall be known as the Debutter property of Thakur Bhagawan Sree Sree Ramakrishna Paramahansa Dev.'

২। ব্রহ্মচারী উমানন্দ (পরে স্বামী ভবেশানন্দ)।

৩। তদানীন্তন আশ্রমের সম্পাদক ছিলেন রায়বাহাদুর শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্যাল।

এসে স্বামীজী মহারাজকে। স্বামীজী মহারাজের শরীরও সে'দিন ছিল সামান্য অসুস্থ। ব্রহ্মচারিজী অনুরোধ জানালেন তাই ডিড্-রেজেষ্টারী করার কাজ সেই দিন স্থগিত রাখার জন্য। রেজেষ্ট্রী-অফিসও ছিল আশ্রম থেকে অনেকটা দূরে। দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ঘরের বাইরে যাওয়া ছিল একান্ত কঠিন। স্বামীজী মহারাজের সংকল্প কিন্তু অচল ও অটল। প্রসন্ন-গম্ভীর মুখে ধীরকণ্ঠে তিনি বল্লেন ঃ 'তাও কি কখনো হয়? তুমিই হবে ডিডের সাক্ষী। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে চলো প্রস্তুত হই। রিক্সা একটা ডাকো এখুনি বিলম্ব না ক'রে।'

আকাশ ভেঙে বৃষ্টির ধারা। চারদিকে ছুটে চলেছে জলের খরস্রোত। পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আস্‌ছে অসংখ্য ছোট-বড়-ঝর্ণা। উদ্দাম নৃত্যও শুরু হয়েছে তাদের কলকল-শব্দে। জলস্রোতে ভেসে চলেছে চতুর্দিকের ওঠা-নামা-পাহাড়ী-পথগুলো। স্বামীজী মহারাজকে দেখাচ্ছিল কিন্তু বেশ প্রফুল্ল! নিরুৎসাহ বা নিরাশার এতটুকু মাত্র ছিল না চিহ্ন তাঁর মুখে। ইতিমধ্যে তাঁর সেবক এনে দিলেন এককাপ কফি। কফি খাওয়া শেষ ক'রে তামাক খেলেন তিনি নিশ্চিন্ত মনে। ইত্যবসরে ব্রহ্মচারিজী খবর দিলেন,—'রিক্সা এসেছে, আসুন তাহলে মহারাজ।' স্বামীজী মহারাজ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন ঃ 'কি বলো?—শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাই হোক তাহলে পূর্ণ!'

রিক্সাওয়ালা অপেক্ষা করছিল আশ্রমের নীচে ডিস্পেন্সারীর সাম্‌নে। দার্জিলিঙের রিক্সাওয়ালারা বেশীর ভাগ হয় ভুটিয়া। তিনজন ক'রে লোক থাকে এক-একটি রিক্সার সঙ্গে—রিক্সার সাম্‌নের দিকে থাকে একজন, আর পিছনের দিক থেকে রিক্সাখানাকে ঠেলে চলে দু'জন। সুদৃঢ় সুপুষ্ট তাদের শরীর। নির্ভীক প্রফুল্ল তাদের মন। আশ্রমের নীচের ডিস্‌পেন্সারি তখনও ছিল একতালা-কাঠের ঘরে। নীচে উঁচু-নীচু রাস্তার একদিক গেছে ভিক্টোরিয়া-ফল্‌সের (Victoria Falls) পাশ দিয়ে বর্দ্ধমান-রাজবাড়ীর দিকে, আর অন্যদিক গেছে এঁকেবেঁকে গভর্ণমেন্ট-হাইস্কুল ও স্যানিটোরিয়মের পাশ দিয়ে বাজারের দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দু'হাত তুলে প্রণাম ক'রে স্বামীজী মহারাজ নিলেন টাইপ-করা ডিড্‌খানি হাতে। পোষাকের উপর চাপা দিলেন একটা রেণকোট (rain-coat)। মাথায় পর্‌লেন গেরুয়া-পাগ্‌ড়ি! নীচেকার রাস্তা দিয়ে তিনি মন্দিরের দিকে নাম্‌তে লাগ্‌লেন ধীরে ধীরে। পিছল হয়েছিল সারাটা উৎরাইয়ের পথ। অবিশ্রান্ত ধারায় জলস্রোতও ছুটে চলেছে পথের আশপাশ দিয়ে। বিদ্যুতের রেখা আঁকাবাঁকাভাবে জ্বলে উঠ্‌ছে মাঝে মাঝে আকাশের বুকে কালো-মেঘের গায়ে। লাঠিহাতে নাম্‌তে লাগ্‌লেন স্বামীজী মহারাজ

নিঃশব্দে নীচের দিকে। পিছনে মাথায় ছাতি ধ'রে চলেছেন ব্রহ্মচারী মহারাজ। হাসিমাখা প্রসন্ন মুখে ধীরে ধীরে গেলেন স্বামীজী মহারাজ প্রথমে মন্দিরের ভিতর। করজোড়ে অর্ধনিমীলিত নেত্রে দাঁড়ালেন গর্ভমন্দিরের দরজার সাম্‌নে। অপূর্ব এক ভাবে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে তাঁর মুখমণ্ডল। দু'চক্ষু দিয়ে গড়িয়ে পড়্‌লো মুক্তার মতো দু'এক ফোঁটা জল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্যাণ-ইঙ্গিতই তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যেন। দু'হাত তুলে আবার প্রণাম জানালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। ধীরেধীরে এলেন বাইরে। নীচে গেটের কাছেই ছিল দাঁড়িয়ে রিক্সা। স্বামীজী মহারাজ ও ব্রহ্মচারিজী ধীরে ধীরে বস্‌লেন তাতে উঠে। প্রবল বারিপাতের দিকে কারুরই ছিল না এতটুকু ভ্রুক্ষেপ। রিক্সা হাজির হ'ল ক্রমে রেজেষ্টারী-আফিসের সাম্‌নে। বৃষ্টির বেগ তখন কিছুটা কমেছে। বাতাসের গতিও হয়েছে কিছুটা মন্থর। আকাশের অন্ধকার সূর্যের অস্পষ্ট আলোকে হয়েছে কিছুটা স্পষ্ট।

রেজেষ্টারী কর্‌তে খরচ হয়েছিল মোট ১০৫ টাকা, কিন্তু ব্রহ্মচারিজীর কাছে ছিল মাত্র ১০০ টাকা। স্বামীজী মহারাজ বার করলেন তাঁর মনিব্যাগটি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাঁচ টাকামাত্রই ছিল তাঁর মনিব্যাগে। ঈষৎ হেসে তিনি পাঁচ টাকা দিলেন ব্রহ্মচারিজীর হাতে।[৪] প্রায় সম্পন্ন হ'ল রেজেষ্টারী করার কাজ। স্বামীজী মহারাজ দস্তখৎ কর্‌লেন ডিডের উৎসর্গ-শিরোনামায়। যেন অশ্রুসিক্ত তাঁর চক্ষু! কণ্টকিত ও পুলকিত তাঁর সর্বশরীর! শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে ন্যস্ত হ'ল সে'দিন থেকে দার্জিলিঙ-রামকৃষ্ণ-আশ্রমের সকল-কিছু ভার ও দায়িত্ব। বহুদিনের বাঞ্ছিত আশা হ'ল তাঁর সে'দিন পূর্ণ! স্বাক্ষরকারীদের শিরোনামায় ব্রহ্মচারিজী (ব্রহ্মচারী উমানন্দ) কর্‌লেন নিজের নাম দস্তখৎ। সাব্‌জজ ও রেজিষ্ট্রার ছিলেন মাননীয় বি. সি. সেন। তুলারাম প্রধান ও রায়সাহেব ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় (উকিল) ছিলেন স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম। পরিশেষে সম্পূর্ণ হ'ল রেজেষ্টারী করার সকল কাজ। স্বামীজী মহারাজ প্রফুল্ল মনে এসে দাঁড়ালেন রেজেষ্টারী-অফিসের বাইরে।

প্রকৃতির দুর্যোগ তখন আর বিন্দুমাত্রও ছিল না। সূর্যের উজ্জ্বল আলোকে

৪। স্বামীজী মহারাজের ডায়েরীতে লেখা ছিলঃ 'Pouring in torrents day and night. I went in a Riskshaw to the Kanchari, and had the Trust-Deed of the Ashrama registered before the court of B. C. Sen, at 11 A. M. It cost Rs. 105/-. Had dry for food at noon. Gave a feast to the immates of the Ashrama in eve, with লুচি, আলুর-দম and সুজির পায়স। Paid for fees Rs. 5/-.'

ফুটে উঠেছে ধরণীর হাসি। গাছের মাথায় ও পাতায় পাতায় বৃষ্টির জল জমে যেন মুক্তার জাল বুনেছে চারিদিকে। তাতে চিক্‌চিক্‌-ঝিক্‌মিক্‌ করছে সূর্যের আলোক। স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল-প্রকৃতি নূতন প্রাণ পেয়ে হয়েছে তখন অভিনবভাবে উজ্জ্বল। স্বামীজী মহারাজ ব্রহ্মচারিজীর দিকে ফিরে হেসে বল্লেন ঃ 'দেখেছ, ক্যামন রোদ উঠেছে?' ব্রহ্মচারিজীও সায় দেন, কিন্তু ঠিক মর্মোপলব্ধি করতে পারলেন না তিনি স্বামীজী মহারাজের কথার। পরে স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'আমার উপর দিয়ে হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের এও একটা খেলা ও পরীক্ষা। তাঁর কল্যাণময়ী ইচ্ছাই হ'ল আজ পূর্ণ। ব্রহ্মচারিজী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন ঃ 'শ্রীশ্রীঠাকুর এখনও কি আপনাদের পরীক্ষা করেন মহারাজ?' স্বামীজী মহারাজ একটু গম্ভীরভাবে বল্লেন ঃ 'করেন বৈকি!'

ব্রহ্মচারিজী একটি রিক্সা ডাক্‌লেন আশ্রমে ফেরার জন্য। স্বামীজী মহারাজ ও তিনি রিক্সা ক'রে ফিরে চল্লেন আশ্রমের দিকে। ক্রমে রিক্সাখানি এসে থাম্‌লো আশ্রমের ডিস্‌পেন্সারীর কাছে। বেলা তখন বারোটা। রিক্সা থেকে নেমে স্বামীজী মহারাজ চল্লেন মন্দিরের দিকে। ধীর পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়ালেন মন্দিরের ফটকের সাম্‌নে। আনন্দোজ্জ্বল প্রসন্নগম্ভীর তাঁর মূর্তি! জোড়হাতে প্রণাম জানা্‌লেন তাঁর বিশ্ববরেণ্য আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে! তারপর ধীরেধীরে উঠে গেলেন উপরে নিজের ঘরের দিকে।

একটি কথা উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না এ'প্রসঙ্গে! সেটি হ'ল আমাদের স্মৃতির সম্বল ও চিরদিনের সহায় ও সান্ত্বনার সামগ্রী একটি পত্রের কথা। দার্জিলিঙ-আশ্রমের দেবোত্তর-ডিড রেজিষ্টারী করার কাজ সমাপ্ত হ'ল যে'দিন, ঠিক তার দু'দিন পরে কলকাতা-বেদান্ত মঠে পেলাম স্বামীজী মহারাজের একখানি পত্র (envelope) ও সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ টাকার একটি মনিঅর্ডার। পত্রখানি পেয়ে হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করা কঠিন হয়েছিল আমাদের পক্ষে! এটি হ'ল আনন্দোজ্জ্বল ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অতীতের কথা, কিন্তু স্মৃতির দর্পণে উজ্জল হ'য়ে আছে এখনো সেই ঘটনা! কত আনন্দ ও কত আবেগ নিয়ে পড়েছি ও বারবার পড়ে শুনিয়েছি সেই পত্রখানি কলকাতা বেদান্ত মঠের সকলকে! পত্রখানির মর্ম হ'ল—

'স্নেহের প্র—

'এতদিনে আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করলেন করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর। আজ থেকে সকল-কিছুই সমর্পিত হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে। শ্রীশ্রীঠাকুরই হলেন আজ থেকে দার্জিলিঙ বেদান্ত-আশ্রমের মালিক, আর আমরা তাঁর আজ্ঞাবহ দাস। তিনিই চালক, আমরা তাঁর ভৃত্য। তাঁর হাতে সকল-কিছু সঁপে

দিয়ে আজ ঠিকঠিক ফকির হ'তে পেরেছি। তাঁর কাজ তিনিই এখন থেকে দেখ্‌বেন, আমার দায়িত্ব হয়েছে শেষ। বাকি রইলো কলিকাতার (আশ্রমের) রেজেষ্টারী করার কাজ। তারপরই ছুটি! তোমরা কলিকাতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষপূজো দিয়ে আনন্দ ক'রে সকলে প্রসাদ পাবে। ২৫ (পঁচিশ টাকা) পাঠালাম মনিঅর্ডার ক'রে। প্রাপ্তিসংবাদ জানিয়ে সুখী কর্‌বে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

অভেদানন্দ'

পত্রখানিতে তারিখ লেখা ছিল ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৬), অর্থাৎ যে'দিন দেবোত্তর-ডিড্‌ রেজেষ্টারী করা হয়েছিল সেইদিন রাত্রেই তিনি লিখেছিলেন পত্রখানি দার্জিলিঙ আশ্রম থেকে। আমরা তখন ছিলাম কলকাতার মঠে, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে। পত্র ও মনিঅর্ডার একইসঙ্গে পেলাম ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় ১০টার সময়ে। পরের দিনই (১৫ই সেপ্টেম্বর) আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষপূজা ও ভোগ দিলাম এবং পূজার শেষে প্রসাদ পেলাম আনন্দোজ্জ্বল হৃদয় নিয়ে। অতীতের সেই স্মৃতি, কিন্তু এখনও চিরজাগ্রত আছে আমাদের মনে!

।। স্মৃতি ঃ সাতাশ।।

ইংরাজী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর স্বামীজী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) তিব্বত থেকে ফিরে আসেন বেলুড় মঠে। সে'দিন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণসংঘজননী শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি-উৎসব। অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয়েছিল বেলুড় মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। আনন্দানুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়েছিল যথেষ্ট। ইংরাজী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ থেকে তিনি কলকাতায় আসেন কর্মকোলাহলময় মহানগরীতে তাঁর নূতন কর্মপীঠ ও প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ঐ সময়ে মেছুয়াবাজারে একটি ভাড়াটে-বাড়ীতে তিনি ওঠেন ও 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি' *(Ramakrishna Vedanta Society)* প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে। বেদান্তের উদারনৈতিক ভিত্তির উপর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শ প্রচার করার পক্ষপাতী ছিলেন। জীবনে অপক্ষপাত-দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও বিচারপ্রণালীকে তিনি অন্তরের সংগে ভালবাসতেন চিরদিন। অদ্বৈতবেদান্তের ক্ষুরধার-তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি তাঁর মধ্যে প্রোজ্জ্বল থাক্‌লেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের একনিষ্ঠা ও একান্ত অনুরাগ, দ্বৈতবাদের প্রপত্তি বা শরণাগতি, শাক্তাদ্বৈতবাদের শক্তিতে চিন্ময়ীদৃষ্টি তাঁর প্রশস্ত ও উদার মনে সর্বদাই জাগরূক ছিল। তাই শাঙ্কর-বেদান্তের ব্রহ্মাদ্বৈতবাদকে চরমসত্য ব'লে গ্রহণ করলেও বেদান্তের সকল অভিমতকে এক পরমসত্যেরই ভিন্নভিন্ন দিক ও রূপায়ণ ব'লে তিনি সমাদর করতেন। আর এখানেই দেখি তাঁর মধ্যে এক অপরূপ অভিনব বৈশিষ্ট্য। কিছু-না-কিছু সত্য সকল মতবাদের মধ্যেই আছে এ'কথা তিনি বল্‌তেন। যে যেমনভাবে পরমসত্যকে দেখেছে ও উপলব্ধি করেছে, সে তেম্‌নিভাবে তার পরিচয় দিয়েছে, বলার ভঙ্গী ও বর্ণনাতেই কেবল পার্থক্য, চলার পথেই শুধু ভিন্নতা, লক্ষ্য কিন্তু সকলের এক ও সমান,—তাঁর বরেণ্য আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এই মতবাদেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবেদান্তের মতবাদকেই গ্রহণ করেছিলেন অবশ্য পরমশ্রদ্ধার ভাব নিয়ে। তাঁর সোসাইটী বা সমিতির, আশ্রম ও মঠের পিছনে তাই বেদান্তের নামকে তিনি যুক্ত করেছিলেন যুক্তি-বিচারের মাপকাঠি দিয়ে। অচলায়তনের তিনি পূজারী ছিলেন না কোনদিনই! যুক্তিসঙ্গত ও বিচারসম্মত যা' সেটাই ছিল তাঁর ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মপ্রচারের আশ্রয় ও আদর্শ। তাঁর 'বেদান্ত-মঠ', 'বেদান্ত-আশ্রম' ও 'বেদান্ত-সোসাইটি'-র পিছনে এই মহান্

সত্যই ছিল চিরদিন বিধৃত।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ইচ্ছাই ছিল কলকাতায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ও সেই মঠের সংলগ্ন থাক্‌বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির। সে'জন্য তিনি ক্রয় করলেন উত্তর-কলকাতার একটি জমি। তিনি বলতেন ঃ 'বিশেষ ক'রে উত্তর কলকাতাই হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাভূমি, কেননা সিমলা, শ্যামপুকুর, বাগবাজার এই সকল স্থানে তাঁর যাতায়াত ছিল অধিক ও অবাধ! শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র পদধূলিতে উত্তর-কলকাতার পথ-ঘাট আজও তাই পবিত্র ও স্মৃতিদৃপ্ত।'

দেখা যায়, কলকাতায় একটি শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করাই ছিল যেন তাঁর শেষজীবনের সর্বশেষ কামনা। এ'সম্বন্ধে চিঠিপত্রও তিনি লিখেছিলেন অনেককে মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে। ১৯, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের স্থানটি (জমি) শোভাবাজারের কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে ১৮,৫০০ টাকায় ক্রয় করা হয়। জমি খরিদ করা হ'ল প্রথমে তখনকার বেদান্ত-সোসাইটীর সম্পাদক স্বর্গীয় ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে। পরে স্বামী অভেদানন্দের নামে ঐ স্থানের সত্ত্ব হস্তান্তরিত করা হয়। স্বামীজী মহারাজ সোসাইটীর স্থানটি পুনরায় ইংরেজী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী (৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৫) মঙ্গলবার দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে উৎসর্গ করেন। ঠিক তখনই প্রতিষ্ঠিত হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্তমঠ।[১] রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটী-র সকল সম্পত্তি বেদান্ত-মঠের নামে তখনই উৎসর্গ করা হ'ল, কিন্তু তার অস্তিত্বকে বজায় রাখ্‌লেন তিনি মঠেরই অবিচ্ছেদ্য কর্মকেন্দ্ররূপে। ভাবপ্রচার, জনহিতকর কর্ম ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানরূপেই সোসাইটীর শরীর থাক্‌লো মঠের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হ'য়ে। তাহলেও বেদান্ত-মঠের প্রসারতার পথকে তিনি বিন্দুমাত্র খর্ব ও সংকীর্ণ করলেন না! মঠের পক্ষে স্বাধীনভাবে ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণকর সকল-কিছু কর্মের অনুষ্ঠান করার ক্ষমতাকে তিনি অব্যাহতই রাখ্‌লেন সম্পূর্ণভাবে।[২] মঠ ও সোসাইটী যেন একই মায়ের

১। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের ট্রাষ্ট-ডিডে আছে ঃ 'That the said Devatra or Debutter Estate shall be designated, called and known as 'The Ramakrishna Vedanta Math'.

২। ট্রাষ্ট-ডিডে উল্লিখিত আছে ঃ "(e) To supplement what is wanting in the present system of general education particularly by imparting spiritual, ethical, cultural, vocational, artistic and physical training.

দু'টি সন্তান পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও মিলন-মৈত্রী-ভাবের বিনিময় দিয়ে বিস্তৃতির পথে অগ্রসর হওয়ার অধিকার পেল। তবে অধ্যাত্মভাবধারার ও ধর্মপ্রচারের কেন্দ্ররূপে মনোনীত থাক্‌লো একমাত্র মঠই। কর্মের সকল রকম দায়দায়িত্বশীল অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌লেও অধ্যাত্ম-প্রেরণা ও বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠানের একমাত্র তীর্থপীঠরূপে থাক্‌লো শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠ।[৩]

"(g) To carry on educational work amongst the people in general and specially amongst the masses.

"(h) To work for the removal of untouchability and other social prejudices and to cultivate brotherly feelings amongst all.

"(i) To help the sick, the needy and the distressed.

"(j) To impart, promote and cultivate the study of comparative philosophy, history, literature, arts, sciences, industries, agriculture and other subjects like health, hygiene, social service and the like.

"(k) To establish, organise, maintain, carry on, amalgamate and assist Colleges, Schools, Libraries, Free Reading Rooms, Classes, Lectures, Laboratories, Workshops, Orphanages, Homes for men and women and students, Hospitals, Dispensaries, Public Health Institutions, Homes for the aged, the infirm, the invalid and the afflicted, Relief Work, and other Educational, Charitable, Philanthropic, Religious and Industrial activities, and Institutions of like nature".

৩। মঠের 'ট্রাষ্ট-ডিড্' (Trust-Deed) থেকে মঠের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মপ্রণালীর নির্দেশগুলি উল্লিখিত আছে ঃ

"(c) To impart, promote and spread the study of all the phases of Vedanta philosophy, and its principles and ritual as propounded by Thakur Bhagawan Sree Sree Ramakrishna Dev and particularly illustrated by His own Life.

* * * *

"(f) To spread the idea of that universal religion which underlies the various sects and creeds....in their spiritual, moral, intellectual, cultural and physical needs.

* * * *

"(o) To provide for the imparting of spiritual training to disciples, Brahmacharis, Sannyasis and others." — প্রভৃতি।

১৯, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে মঠের (প্রথমে সোসাইটীর) জমি ক্রয় করার বহু পরে ইংরাজী ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন কলকাতায়। সে'দিন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ-জন্মোৎসব। এর ঠিক দু'বছর পরে ইংরাজী ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ, নূতন মন্দির হ'ল নির্মিত। মন্দির-প্রতিষ্ঠার স্মরণীয় দিনের কথা আমরা জীবনে কোনদিন ভুল্‌তে পারবো না, সেই পুণ্য-পবিত্র স্বর্ণস্মৃতি এখনো আমাদের প্রোজ্জ্বল হ'য়ে আছে ও চিরদিন থাক্‌বে।

ইংরাজী ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ (৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩) স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অন্তরের বাসনা হ'ল পূর্ণ। সে'দিন ছিল রবিবার, সুতরাং সমস্ত আফিসের ছিল ছুটি। অজস্র লোকের সমাগম হ'তে লাগ্‌লো প্রাতঃকাল থেকেই। স্বামীজী মহারাজের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত ও আনন্দসমুজ্জ্বল! আশা-আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাস যেন সে'দিন তাঁর অন্তরে মুখর হ'য়ে উঠেছিল। মন্দির-প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে পূজার আয়োজন চলেছে আড়ম্বরসহকারে। পূজক ও তন্ত্রধারক আমাদের মঠের সন্ন্যাসীদের ভিতর থেকেই স্বামীজী মহারাজ নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তার পূর্বের দিন রাত্রে পূজকের হ'ল ১০৫° জ্বর ও সেই জ্বর থাক্‌লো পরের দিন-পর্যন্ত। স্বামীজী মহারাজের কাছে প্রস্তাব করা হ'ল বাইরে থেকে একজন সন্ন্যাসী-পূজক ঠিক করার জন্য। তাঁর কিন্তু অভিমত ছিল মঠের যাবতীয় পূজা কর্‌বে মঠেরই সাধু ও ব্রহ্মচারীরাই। তাই সে'দিনও উত্তর দিলেন স্বামীজী মহারাজ একই রকমভাবে। তিনি বল্লেন ঃ 'পূজা যেমনতরই হোক না কেন, তোমরা নিজেরাই কর্‌বে পূজা। সুতরাং পূর্বনির্দিষ্ট নির্বাচনের পরিবর্তন ক'রে ঠিক হ'ল পূজক যিনি,—তিনি হবেন তন্ত্রধারক, আর তন্ত্রধারক হবেন—পূজক। অবশ্য পূর্বের দিন থেকে যতরাজ্যের বই ও খাতাপত্তর নিয়ে পূজক ও তন্ত্রধারকের মধ্যে পূজার বিরাট মহড়া শুরু হ'য়ে গিছ্‌লো, কাজেই নির্বাচনরীতির অদলবদল হলেও পূজাসম্বন্ধে ক্রটির ও আশঙ্কার কোনরকম কারণই ছিল না।

সকাল ৭॥০ টায় স্বামীজী মহারাজ নাটমন্দির ও মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন, আর স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করবেন উত্তরপাড়ার জমিদার মাননীয় সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্রটি অঙ্কন ক'রে বেদান্ত মঠকে উপহার দিয়েছিলেন কলকাতারই জনৈক শিল্পী সুনীলমাধব সেনগুপ্ত। দ্বারোদ্ঘাটন শেষ হ'লে তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা হবে আরম্ভ। পূজার উপকরণ, পুষ্প-মাল্যাদি রাখা হয়েছিল যেখানে যেমনটিভাবে ছিল মঠের ঠাকুর-ঘরে। ঠিক ৭॥০ টায় স্বামীজী

মহারাজ নেমে এলেন দোতলা থেকে। সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এসে পৌঁছলেন এরই ভিতর। মন্দিরের দ্বারের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন স্বামীজী মহারাজ। গলায় বেলফুলের মালা ও কপালে শ্বেতচন্দনের টীকা পরিয়ে দিল পূজক। সঙ্গে-সঙ্গে একই সঙ্গে অসংখ্য শঙ্খ বেজে উঠ্‌লো চারিদিকে। চারিদিক থেকে উচ্চারিত হ'ল সহস্র মুখে 'ওয়া গুরুজীকী ফতে'। স্বামীজী মহারাজও মেলালেন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি সেই জয়ধ্বনির সঙ্গে। উদ্‌ঘাটিত হ'ল আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের দ্বার। স্বামীজী মহারাজ ফিরে দাঁড়ালেন নাটমন্দিরের দিকে। প্রসন্নোজ্জ্বল ও ভাবগম্ভীর তাঁর মুখ। আবার উচ্চারিত হ'ল অগণিত কণ্ঠে 'ওয়া গুরুজীকী ফতে'! ধূপ-ধূনার গন্ধে চারিদিক হলো আমোদিত। তারপর উদ্‌ঘাটিত হলো নাটমন্দিরের নবনির্মিত দ্বার। অসংখ্য নরনারীর সঙ্গে মাননীয় সনৎবাবু ও স্বামীজী মহারাজ ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন নাটমন্দিরে। সনৎ বাবুর গলায় গন্ধরাজ ফুলের মালা ও কপালে চন্দনের টীকা পরিয়ে দেওয়া হ'ল। স্বামীজী মহারাজ সনৎ বাবুকে স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করার জন্য অনুরোধ জানালেন। মাননীয় সনৎবাবু এগিয়ে গেলেন তৈলচিত্রের দিকে ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে আবরণ উন্মোচন করলেন তৈলচিত্রের। তৈলচিত্রের উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী ও সকলের কণ্ঠে আবার উচ্চারিত হ'ল পুলক ও শিহরণের মাঝে 'ওয়া গুরুজীকী ফতে'। নাটমন্দিরের মাঝখানে পাশের দিকে ছিল দু'খানি চেয়ার সাজানো। স্বামীজী মহারাজ বস্‌লেন একটিতে ও অপরটিতে মাননীয় সনৎ বাবু। ভক্তবৃন্দ ও সমাগত সকলে বস্‌লো তাঁদের দুজনের চারদিকে কেন্দ্র রচনা ক'রে। স্বামীজী মহারাজ শ্রদ্ধাবিজড়িত কণ্ঠে পাঠ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্র। উত্তর-কলকাতার বুকে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠার অতীত স্বপ্নের উল্লেখ ক'রে তিনি বল্লেন ঃ 'এতদিনে আমার অন্তরের কামনা হ'ল পূর্ণ, আর বাস্তবে পরিণত হ'ল ফ্র্যাঙ্ক-ডোরাকের সুখস্বপ্ন।' তারপর কিভাবে আত্মসমাহিতভাবে ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার ছবি এঁকেছিলেন সেই সম্বন্ধে কিছু বল্লেন তিনি সকলকে। ঘড়িতে বেজেছে তখন সকাল ন'টা।

বিরাট একটি শোভাযাত্রা বার হ'ল হেদুয়ায় জীবন্ত একটি মাছ জলে ছাড়ার জন্য। স্বামীজী মহারাজ সনৎ বাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন দু'তলার অফিস ঘরে। এ'দিকে পূজার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। পূজক ও তন্ত্রধারক[৪] পূজায় বসার জন্য প্রণাম ক'রে অনুমতি নেওয়ার জন্য গেলেন স্বামীজী মহারাজের কাছে। স্বামীজী মহারাজ ছিলেন তখন অত্যন্ত প্রফুল্ল ও হাসিখুসি মেজাজে। তিনি পূজক ও

৪। স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (সুধন্ব মহারাজ ও প্রজ্ঞা মহারাজ)।

তন্ত্রধারককে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন ঃ 'শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ ও প্রণাম ক'রে এবার পূজায় বসে পড়ো। অতিপবিত্র দিন আজ! বহুদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে পরিণত হ'তে চলেছে এতদিনে। সবই তাঁর ইচ্ছা, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।' তারপর আনন্দে গান করতে লাগলেন—

সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি করো মা,
লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী,
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেম্‌নি চলি॥

'বিশ্বের সকল কিছুই মহামায়ার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে! সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের লীলা তাঁরই ইঙ্গিতে হচ্ছে, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। জয় ঠাকুর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!' স্বামীজী মহারাজ ভাবে আত্মহারা! তখন যেন তিনি এ'জগতেরই মানুষ নন, শাশ্বত আনন্দলোকে সমাসীন! পূজক ও তন্ত্রধারক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে অগ্রসর হ'লে স্মিতহাস্যে তাঁদের উদ্দেশ্যে বল্লেন ঃ 'এসো তাহলে। আমায় দরকার হলে ডেকে পাঠিয়ো তখন। আমি তৈরী হয়েই বসে আছি।' তারা দু'জনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে নীচে নেমে এলো।

প্রবল-উদ্দীপনা ও আনন্দের রোল মঠের চতুর্দিকে। মন্দিরের ভিতর নানাদিকে নানান্ রকমের ফুল ও মালা দিয়ে অপূর্বভাবে সাজানো হয়েছে। ধূপ-ধূনার গন্ধে চারদিক আমোদিত। অপরূপ সেই দৃশ্য। পবিত্র ও অবর্ণনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তখন! ভক্তিভাববিহ্বল জনসমুদ্র মন্দিরের চারদিকে সমবেত হ'য়ে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছিল। সকলেই উন্মুখ ও অধীর—কখন্ স্বামীজী মহারাজ মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দান ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা সারদার প্রতিকৃতি বেদীতে প্রতিষ্ঠা করবেন। ইতিমধ্যে পূজক ও তন্ত্রধারক শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার পূর্বকৃত্য শেষ ক'রে প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠার আনুষঙ্গিক আয়োজনে ব্যস্ত। ঘড়িতে বেজেছে তখন দুটো (2 P. M.)। ক্রমশঃ সমস্তই প্রস্তুত। মন্দিরে আসার জন্য স্বামীজী মহারাজকে খবর দিতে গেলেন একজন সন্ন্যাসী।

মন্দির প্রতিষ্ঠার ঠিক একমাস পূর্বের একটি ঘটনার কথা আশ্চর্যজনক না হ'লেও বিশেষভাবে স্মৃতিদীপ্ত। এখন সে'কথারই কিছু উল্লেখ করি এখানে।

ঘটনাটি নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছে মন্দির-প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানের সঙ্গে। নতুন মন্দিরে নূতন সিংহাসনে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি হবে প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজী মহারাজ ফরমাস করেছিলেন একটি রূপার সিংহাসনের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বায়না দিলেন কিছু টাকা। কিন্তু ঘটনা ঘট্‌লো একটু বিচিত্র রকমের! তার পরের দিন সকালে— প্রায় সাড়ে-সাতটা কি আটটা হবে—স্বামীজী মহারাজ শশব্যস্তে ডেকে পাঠালেন আমাদের তাঁর শয়ন ঘরে। তিনি বল্লেন ঃ 'শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে রূপার সিংহাসন হয়। ধাতুনির্মিত কোন জিনিসই তিনি স্পর্শ করতে পারতেন না—তোমরা জানো। তিনি খেতেনও পাথরের বাসনে, সুতরাং এখুনি নিষেধ ক'রে পাঠাও রূপোর সিংহাসন যেন তৈরী আর না করে।' শুনে তো আমরা অবাক্। ভাব্‌লাম ব্যাপারটা কি! একদিন পূর্বে যে মানুষ প্রবল আগ্রহ নিয়ে রূপার সিংহাসনের জন্য ফরমাস দিলেন, আজ তাঁর আবার কত আগ্রহ তা নিষেধ করার জন্য। ঘটনাটি কিন্তু আজও-পর্যন্ত প্রশ্নরূপেই থেকে গেছে আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন মনের মধ্যে। তবে ভাব্‌লাম তখন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাই বোধহয় নয় যে রূপার সিংহাসন হয় নির্মিত এবং এ'রহস্যই জেনেছেন স্বামীজী মহারাজ তাঁর পরিশুদ্ধ-অন্তরে দিব্য-প্রেরণারই ভিতর দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের যাঁরা আদরের সন্তান, শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মকথা তাঁদের পক্ষে জানাই স্বাভাবিক, আমরা মাত্র বিস্ময়স্তব্ধ আজ্ঞাবাহী সেবক!

সুতরাং আমাদেরই একজন ভক্তবন্ধু[৫] তাড়াতাড়ি দৌড়ুলেন কারিগরকে নিষেধ করার জন্য। স্বামীজী মহারাজ তাঁর ইজিচেয়ারে আনমনাভাবে তখন বসে। আমাদেরই মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তাহ'লে উপায় কি মহারাজ!' তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন ঃ 'উপায় আর কি, যাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন।' আমরা আর কোন উত্তর না দিয়ে নেমে এলাম নীচেকার ঘরে ধীরে ধীরে।

বেলা তখন এগারটা—কি সাড়ে-এগারটা। ভক্তবন্ধু এলেন কারিগরের বাড়ী থেকে ফিরে, বল্লেন ঃ 'নিষেধও করেছি যেমন, উপায়ও হয়েছে তেমনি আর একটা।' আমরা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ঃ 'উপায়টা কি?' ভক্তবন্ধু বল্লেন ঃ 'আমার একজন বন্ধু আছেন মাদ্রাজে! তাছাড়া চন্দনকাঠে তৈরী নানান্ রকম কারুকার্য করা সিংহাসনও পাওয়া যায় মাদ্রাজে, তাঁকেই লিখে দেবো একটা

৫। স্নেহাস্পদ আশুতোষ ঘোষ,—তিনি তখন বেদান্ত মঠেই থাক্‌তেন, স্বামীজী মহারাজের টাইপকরা প্রভৃতি কার্যে সাহায্য কর্‌তেন।



রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর তৈলচিত্র
(প্রথমবার স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)



রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি। (দ্বিতীয়বারে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)

চিঠি সিংহাসন পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।' আমরা বল্লাম ঃ 'জানাও একথা স্বামীজী মহারাজকে।' স্বামীজী মহারাজ তখন অফিস-ঘর থেকে শোওয়ার ঘরে উঠে গেছেন। আমাদের ভক্তবন্ধু গিয়ে জানালেন সেই কথা। শুনে স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'চমৎকার কথা। এখুনি অর্ডার দাও তা'লে তোমার মাদ্রাজী-বন্ধুর[৬] কাছে। ঠিক কথাই বলেছ, চন্দনকাঠের সিংহাসনই হবে উত্তম।' বন্ধু কালবিলম্ব না ক'রে তখুনি লিখে পাঠালেন তাঁর মাদ্রাজী বন্ধুকে মাদ্রাজে। রেজিষ্টার্ড-চিঠি একখানিও পাঠিয়ে দিলেন ডাকে।

চিঠির উত্তর এলো সাত-আট দিন পরে। মাদ্রাজী বন্ধু লিখেছেন আনন্দের সঙ্গে যে, সিংহাসনের অর্ডার তিনি দিয়েছেন কারিগরকে, তৈরি হ'লেই পাঠাবেন রেলওয়ে-পার্শ্বেল ক'রে। কিন্তু ঘটনার একটু বিপর্যয় হ'ল নানান্ কারণে। মাদ্রাজ থেকে চন্দনকাঠের সিংহাসন আস্তে হ'ল একটু বিলম্ব। এদিকে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনও সমাগত। স্বামীজী মহারাজ বেশ একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়্লেন। সাময়িকভাবে তিনি অর্ডার দিলেন সেগুনকাঠের একটি সিংহাসন। সুতরাং ১০ই মার্চ (১৯৩৭ খ্রীঃ) বা ৩০শে ফাল্গুন (১৩৪৩ সাল) সেই সেগুনকাঠের সিংহাসনেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি হ'ল প্রতিষ্ঠিত।

লতাপাতার কাজ-করা চন্দনকাঠের সিংহাসনটি মাদ্রাজ থেকে এসে পৌঁছুলো ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭ খ্রীঃ) মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন থেকে পাঁচ মাস পরে। চন্দনকাঠের সিংহাসনের চন্দনের গন্ধে চারদিক হ'ল ভরপুর। স্বামীজী মহারাজ দেখে অত্যন্ত খুসী হ'য়ে বল্লেন ঃ 'তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি'। যাঁর কাজ তিনিই করান, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।' পরে স্বামীজীরই দীক্ষিত শিল্পী বিনয়বাবুকে[৭] দিয়ে সিংহাসনের মাথার উপর খোদাই ক'রে রঙ-করা হ'ল মঠের একটি প্রতীক অতি-সুন্দরভাবে। ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭ খ্রীঃ) বা ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার ছিল স্বামী অভেদানন্দজীরই জন্মতিথি-উৎসব। ঐ দিনই সেগুনকাঠে তৈরী সিংহাসনটি পরিবর্তন ক'রে চন্দনকাঠের সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের আর-একটি প্রতিকৃতি। নূতন প্রতিকৃতিতে (ছবিতে) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন স্বামীজী মহারাজ নিজে। সে'দিনও ছিল আবার ভীষণ দুর্যোগ।

যাইহোক পূর্বপ্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক ১৪ই মার্চ (১৯৩৭) পবিত্র

৬। এই বন্ধুটি শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত একজন প্রবীণ মাদ্রাজী-ভক্ত, নাম পি. এস. আদিমূলম্।

৭। বিনয়কুমার সেনগুপ্ত, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে। মন্দিরের বেদীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বামীজী মহারাজকে খবর দেওয়া হয়েছে তা' পূর্বেই বলেছি। তিনি পূর্ব থেকে ছিলেন প্রস্তুত হ'য়ে বসে, সুতরাং ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তিনি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পরণে নূতন রঙ-করা সিল্কের-গেরুয়া কাপড়, গায়ে পাতলা একটি গেঞ্জী ও তার উপর জড়ানো সিল্কের গেরুয়া-চাদর, মাথায় টুপি ও পায়ে চটিজুতা। উদাস অথচ গম্ভীর ও আলুথালু তাঁর ভাব, কোনদিকেই ছিল না দৃষ্টি, মুখ প্রসন্ন অথচ প্রদীপ্ত। ধূপ, ধূনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে মন্দির সমাচ্ছন্ন ও আমোদিত। আমরা সকলেই স্বামীজী মহারাজের আগমন-প্রতীক্ষায় স্থিরভাবে এতক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। তিনি মন্দিরের সাম্‌নে এসে দাঁড়াতেই সকলে সমবেত কণ্ঠে 'ওয়া গুরুজীকী ফতে' ও 'জয় রামকৃষ্ণ'-শব্দ ক'রে উঠ্‌লেন। স্বামীজী মহারাজের জন্য নির্দিষ্ট একটি আসন পূর্ব থেকেই বেদীর সাম্‌নে পাতা ছিল। তিনি ধীর-মন্থর-গতিতে আসনে গিয়ে বস্‌লেন। মন্দিরের ভিতরের ও বাইরের পরিবেশ নীরব ও নিথর। স্বামীজী মহারাজ আসনে উপবেশন করেই ধ্যানস্থ হলেন—স্থির ধীর নিষ্কম্প। অগণিত লোকের মুখর-কোলাহল পূর্ব থেকেই স্তব্ধ হয়েছিল। ভাবগম্ভীর প্রকৃতি! সকলের নিঃশ্বাসের শব্দও যেন স্তব্ধ। অপূর্ব সেই দৃশ্য ও অপূর্ব এক দিব্যভাবের অপার্থিব পরিবেশ। যাঁরা সেই ঘটনা সে'দিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরাই বহন কর্‌বেন সেই পুণ্যস্মৃতি চিরদিনের জন্য!

আধ ঘণ্টা—কি তার আরো কিছু বেশীক্ষণ কেটে গেল ঠিক একই ভাবে। তারপর একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'তারপর!' তন্ত্রধারক বল্লেন ঃ 'এবার শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে হবে মহারাজ।' সেগুনকাঠের সিংহাসনের উপর নূতন ক'রে ভাল ফ্রেমে বাঁধানো শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি প্রতিকৃতি (ফটো) পূর্ব থেকেই বসানো ছিল। স্বামীজী মহারাজের ভাব তখন যেন 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। 'আচ্ছা' ব'লে তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন। চোখদু'টি অর্ধনিমীলিত। পূজক হাতে নিলেন সযত্নে সিল্কের কাপড়ে-মোড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি। স্বামীজী মহারাজ 'জয় রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ ক'রে সিংহাসনটি একবার মাথায় স্পর্শ করালেন। সম্মুখে পূজক ও তাঁর পিছনে স্বামীজী মহারাজ পূজকের একটি কাঁধে এক হাত দিয়ে চল্‌তে লাগলেন। তাঁর পিছনে তন্ত্রধারক স্বামীজী মহারাজের মাথায় ছাতা ধরে। সকলের পিছনে সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ। শঙ্খ ও ঘণ্টার ধ্বনিতে সারা মঠ মুখরিত। তিনবার প্রদক্ষিণ করার পর স্বামীজী মহারাজ মন্দিরের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। পূজক সিংহাসনটি

নিয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। স্বামীজী মহারাজ মন্দিরে প্রবেশ করলে তন্ত্রধারক[৮] শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিটি তাঁর হাতে দিয়ে বল্লেন ঃ 'এবার বেদীর উপর সিংহাসন স্থাপন (প্রতিষ্ঠা) করুন মহারাজ!' তন্ত্রধারক বই দেখে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়্‌তে লাগ্‌লেন। স্বামীজী মহারাজ উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বেদীর উপর সিংহাসনটি স্থাপন ক'রে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লেন ঃ 'ঠাকুর, যাবচ্চন্দ্রদিবাকর,—যতদিন চন্দ্র-সূর্য আকাশে কিরণ দেবে, ততদিন তুমি এখানে (এই মঠে) থাক্‌বে।[৯] অনন্তকাল তুমি এই মঠে বিরাজ করো।' তাঁর দু'টি হাত ধীরে ধীরে কাঁপ্‌তে লাগলো। চক্ষু জলে ভারাক্রান্ত! অপরূপ সেই দৃশ্য! তিনি নতজানু হ'য়ে আসনে ব'সে করজোড়ে আবার বল্লেন ঃ 'ঠাকুর সবই তোমার ইচ্ছা। এতদিনে আমার ইচ্ছাও পূর্ণ হ'ল।' ক্রমশঃ চক্ষু হ'ল আরও জলভারাক্রান্ত। তিনি বাষ্পগদগদ কণ্ঠে আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন ঃ 'শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে বহুকাল থাক্‌বেন!—যাবচ্চন্দ্রদিবাকর যতদিন চন্দ্র সূর্য থাক্‌বে ততদিন তাঁর দিব্য-আবির্ভাব এই মঠে থাক্‌বে।' দিব্যপ্রশান্তির আলোকচ্ছটায় তাঁর মুখ তখন সমুজ্জ্বল। সাষ্টাঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে তিনি ভাবের আবেশে মন্দিরের বাহিরে এসে দাঁড়ালেন ও ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। তাঁর গম্ভীর, উদাস ও আনমনা ভাব দেখে কেউ আর তাঁকে প্রণাম কর্‌তে সাহস পেলেন না। আনন্দমুখর হ'য়ে উঠলো সকলের অন্তর!

ঠিক এরকমই হয়েছিল শুনেছি দার্জিলিঙ-রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা যে দিন হয়। ইংরাজী ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে শ্রীশ্যামাপূজার দিন দার্জিলিঙ-আশ্রমে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের ভাবধারা ও জীবনপ্রণালীই ছিল অদ্ভুত ও অভিনব রকমের! অবশ্য সাধারণ মানুষের কাছে তা' রহস্যময়।

যাহোক সারাদিন কাট্‌লো আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে। রাত্রি সাড়ে-আটটায় আমরা অনেকে গেলাম স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম কর্‌তে উপরে। দেখি—তিনি আনন্দময় পুরুষ! তিন চারজন ভক্তের সঙ্গে তখন কথোপকথন করছেন তিনি। আমরা গিয়ে প্রণাম করতেই আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে তিনি বল্লেন ঃ 'বুঝ্‌লে, আজ দেখ্‌লাম ঠিক বায়স্কোপের মতো সব জীবন্ত ছবি!

৮। পূর্বেই বলেছি যে, পূজক স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ ও তন্ত্রধারক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।
৯। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে।

এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও সঙ্গে তাঁদের স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রথমে। তারপর রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), যোগেন স্বামী (স্বামী যোগানন্দ) ও সকলে। অপূর্ব জ্যোতির্ময় তাঁদের শরীর। তারপর একে-একে হাসিমুখে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌লেন সকলে। সার্থক হয়েছে এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা। 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকর'—তাঁদের আবির্ভাব এই সমিতিতে[১০] (তখন 'মঠ' নামকরণ হয়নি) ও মন্দিরে থাক্‌বে। এখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শ সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হবে জান্‌বে। তাঁর অফুরন্ত আশীর্বাদ আমি সারা জীবনই পেয়েছি ও উপলব্ধি করেছি! তোমরা বিশ্বাস কর, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও তাঁর সন্তানদের কল্যাণময় দৃষ্টি ও আশীর্বাদ এই প্রতিষ্ঠানের উপর চিরদিনই বর্ষিত হবে!'

ঘড়িতে তখন ৯॥০ টা (রাত্র)। নীচে নাটমন্দিরে ও প্যাণ্ডেলে উৎসবের সমারোহ চলেছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[১১] তখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর বিষয়বস্তু নিয়ে কথকতা করছেন (মঠের পিছনে প্যাণ্ডেলে)। স্বামীজী মহারাজ চাদরটি গায়ে দিয়ে বল্লেন ঃ 'চলো, নীচে যাই, একটু কথকতা শোনা যাক্‌। আজ আনন্দের দিন! প্রাণভরে সকলে তোমরা আনন্দ করো। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য-আবির্ভাব আজ এখানে!' আমরা স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে নীচে নেমে উৎসব-অনুষ্ঠানের দিকে গেলাম। দেখি সমাগত সকলে তখন আত্মভোলা হ'য়ে কথকতা শুন্‌ছে। একটু পরেই কীর্তন আরম্ভ হবে। স্বামীজী মহারাজকে চেয়ার দেওয়া হ'ল। তিনি বসে একমনে কথকতা শুন্‌তে লাগ্‌লেন।

১০। তখন বেদান্ত সমিতি, এখন বেদান্ত-মঠ।

১১। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজী মহারাজেরই দীক্ষিত সন্তান এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অগ্রজ। সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি সঙ্গীতে ও নানা শাস্ত্রে।

।। স্মৃতি ঃ আঠাশ ।।

২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৬ খ্রীঃ) রওনা হলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ দার্জিলিঙ-আশ্রম থেকে কলকাতা-অভিমুখে। ২৩শে সেপ্টেম্বর সকাল প্রায় ৯।।০ টায় তিনি এসে পৌঁছুলেন কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে। ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে বেদান্ত মঠের নূতন বাড়ী তখন সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তখনও তার নাম ছিল রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-সোসাইটী। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ থেকে বেদান্ত সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে কলকাতা বেদান্ত সমিতিকে দেবোত্তর করার জন্য স্বামীজী মহারাজের নির্দেশমতো খসড়াপত্রের (draft) কাজ চলছিল। পরিবর্তনও (changes) তাতে কম করেন নি তিনি। তাঁর অবর্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা ও সকল কাজ যাতে সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে চলে ও কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে সে'কথাই তিনি তাঁর সেবক-সন্তানদের বল্‌তেন। বেলুড় মঠের নিয়মাবলী ও ট্রাষ্ট-ডিডের ছাপা-নকলও তিনি আনিয়েছিলেন কলকাতার ট্রাষ্টডিড্‌কে নিখুঁতভাবে তৈরী করার জন্য। তবে নবপরিকল্পিত রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠকে তিনি আরও শক্তিশালী ও লোকহিতকর কর্ম করার ক্ষমতা দান করার পক্ষপাতী ছিলেন। মঠ ও আশ্রম কেবলই ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্রভূমিরূপেই পরিগণিত না হ'য়ে যাতে স্বাধীনভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ-অনুযায়ী জনহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে তাই ছিল তাঁর অন্তরের বাসনা। কলকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠকে তাই তিনি সকল রকম সুযোগ ও কর্মক্ষমতা দান করেছিলেন। কিন্তু তাই ব'লে তিনি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সোসাইটি বা সমিতির অস্তিত্ব লোপ করার পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং পরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান মঠকে আরও শক্তিশালী সংঘে পরিণত করার জন্য তিনি সমিতির অস্তিত্বকে বজায় রেখে একই শ্রীরামকৃষ্ণনামাঙ্কিত সংঘের দু'টি সুদৃঢ় বাহুর পারস্পরিক সহযোগকে অব্যাহত রাখ্‌তে সচেষ্ট ছিলেন। সমিতির যাবতীয় জিনিস তাই মঠের দানপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে উৎসর্গ কর্‌লেও মঠের পাশে সমিতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তিনি তাঁর সকল রকম কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য। মঠ ও সমিতি সমষ্টি জনকল্যাণের কামনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মঙ্গল-আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাতে পারস্পরিক ভালবাসা ও প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ থাকে ও তাদের সুদূরপ্রসারী অগ্রগতিকে জয়যুক্ত করে এটাই ছিল তাঁর অন্তরের আকুলতা ও মনের একান্ত ইচ্ছা।

কলকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মিত হওয়ার পূর্বে স্বামীজী মহারাজ বল্‌তেন ঃ 'দার্জিলিঙ-আশ্রম শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছি এবং সকল দায়িত্ব ও ভার সঁপে দিয়েছি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে। বাকী এখন তাঁর লীলাক্ষেত্র উত্তর-কলকাতার বুকে একটি মন্দির নির্মাণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করা, এবং এটিই এখন আমার সংকল্পের শেষ কাজ।' কলকাতায় মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজী ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ ও প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ নিজে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মন্দির-তৈরীর কাজ শুরু হ'য়ে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রায় শেষের দিকে তা' সমাপ্ত হয় এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ (৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩) রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে মন্দির উৎসর্গ ক'রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন।[১] মন্দির-প্রতিষ্ঠার ঘটনাটিও স্বামীজী মহারাজ সংক্ষেপে তাঁর রোজনাম্‌চায় (Diary ১৪ই মার্চ, ১৯৩৭) লিখেছেন দেখা যায়—

'Went down and opened the door of মন্দির and নাটমন্দির at 7-30 A. M. Watched the start of the procession till 9 A. M. Sjt. Sanat Mookherji unveiled S. V's (Swami Vivekananda's) Oil-

১। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন মাদ্রাজে অর্ডার দেওয়া চন্দনকাঠের সিংহাসন এসে না পৌঁছানোর জন্য সাধারণ একটি কাঠের সিংহাসন তৈরী করিয়ে তাতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। চন্দন-কাঠের সিংহাসনটি মাদ্রাজ থেকে এসে পৌঁছোয় ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) শনিবার। তাতে প্রতীক তৈরী ক'রে রঙ করাতে লাগ্‌লো দু'দিন। স্বামীজী মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব ছিল ২৮শে সেপ্টেম্বর (১২ই আশ্বিন, ১৩৪৪) মঙ্গলবার। সে'দিনই নূতন সিংহাসনে নূতন একটি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি বসিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন স্বামীজী মহারাজ। তাঁর ডাইরীতেও ঐদিনের ঘটনা-সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন ; "It was a cyclonic weather with heavy rain and high winds all day and night. I made প্রাণপ্রতিষ্ঠা of the new photo of R. K. in the new sandal wood সিংহাসন। Had কথকতা by পাঁচকড়ি and শ্রীরামকৃষ্ণকীর্তন by a party from চোরবাগান। I sat in নাটমন্দির for two hours" (অর্থাৎ সে'দিন ছিল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ দিন। দারুণ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল দিন ও রাত ধরে। আমি চন্দনকাঠের সিংহাসনে শ্রীরামকৃষ্ণের নূতন একটি ফটো বসিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলাম। পাঁচকড়ির (বন্দ্যোপাধ্যায়) কথকতা ও চোরবাগানের শ্রীরামকৃষ্ণকীর্তন হয়।) চন্দনকাঠের সিংহাসনের সঙ্গে সেই দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত ছবিটি এখনও মন্দিরে আছে।

paint. I spoke and described the history of S. R's (Sri Ramakrishna's) Oil-paint by Fr. Dvorak. At 2 P.M. I went down and প্রদক্ষিণ around the mandir and did প্রাণপ্রতিষ্ঠা। In eve I heard কথকতা and ভূপেন বসুর কীর্তন'।[২] অবশ্য বিস্তৃতভাবে পূর্বেই এ'সব ঘটনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

ক্রমে কলকাতা বেদান্ত সমিতিকে দেবোত্তর করার কর্মে স্বামীজী মহারাজ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মন্ত্রশিষ্য নড়াইলের জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর পরামর্শ অনুসারে ট্রাষ্ট-ডিডের (Trust-Deed) খসড়া রচনা করেন। এটর্ণি যতীন্দ্রনাথ বসু ও মণীন্দ্রনাথ মিত্র খসড়া-রচনার কাজে সহায়তা করেন। স্বামীজী মহারাজ প্রায়ই বল্‌তেন ঃ 'this is the last mission of my life' (এটাই আমার জীবনে শেষকাজ)। তাই বেদান্ত সমিতিকে যে'দিন শ্রীরামকৃষ্ণের কল্যাণময় চরণে অর্পণ করলেন সে'দিন তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম শান্তির নিঃশ্বাস ও অন্তরে আনন্দের স্বচ্ছ প্রকাশ। সে'দিনের কথা এখনো চাক্ষুষ আমাদের মনে আছে! একদিন রাত্রে আফিস-ঘরে আমরা বসে আছি, তিনি বল্লেন ঃ 'এখন যতদিন শ্রীশ্রীঠাকুর রাখেন ঝড়ের এঁটো পাতার মতো! ঝড়ের এঁটো পাতা হওয়ার চেয়ে আর শান্তি কি বলো। তাঁর আশ্রম এবার তিনিই দেখ্‌বেন, আমার এবার পেন্সন।'

২। "আমি নীচে গেলাম ও নাটমন্দিরের দ্বারোদঘাটন কর্‌লাম। তখন সকাল সাড়ে ৭টা (১৪ই মার্চ, রবিবার ১৯৩৭)। ৯টা পর্যন্ত অপেক্ষা কর্‌লাম শোভাযাত্রা বার হওয়ার জন্য। সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) নাটমন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করলেন। (একটি ছোট সভার অনুষ্ঠান হ'ল নাটমন্দিরে)। আমি প্রাগের ফ্রাঙ্ক্‌ ডোরাক্‌-অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলচিত্রের ইতিহাসের কথা সকলকে বুঝিয়ে বল্লাম। বেলা ২টোর সময়ে নীচে গিয়ে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা'র প্রতিকৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলাম। রাত্রে 'কথকতা' (শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়) ও 'কীর্ত্তন' (ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর) শুন্‌লাম।"

।। স্মৃতি ঃ উনত্রিশ ।।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেততত্ত্বানুশীলক ভি. ডি. ঋষি একবার কলকাতা বেদান্ত মঠে এসেছিলেন। স্বামীজী মহারাজ তখন কলকাতায়। ভি. ডি. ঋষি এলেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। ভি. ডি. ঋষির সঙ্গে স্বামীজী মহারাজের আলাপ ছিল অনেকদিন আগে থাকতে। ভি. ডি. ঋষির পত্নীও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। প্রেতাবতরণের তিনিই (তাঁর পত্নীই) ছিলেন ভি. ডি. ঋষির মাধ্যম বা মিডিয়ম। বিশেষতঃ নারীরা কোমলস্বভাবা, ভাব ও ধ্যানপ্রবণ ব'লে তাঁরাই ভালো মিডিয়ম হ'তে পারেন। আমেরিকায় মেয়েরাই সকল সময়ে হয় ভালো মিডিয়াম।

ভি. ডি. ঋষি বেদান্ত মঠে এলেন ইংরেজী ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে (১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) রবিবার, সন্ধ্যার কিছু পূর্বে। সমিতির গ্রন্থাগারে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হ'ল। তিনি মনোজ্ঞ একটি ভাষণ দিলেন 'প্রেততত্ত্ব' *(Spiritualism)* সম্বন্ধে। এটর্ণি মণীন্দ্রনাথ মিত্র সেই বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব করেন। স্বামীজী মহারাজ আমেরিকায় থাকাকালে প্রেততত্ত্বানুশীলন-সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেন। প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁর যে কী প্রগাঢ় ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' ('মরণের পারে') গ্রন্থ যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন। এ'গ্রন্থেও আমরা সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি।

ভি. ডি. ঋষির সঙ্গে পরিচয় ছিল স্বামীজী মহারাজের তা' আগেই বলেছি। ঋষি পাঠিয়েছিলেন তাঁকে একটি উইজা-বোর্ড *(Ouija-Board*-প্রেতাবতরণ-যন্ত্র) উপহার-সামগ্রীরূপে। ইংরেজী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্টের (২৫শে শ্রাবণ ১৩৪৩, সোমবার) রোজনামচায় *(Diary)* এ'সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজ লিখেছেন ঃ 'Received Ouija-Indicator from V. D. Rishi and paid Rs. 4/10'। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট (১লা ভাদ্র, ১৯৪৩) সোমবার রোজনামচায়ও পাই ঠিক এই ধরণের আর একটি লেখা ঃ 'Sent Ouija Board to Girin Roy per V. P. Rs. 4-10+7 Ans = Rs. 5-1-0'। সে' উইজা-বোর্ডটি আবার দিয়েছিলেন স্বামীজী মহারাজ তাঁরই অন্যতমা মন্ত্রশিষ্যা কাশীপুরের বিভাবতী রায়কে।

উইজা-বোর্ডটি দেখতে ছিল চারকোণা। একটি মোটা পিজবোর্ডের উপর

ইংরেজী 'এ' থেকে 'জেড্' (A—Z) পর্যন্ত অক্ষরগুলি সাজানো। পৃথক-দু'টি চাকা-লাগানো ও লোহার কাঁটাযুক্ত একটি যন্ত্র ছিল তার সঙ্গে। বোর্ডের উপর ছিল ঐ যন্ত্রটি। দু'পাশে দু'জন মিডিয়ম উপবেশন ক'রে সেটি স্পর্শ ক'রে থাকেন ঐ চাকাযুক্ত সূচ্যাগ্র কাঁটাটিতে হাত দিয়ে। পাশে থাকেন আর-একজন, কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসেন মেসেজগুলি লেখার জন্য। প্রশ্নকারীরা থাকেন পাশে ব'সে।

কাশীপুরের বাড়ীতেই বস্তো উইজা-বোর্ড নিয়ে প্রেতাবতরণ-বৈঠক। মিসেস্ রায় (বিভাবতী রায়) ও বীরেন্দ্রনাথ রায় হতেন বৈঠকের মিডিয়ম। ধীরেন্দ্রনাথ রায় থাক্তেন কাগজ-পেন্সিল নিয়ে ব'সে বিদেহী-আত্মার-প্রেরিত কথাগুলি লেখার জন্য। গিরীনবাবু (গিরীন্দ্রনাথ রায়) ও স্বামীজী মহারাজ থাক্তেন পাশে ব'সে। স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে যেতেন লক্ষ্মণ মহারাজ (স্বামী সত্যরূপানন্দ) বা নগেন মহারাজ (স্বামী সদাশিবানন্দ) বা অন্য কেহ। কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে বসার পর কাঁটাটির মধ্যে দেখা দিতো স্পন্দন ও গতি। কাঁটার সূচীমুখ পড়্তো উইজা-বোর্ডে লিখিত এক-একটি অক্ষরের উপর। দু'পাশে লাগানো চাকা-দু'টি কাঁটাটিকে ঘোরাফেরার জন্য সাহায্য করতো। বীরেনবাবু উচ্চৈঃস্বরে পড়্তেন ইংরেজী শব্দগুলি (অক্ষর) ও ধীরেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি লিখে যেতেন কাগজে। সকল রকম মেসেজই হ'ত লেখা। স্বামীজী মহারাজ ও সকলে পড়ে বুঝ্তেন পবিত্র বিদেহীদের সঙ্কেত ও কথা।

কাশীপুরের বাড়ীতে উইজা-বোর্ড নিয়ে বৈঠক বস্তো সম্পূর্ণ ঘরোয়াভাবেই। তার পরিবেশ ছিল পবিত্র ও শান্তসমাহিত। স্বামীজী মহারাজকে উপলক্ষ ক'রেই বস্তো বেশীর ভাগ বৈঠক। তাঁর আহ্বানে আস্তেন স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা। কখনো কখনো আস্তেন শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে ও উপদেশ দিতেন তাঁর প্রিয় সন্তানকে। অত্যন্ত সংযত ও সংক্ষেপভাবেই প্রশ্ন করা হ'ত বাঙ্গালায় বা ইংরাজীতে, কিন্তু উত্তর আস্তো সর্বদাই ইংরাজীতে। ধূপের গন্ধে আমোদিত হ'য়ে থাক্তো সারাটি ঘর, আর স্তব্ধ ও ভাববিমুগ্ধ থাক্তেন বৈঠকে যাঁরা যোগদান করতেন—তাঁরা।

সেই বৈঠকের দু'একটি পরিচয় দেবো এবার এইপ্রসঙ্গে এখানে। স্বামীজী মহারাজ নিজেই লিখেছেন তাঁর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের রোজনাম্চায় (১৬ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন ১৩৪৩ শুক্রবার) বৈঠকের কথা ঃ 'Cloudy and showers at night. Went to Cossipore after 7 P. M. and returned after 10 P. M. Had Lakshman with me and we took tea. Sat

when they had Oui-ja-Board with Biren, Girin, Dhiren and Mrs. Roy. S. V. and S. B. gave messages to me.'

['রাত্রে বেশ মেঘ ও বৃষ্টি হ'ল। সন্ধ্যা ৭টার পর কাশীপুরে (ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ী) গেলাম ও সেখান থেকে ফিরে এলাম রাত্রি ১০টায়। লক্ষ্মণ (স্বামী সত্যরূপানন্দ) আমার সঙ্গে গেল। আমরা সেখানে চা খেলাম। তারপর উইজা-বোর্ড নিয়ে বস্‌লাম। বৈঠকে উপস্থিত ছিল বীরেন, গিরীন, ধীরেন ও মিসেস্ রায় (বিভাবতী রায়)। এস. ভি. (স্বামী বিবেকানন্দ) ও এস. বি. (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমাকে তাঁদের বাণী দিলেন']।

আর একটি এ'সম্বন্ধে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল (২২শে চৈত্র ১৩৪৩) বুধবার রাত্রির ঘটনা। স্বামীজী মহারাজ তাঁর রোজনাম্‌চায় *(Diary)* এ'সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ 'At 7-30 P. M. went to Mrs. Roy with লক্ষণ, and had tea. Then sat at Oui-ja-Board. Mrs. Roy, Dhiren এবং Biren. I sat aside. S. V. came first and asked us to meditate. S. R. gave me message of instructions. Then S. V. and then অখণ্ডানন্দ। Returned after 10-30 P. M.'

['সন্ধ্যা ৭।।০ টায় লক্ষণকে (স্বামী সত্যরূপানন্দ) সঙ্গে নিয়ে মিসেস্ রায়ের ওখানে (কাশীপুরে) যাই ও চা খাই। তারপর উইজা-বোর্ডে বস্‌লাম। মিসেস্ রায় (বিভাবতী রায়), ধীরেন (ধীরেন্দ্রনাথ রায়) ও বীরেন (বীরেন্দ্রনাথ রায়) ছিল বৈঠকে। আমি পাশে (চেয়ারে) বসে থাক্‌লাম। এস. ভি. (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রথমে এলেন ও আমাদের ধ্যান করতে বল্লেন। তারপর এস. আর. (শ্রীরামকৃষ্ণ) এলেন ও আমাকে তাঁর শিক্ষাপূর্ণ বাণী দিলেন। আবার এস. ভি. (স্বামী বিবেকানন্দ) ও পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ এলেন। আমরা রাত্রি ১০।।০ টায় কাশীপুর থেকে বেদান্ত মঠে ফিরে এলাম'।]

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখের বাণী ছিল একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ! পার্থিবলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে পারস্পরিক নিবিড় ভালবাসা ছিল, শাশ্বতধামের অধিবাসী হ'য়েও পৃথিবীর প্রতি তাঁদের সেই ভালোবাসার অন্ত ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর জীবন্মুক্ত-সন্তানরা বৌদ্ধ-অবলোকিতেশ্বরের মতো নিজেদের মুক্তিকেও উপেক্ষা করেছিলেন, আর সেজন্য বিশ্বের কল্যাণসাধনায় শত-সহস্র জন্ম স্বীকার করতেও তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ-সন্তানদের লক্ষ্য ক'রে কতবার বলেছেন ঃ "বাউলের দল * * * নেচে কেঁদে গেল, ...কেউ চিনতে পারলো না", "ওরা

সব নিত্যসিদ্ধের দল", "প্রাতঃকালের তোলা মাখন"। সত্যই জীবন্মুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানরা ছিলেন ব্যক্তিগত মুক্তির বিরোধী, ছিলেন সকলে বোধিসত্ত্বের দল। ধূলিমলিন-পৃথিবীলোক থেকে বিদায় নিলেও দিব্যসত্তা তাঁদের এখনো-পর্যন্ত অক্ষুণ্ণই আছে।

ইংরেজী ১৯৩৬-১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের বাণীগুলি পাওয়া যায় কাশীপুর-বৈঠকেই। স্বামীজী মহারাজ, মিসেস্ রায়, ধীরেনবাবু ও বীরেনবাবু ছিলেন সেদিন বৈঠকে বসে। প্রথমেই এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) উইজা-বোর্ড-চালকদের লক্ষ্য ক'রে বল্লেন ঃ 'আমার শতকোটি প্রণাম দাও স্বামীজীকে (স্বামী বিবেকানন্দকে)।' চালকরা সমস্বরে জানালেন স্বামী বিবেকানন্দকে স্বামী অভেদানন্দের প্রণাম।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ 'My heartiest blessings and love.'

['আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা নাও']

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'আপনি কি আমায় এখানে দেখ্‌তে চেয়েছিলেন? কিছু বল্‌বেন কি?'

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ 'All of you just meditate for sometime'.

['তোমরা সকলে কিছুক্ষণের জন্য ধ্যান করো']

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ 'My Master will speak to you,'

['মদীয় আচার্যদেব (শ্রীরামকৃষ্ণ) তোমাকে কিছু বল্‌বেন।']

শ্রীশ্রীঠাকুর ঃ 'My dearest son, I have come down to this plane only to bless you. Your work is in right direction. My Mother is always with you and shall be there wherever you keep her. *Your work is coming to an end,* but before you leave this mortal world, some more work you must finish. Educate your disciples ** , that at least some of them may not be misguided by love for power and name and money. My blessings to you all.'

['প্রিয় সন্তান, আমি এসেছি এখানে তোমায় আশীর্বাদ জানাতে। তোমার কর্মপ্রণালী ঠিকপথেই চল্‌ছে। আদ্যাশক্তি মা সর্বদাই আছেন ও যেখানেই তুমি তাঁকে নিয়ে যাবে সেখানেই তিনি থাক্‌বেন। অবশ্য (পৃথিবীতে) তোমার কাজ শেষ হ'য়ে আস্‌ছে, কিন্তু পার্থিব শরীর ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে তোমায় আরো-

কিছু কাজ করতে হবে। তোমার শিষ্যদের শিক্ষা দিয়ে তৈরী করো * *, অন্ততঃ তাদের মধ্যে কেহ্ কেহ্ যেন ক্ষমতাপ্রিয়তা, নাম-যশ ও অর্থের লোভে আদর্শচ্যুত না হয়। তোমাদের সকলকে আমি আশীর্বাদ জানাই।']

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তারপর অন্তর্হিত হলেন। এলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ 'My brother, you wanted to know whether my Master was present on the occasion of the opening ceremony of the temple.'

['ভাই, তুমি জান্‌তে চেয়েছ্‌ যে, তোমার মন্দিরপ্রতিষ্ঠার (অনুষ্ঠানের) সময়ে মদীয় আচার্যদেব (শ্রীরামকৃষ্ণ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা!']

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'Yes' ['হ্যাঁ']।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ 'He Himself came to tell you that He will go wherever you will take Him to. You do certainly feel His presence in your temple. I, though an humble servant of my Lord, take this opportunity to bless you for having been able to fulfil one of my missions to start *a hall for (spiritual) educational purpose* in the very heart of this city which was once the centre of *Lila* of our Master. Perhaps very few knew that this was a mission of my humble self except you, * * and few other gurubhais. This institution of yours must be such as will give real training to the fallen masses so that they will know what is the ultimate goal of mankind. It is only through you that the will of my Master can get full play for the present. You will gradually see how the name of my Master will create and open out a new field and vision among the people of this city * *'

['তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এসেছিলেন তোমায় জানাতে যে, যেখানেই তুমি তাঁকে নিয়ে যাবে সেখানেই তিনি যাবেন। নিশ্চয়ই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন[১] তুমি মন্দিরের মধ্যে তাঁর পুন্য-আবির্ভাব অনুভব করেছিলে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের

১। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ (৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩) কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই বৈঠক-বাণী প্রদত্ত হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল (২২শে চৈত্র, ১৩৪৩)—মন্দির-প্রতিষ্ঠার প্রায় এক মাস পরে।

যদিও আমি অতিদীন দাসানুদাস, তবুও এই অবসরে তোমায় আশীর্বাদ জানাবার সুযোগ নিচ্ছি যে, আমার একটি একান্ত কামনা ছিল (শ্রীরামকৃষ্ণের) লীলাস্থল কলকাতার বুকে শিক্ষা-প্রসারতার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা। একমাত্র তুমি ও কোন কোন আমার গুরুভাই-ছাড়া সম্ভবতঃ কম লোকই একথা জানে। তুমি যে প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছ তাতে অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সত্যকারের শিক্ষার বিস্তার হবে ও তা' থেকে তারা বুঝ্তে পার্বে তাদের জীবনের চরমলক্ষ্য কি। একমাত্র তোমার ভিতর দিয়ে বর্তমানে মদীয় আচার্যদেবের পরিপূর্ণ মহিমা প্রকাশ পেতে পারে। ক্রমশঃ আরো দেখ্তে পাবে ক্যামন ক'রে মদীয় আচার্যদেবের নাম এই শহরের (কলকাতার) লোকদের মধ্যে এক নূতন দৃষ্টি এনে দিয়ে নূতন ক্ষেত্রের উদ্বোধন কর্বে * * ']

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'উনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কি এই message (বাণী) দিয়েছিলেন?'

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ 'My Master gave it through this humble self'.

['হ্যাঁ, আচার্যদেব এই দাসের ভেতর দিয়েই তাঁর বাণী তোমায় পাঠিয়েছিলেন']।

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'আর কতদিন আমায় এখানে (পৃথিবীতে) থেকে কাজ কর্তে হবে?'

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ 'I do not want to say. * * You will yourself get sufficient notice'.

['আমি আর তা' বল্তে চাই না। * * তবে তুমি নিজেই তার যথেষ্ট ইঙ্গিত বুঝ্তে পারবে']।

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'Will this work prosper, this temple, hall etc.—through the will of our Master ?'

['এই যে মন্দির, হল্ (নাটমন্দির) প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা কর্লাম এ'গুলি কি শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে?'

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ 'Certainly, otherwise do you think that my Master would have employed you in this work of His ? You are only His servant.'

['নিশ্চয়ই, তা নইলে কি শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় তাঁর কাজে নিয়োজিত করতেন! তুমি তো তাঁর দাস মাত্র।']

স্বামীজী মহারাজ : 'I thank you for the message. Give my heartiest love, salutation to my Lord'.

['আমাকে এই বাণী দেওয়ার জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আচার্যদেবকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও প্রণাম দিও'] স্বামী বিবেকানন্দ অন্তর্হিত হ'লে এলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। উইজা-বোর্ডের কাঁটা তখন স্পর্শ করেছে 'এ' (A) অক্ষরটিকে। স্বামী অখণ্ডানন্দ বাণী দিয়ে বল্লেন : 'My love and namaskara to my brother. My blessings to Biva, Dhiren Babu, Girin Babu and Biren Babu and to all the children.'

['ভাই, তোমাকে আমার ভালোবাসা ও নমস্কার জানাচ্ছি। বিভা, ধীরেনবাবু গিরীনবাবু, বীরেনবাবু ও অন্যান্য সকল ছেলেমেয়েদের আমার আশীর্বাদ।']

স্বামীজী মহারাজ : ' * * যে'দিন তোমার দেহত্যাগ হয়েছিল, আমি সে'দিন গিয়েছিলাম (বেলুড়ে), তা' কি তুমি জানো?'

স্বামী অখণ্ডানন্দ : 'Yes' ['হ্যাঁ']

স্বামীজী মহারাজ : 'কলকাতায় যে temple (মন্দির) হয়েছে তা' কি তুমি জানো? তা' দেখেছ কি?'

স্বামী অখণ্ডানন্দ : 'Yes. Did you not feel my presence near you after I left this mortal body ? I went to take leave from you.'

['নিশ্চয়ই দেখেছি। আমি যখন নশ্বরদেহ ত্যাগ করি তখন কি তুমি আমার উপস্থিতি অনুভব করোনি? বিদায় নিতে গিয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে।']

স্বামীজী মহারাজ : 'এখন আর কি কাজ আমার বাকী আছে বলো।'

স্বামী অখণ্ডানন্দ : 'My Master's will must be fulfilled. * * Good bye!'

['আমার প্রভুর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। * * এখন বিদায়']

এখানে আরো দু'টি পৃথক বিদেহী আত্মার বাণীর উল্লেখ কর্‌লাম। স্বামীজী মহারাজ ইংরেজীতে একটি কাগজে ঐ দুটি বাণী লিখে রেখেছিলেন। এ'রকম বোর্ড-মারফৎ একটি বাণী পান তিনি ৫ই আগষ্ট এবং অপরটি পান ৬ই আগষ্ট, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

* * * *

I

OUIJA-BOARD SITTING IN AMERICA WITH MRS. DEXTER AND URCHS. AUGUST 5th, 1914, AT NIGHT.

(Communicated with Sister Nivedita)

'A student will come into a great fortune and will do you all you desire. She is truly a Yogi and has been guided by your Master through trials. Search for mother for household not outside. Be careful with the new-comers,—Nivedita, Nivedita.'

II

SAT IN AMERICA WITH MRS. DEXTER. AUGUST 6th, 1914, AT NIGHT, 10 P. M.

(Communicated with Swami Vivekananda)

'Received message from Vivekananda at 10 P. M.

1. Asked him to spell his name.
2. Asked : Have you message for me ?
   Ans.—Not at present.
3. Asked : Shall I go to India ?
   Ans.—No.
4. Q.—Shall I go to California ?
   Ans.—No.
5. Q.—What shall I do here ?
   Ans.—Work with faith.
6. Q.—Will you help me ?
   Ans.—Yes. Always do good work on earth. Then he spelled my name.
7. Asked : Are you with R. (Ramakrishna Deva) ?
   Ans.—Yes.

8. Asked : Please give him my love.
   Ans.—Yes.
9. Asked : Ask him to bless me.
   Ans.—Yes.
10. Q.—Was Nivedita here last night ?
    Ans.—Yes.
11. Q.—Where is Balaram Babu ?
    Ans.—Heaven.

Then he wrote :

'My brother in knowledge, good-bye!'

বঙ্গানুবাদ

উইজা-বোর্ড-অধিবেশনে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দের কথোপকথন (আমেরিকায়) ঃ

(১)

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট রাত্রে ঃ

'ধনী ভাগ্যবতী একজন ছাত্রী আপনার কাছে আস্‌বে। আপনি যে সকল ইচ্ছা করেছেন তিনি আপনার জন্য তা সবই করবেন। সেই নারী একজন যোগী, আপনার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নানান্ পরীক্ষার ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।** যাঁরা সব নূতন নূতন আপনার কাছে আস্‌বেন তাঁদের থেকে আপনি সতর্ক থাক্‌বেন।—নিবেদিতা, নিবেদিতা।'

(২)

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট, রাত্রি ১০টায় ঃ

'রাত্রি তখন ১০টা, স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে বাণী পাওয়া গেল (আমেরিকায়)।

১। প্রথমে তাঁর (বিবেকানন্দের) নামটির বানান জিজ্ঞাসা করা হ'ল।

২। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমাকে আপনার কোন-কিছু বলার আছে কি?
   উঃ—না, বর্তমানে অন্ততঃ নয়।

৩। প্রঃ—আমি কি ভারতে ফিরে যাব?
উঃ—না।
৪। প্রঃ—আমি কি ক্যালিফোর্ণিয়ায় যাব?
উঃ—না।
৫। প্রঃ—আমেরিকায় এখন তাহলে কি কর্‌বো?
উঃ—ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে কাজ ক'রে যাও।
৬। প্রঃ—আপনি কি আমায় সেজন্য সাহায্য কর্‌বেন?
উঃ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কর্‌বো। পৃথিবীতে যতদিন থাকো ততদিন সৎকাজ ক'রে যাও। (তারপর তিনি আমার নামটা বানান ক'রে বললেন)
৭। প্রঃ—আপনি কি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আছেন?
উঃ—হ্যাঁ।
৮। প্রঃ—আপনি অনুগ্রহ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমার শ্রদ্ধা-ভালবাসা দিন।
উঃ—হ্যাঁ, দেবো।
৯। প্রঃ—শ্রীঠাকুরকে জানান্ যেন তিনি আমায় আশীর্বাদ করেন।
উঃ—হ্যাঁ জানাবো, তিনি আশীর্বাদ কর্‌বেন।
১০। প্রঃ—কাল রাত্রে কি নিবেদিতা এখানে (আমার কাছে) এসেছিলেন?
উঃ—হ্যাঁ, এসেছিলেন?
১১। প্রঃ—এখন বলরাম বসু কোথায় আছেন?
উঃ—স্বর্গে।'

তারপর তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) লিখ্‌লেন ঃ 'আমার প্রিয় ভ্রাতা, এখন তা'হলে আসি, বিদায়।'

॥ পরিশিষ্ট ॥

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের এই 'সিয়ান্স' বা 'প্ল্যানচেটের' সত্যাসত্যনির্ণয়-সম্বন্ধে আমরা পাঠক-পাঠিকাদের সানন্দে অনুরোধ জানাই আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়াম্ ক্রুক্‌স্ এফ. আর. এস. লিখিত বিখ্যাত *Researches into the Phenomena of Modern Spiritualism* (3rd edition, 1914)-গ্রন্থটি পড়ার জন্য। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মাননীয়

ক্রুক্স্‌-এর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং 'সিয়ান্স' ও 'মিডিয়াম' প্রভৃতির তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বহু আলোচনা করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের এই রহস্যময় আলোচনাটি বোঝার জন্য স্যার উইলিয়াম ক্রুক্সের ঐ গ্রন্থটি বিশেষ উপকারে আস্‌বে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে Austin Publishing Company, Los Angeles, California থেকে।

এখানে সামান্যভাবে উল্লেখ ক'রে বলি ক্রুক্সের একটি কথা ঃ "I now proceed to classify some of the phenomena which have come under my notice, proceeding from the simple to the more complex, and briefly giving under each heading an outline of some of the evidence I am prepared to bring forward. My readers will remember that, with the exception of cases specially mentioned, the occurrences have taken place in my own house, in the light, and with only private friends present besides the medium. In the contemplated volume, I propose to give in full detail the tests and precautions adopted on each occasion, with names of witnesses. I only briefly allude to them in this article."

SIR WILLIAM CROOKES' COMMENT ON THEORY OF PSYCHIC FORCE

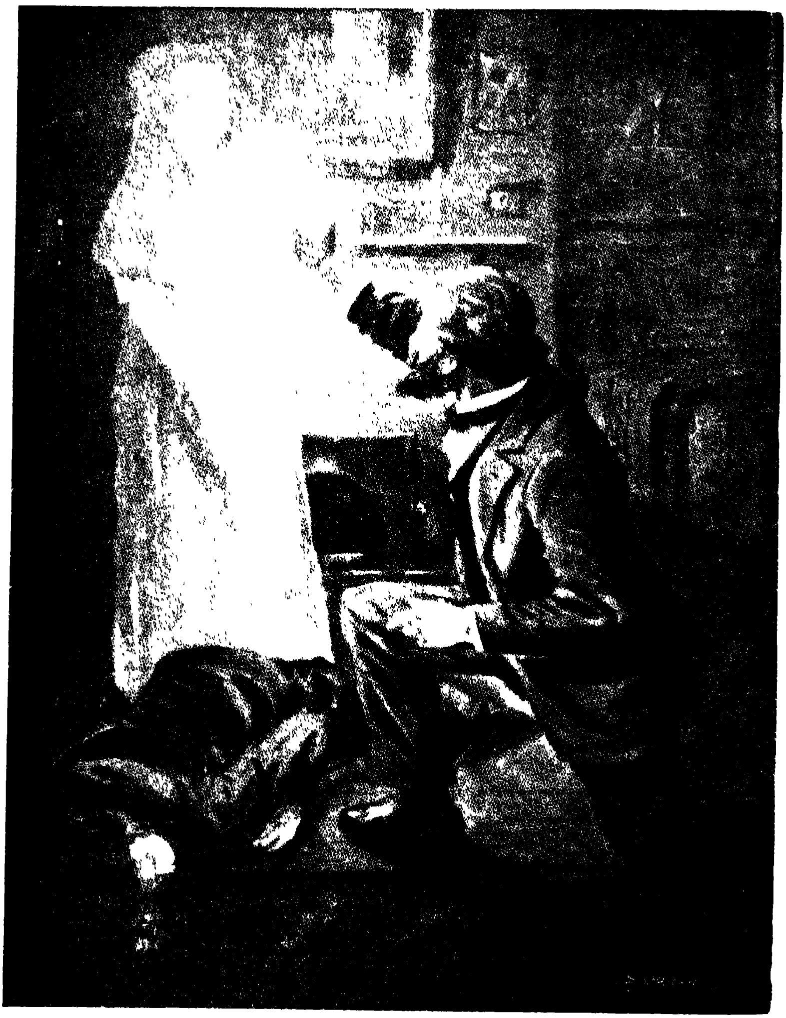
(that conducts the Seances and the Planchettes)

"Be it remembered that an explanation to be of any value must satisfy all the conditions of the problem. It is not enough for a person, who has perhaps seen only a few of the inferior phenomena, to say, 'I suspect it was all cheating', or 'I saw how some of the tricks could be done'.

Second Theory.—The persons at a seance are the victims of a sort of mania or delusion, and imagine phenomena to occur which have no real objective existence.



স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বসা ছবি তাঁর অফিসঘরে।



স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্ দেখাচ্ছেন বিদেহী-আত্মার মূর্তি ও পার্শ্বে মিডিয়াম অজ্ঞান - অবস্থায় শায়িত।

Third Theory.—The whole is the result of conscious or unconscious cerebral action.

Fourth Theory.—The result of the spirit of the medium, perhaps in association with the spirits of some or all the people present.

These four theories are evidently incapable of embracing more than a small portion of the phenomena, and they are improbable explanations for even those. They may be dismissed very briefly.

I now approach the 'Spiritual' theories. It must be remembered that the word "spirits" is used in a very vague sense by the generality of people.

Fifth Theory.—The actions of evil spirits or devils, personifying who or what they please, in order to undermine Christianity and ruin men's souls.

Sixth Theory.—The action of a separate order of beings, living on this earth, but invisible and immaterial to us. Able, however, occasionally to manifest their presence. Known in almost all countries and ages as demons (not necessarily bad), gnomes, fairies, kobolds, elves, goblins, puck, etc.

Seventh Theory.—The actions of departed human beings—spiritual theory per excellence.

Eighth Theory.—(The Psychic Force Theory).—This is a necessary adjunct to the 4th, 5th, 6th and 7th theories, rather than a theory by itself.

"According to this theory, the 'medium', or the circle of people associated together as a whole, is supposed to possess a force, power, influence, virtue of gift, by means of which intelligent beings are enabled to produce the phenomena observed. What these intelligent beings are is a subject for

other theories.

It is obvious that a 'medium' possesses a something which is not possessed by an ordinary being. Give this something a name. Call it "X" if you like. Mr. Serjeant Cox calls it 'Psychic Force'. There has been so much misunderstanding on this subject that I think it best to give the following explanation in Mr. Serjeant Cox's own words—

"The Theory of Psychic Force is in itself merely the recognition of the now almost undisputed fact that under certain conditions, as yet but imperfectly ascertained, and within a limited, but as yet undefined, distance from the bodies of certain persons having a special nerve organization, a Force operates by which, without muscular contact or connection, action at a distance is caused, and visible motions and audible sounds are produced in solid substances. As the presence of such an organization is necessary to the phenomenon, it is reasonably concluded that the Force does, in some manner as yet unknown, proceed from that organization. As the organism is itself moved and directed within its structure by a Force which either is, or is controlled by the Soul, Spirit, or Mind (call it what we may) which constitutes the individual being we term 'the Man', it is an equally reasonable conclusion that the Force which causes the motions beyond the limits of the body is the same Force that produces motion within the limits of the body. And, inasmuch as the external force is seen to be often directed by Intelligence, it is an equally reasonable conclusion that the directing Intelligence or the external force is the same intelligence that directs the Force internally. This is the force to which the name of Psychic Force has been given by me as properly designating a force which I thus contend to be traced back to the Soul or Mind of the man as its source.

But I and all who adopt this theory of Psychic Force as being the agent through which the phenomena are produced, do not thereby intend to assert that this Psychic Force may not be sometimes seized and directed by some other Intelligence than the Mind or the Psychic. The most ardent Spiritualists practically admit the existence of Psychic Force under the very inappropriate name of Magnetism (to which it has no affinity whatever), for they assert that the Spirits of the Dead can only do the acts attributed to them by using the Magnetism (that is, the Psychic Force) of the Medium. The difference between the advocates of Psychic Force and the Spiritualists consists in this–that we contend that there is as yet insufficient proof of any other directing agent than the Intelligence of the Medium, and no proof whatever of the agency of Spirits of the dead ; while the Spiritualists hold it as a faith, not demanding further proof, that Spirits of the Dead are the sole agents in the production of all the phenomena. Thus the controversy resolves itself into a pure question of fact, only to be determined by a laborious and long-continued series of experiments and an extensive collection of psychological facts, which should be the first duty of the Psychlogical Society, the formation of which is now in progress.''

(A picture of Sir William Crookes is attached hereto)

।। স্মৃতি ঃ ত্রিশ ।।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভালবাসা ছিল তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও সন্তানদের উপর অসাধারণ। সকলের উপর তাঁর স্নেহ ও করুণা ছিল বিশেষভাবে ও অফুরন্ত। তাই সকল ভক্তসন্তান মনে করতেন শ্রীশ্রীঠাকুর ভালবাসেন তাঁকেই সকলের অপেক্ষা বেশী। নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, হরিনাথ, তারক, নিরঞ্জন প্রভৃতি অন্তরঙ্গসন্তানরা বাঁধা পড়েছিলেন তাই শ্রীরামকৃষ্ণের নিবিড় ভালবাসায় ও স্নেহের আকর্ষণে। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) বলতেন ঃ 'শ্রীঠাকুর আমাদের ভালবেসে বশীভূত করেছিলেন।' কালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ) বলতেন ঃ 'মা-বাপের স্নেহের টানও আমাদের কাছে তুচ্ছ হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অপার ভালবাসা পেয়ে'। রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলতেন ঃ 'গুরু মহারাজ যত ভালবাসতেন, বাপ-মা কি সে'রকম ভালবাসতে পারে? আমরা তাঁর কি করেছি যে, তার জন্য আমাদের ওপর তাঁর এত ভালবাসা।'[১]

কালীপ্রসাদকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন ঃ 'তুই না এলে আমার প্রাণ আকুলি-ব্যাকুলি করে।' নৌকার ভাড়া না থাক্‌লে শ্রীশ্রীঠাকুরই ভাড়া যোগাড় ক'রে দিতেন। কালীপ্রসাদের পিতা রসিকচন্দ্র গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুঝিয়ে ছেলেকে বাড়ী ফিরিয়ে আন্‌তে। শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বল্লেন। 'সে কি গো, ও (কালীপ্রসাদ) কি তোমার ছেলে? ওকে যে আমি খেয়ে ফেলেছি।' কালীপ্রসাদের ভ্রূ, চোখ ও কপাল দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বল্‌তেন, তাঁর শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপনা হয়। তাঁর ভিতর শ্রীরাধার ভাব জেগে ওঠে।'

নরেন্দ্রনাথের বেলাও তাই। নরেন্দ্রনাথ হয়তো দু'একদিন গেলেন না দক্ষিণেশ্বরে কোন-কিছু কাজের জন্য, শ্রীশ্রীঠাকুর ঠিক পাঁচ বছরের ছেলের মতো উতলা হ'য়ে উঠ্‌তেন। কাকেও হয়তো বলতেন ঃ 'তাই তো, নরেন্দ্র কেন আজ এলো না বলো দিখিনি? তুমি যেও তো একবার তার কাছে, গিয়ে আমার কথা বল্‌বে।' কিংবা নিজেই হয়তো কাজের অছিলা ক'রে কলকাতায় উপস্থিত হতেন নরেন্দ্রনাথকে দেখার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন ঃ 'নরেন্দর আমার শ্বশুর-ঘর।'

১। এ' সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র ভক্তপ্রবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লেখা 'পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রাখালও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অতি-আদরের দুলাল,—তাঁর মানসপুত্র। রাখাল মহারাজ প্রায় সদাসর্বদা থাক্‌তেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। কালীপ্রসাদকে দেখিয়ে বাবুরামকে (প্রেমানন্দ) একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন ঃ 'তোদের আত্মায়-আত্মায় সম্বন্ধ। তোরা যেন বাঁদর, আর আমি বাঁদরওয়ালা। বাঁদর যখন দুষ্টুমি করে, বাঁদরওয়ালা দড়িটা একটু টেনে ধরে, বাঁদর তখন ঠিক হ'য়ে যায়।'[২] বাবুরাম মহারাজকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছিলেন ঃ 'ওর হাড়-পর্যন্ত শুদ্ধ।' শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত ও সন্তানদের স্বভাব-প্রকৃতি ভালভাবে জান্‌তেন ও বুঝ্‌তেন, আর সে ভাবেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার ও আলাপ-আলোচনাদি কর্‌তেন। সাধারণ লোকেদের বেলাও তাই, তিনি বলতেন ঃ 'সকলের মধ্যে কি ভাব আছে—কাচের পরকোলার ভিতর দিয়ে যেমন সব দেখা যায়, তেম্‌নি দেখ্‌তে পাই।'

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকবেশে বেরিয়ে পড়েন ভারতের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করার জন্য। স্বামী অভেদানন্দ তখন বরানগর-মঠবাড়ীতে সর্বদাই শাস্ত্র-আলোচনা ও ধ্যান-ধারণাদি নিয়ে ডুবে থাক্‌তেন। তাঁর জন্য একটি ছোট ঘর নির্দিষ্ট ছিল। সকল সময়েই থাক্‌তো সেই ঘরের দরজা বন্ধ। সকলে সে'টিকে তাই বল্‌তো 'কালী-তপস্বীর ঘর।'

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ছিলেন চিরদিন স্পষ্টবক্তা, তেজস্বী, সত্যবাদী ও অসাধারণ মেধাবী। শাস্ত্র-বিচারের বৈঠক বস্‌তো কখনো কখনো বরানগর-মঠে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচারে অবতীর্ণ হতেন স্বামী অভেদানন্দ, কিন্তু তাঁর অনন্যসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষুরধার বুদ্ধি, সুক্ষ্মযুক্তি ও বিচারশৈলী দেখে সকলেই বিমুগ্ধ হতেন। অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করাই ছিল অনেক সময়ে তাঁর সকল বিচারের লক্ষ্য। তবে সকল মতবাদকেই তিনি শ্রদ্ধার প্রণতি জানাতেন। ভক্তিভাবের তিনি মোটেই বিরোধী ছিলেন না। তবে ভাবপ্রবণতা, ভাব-বিহ্বলতা বা উচ্ছ্বাসের পক্ষপাতী তিনি কোনদিনই ছিলেন না। শুদ্ধজ্ঞান ও শ্রদ্ধাভক্তি-সম্বন্ধে ধারণা তাঁর চিরবরেণ্য আচার্যদেবের মতোই ছিল। তিনি দু'টিকে দেখ্‌তেন অভিন্নদৃষ্টি নিয়ে। ভক্তির পর জ্ঞান,—কি জ্ঞানের পর

২। আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে লিখিত স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের একটি পত্রে এ'কথাগুলির উল্লেখ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত 'পত্র-সংকলন'-গ্রন্থে সেই পত্র ছাপা হয়েছে।

ভক্তি—এ'ধরণের বিচার-বিতণ্ডাকে তিনি নিরর্থক বলতেন। জ্ঞান ও ভক্তি কোনটি কারু বিরোধী নয়, বরং উভয়েই উভয়ের সহকারী ও প্রতিপূরক—complementary. ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়,—কি জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি বড়,—এ'ধরণের বিচারবুদ্ধিকে তিনি বলতেন সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতাদোষে দুষ্ট। পক্ষপাতশূন্য উদার দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি ভগবদনুগ্রহ্-লাভের পথে সহায়ক বল্‌তেন। পরমতকে হীন প্রতিপন্ন করতে যাঁরা প্রয়াসী সেই অসহিষ্ণুদের তিনি বলতেন জ্ঞানদৃষ্টিহীন সঙ্কীর্ণবুদ্ধি।

কিছুদিন বরানগর-মঠে অতিবাহিত করার পর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বহির্গত হলেন (১৮৮৮ খ্রীঃ) পরিব্রাজকের বেশে দেশভ্রমণ করতে। হিমালয় থেকে কুমারিকা-পর্যন্ত তিনি পরিভ্রমণ করেন কপর্দকহীন হ'য়ে নগ্নপদে। তাঁর অবলম্বন ছিল একটিমাত্র গৈরিকবস্ত্র, কম্বল ও একটি কমণ্ডলু। তারপর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে রওনা হন স্বামী অভেদানন্দ লণ্ডনে। সেখান থেকে (১৮৯৭ খ্রীঃ) সাগরপার হ'য়ে উপনীত হলেন আমেরিকায় এক বৎসর পরে। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের কিছু-বেশী সময় তিনি অতিবাহিত করেন আমেরিকায় অবিশ্রান্ত কর্ম-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। ক্ষণিক বিশ্রামসুখ-লাভের সৌভাগ্য তাঁর জীবনে খুব অল্প দিনই ঘটেছে। অবশ্য তাঁর পাশ্চাত্যে কর্মপ্রবাহের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। পাশ্চাত্যদেশে প্রতিদিনের কর্মপঞ্জী ছিল ঘড়ি দিয়ে ভাগ-করা। প্রত্যহ তিনটি চারটি ক'রে বক্তৃতা দিতেন বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিষ্ঠানে। তারপর উপনিষৎ, গীতা ও বেদান্তসম্বন্ধে ক্লাস, ঘরোয়া ধর্ম-আলোচনা, আশ্রমের প্রতিটি কাজ নিজে দেখা, কখনো কখনো নিজের হাতে পাইন-আপেল প্রভৃতি ফলের বাগান করা, শাকশব্জী প্রভৃতি চাষের তত্ত্বাবধান করা, নূতন-কিছু পাকপ্রণালী ও কৃষিবিষয়ক নানান্ বই কিনে পড়া ও সেই সম্বন্ধে নির্দেশ-পরামর্শ দেওয়া, বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই লেখা ও চিঠিপত্রের জবাবাদি দেওয়া, নিজের জামা ও টুপী তৈরী করা—এই সকল-কিছুই ছিল তাঁর আমেরিকায় পঁচিশ বছর থাকাকালীন জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। তারই মধ্যে সতেরোবার আতলান্তিক-মহাসাগর তিনি অতিক্রম করেন, তিনবার পরিভ্রমণ করেন পাশ্চাত্যের সমস্ত দেশগুলি (কন্টিনেণ্ট) ও তাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন নূতন নূতন। আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি দোষ-ত্রুটি তাঁর কর্মচঞ্চল জীবনগতির পথরোধ করতে কোনদিনই সক্ষম হয়নি।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষে। কাশ্মীর, লাদাক, তিব্বত

প্রভৃতি সুদূর পার্বত্য-দেশ পরিভ্রমণ ক'রে প্রত্যাবর্তন করেন আবার বেলুড় মঠে। কলকাতায় ও পরে দার্জিলিঙে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও আশ্রম। অসংখ্য সভা-সমিতিতে যোগদান করা, বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেওয়া, প্রাত্যহিক ক্লাস ও ধর্ম-আলোচনা প্রভৃতি কাজ-ছাড়া নবগঠিত আশ্রম-দু'টির বিচিত্র রকমের কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করা, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে মঠ ও আশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে মঠবাসী ও আশ্রমবাসীদের জীবন ও চরিত্রকে গড়ে তোলা, গ্রন্থ-ছাপানো, গ্রন্থের প্রুফ দেখা প্রভৃতি সাধারণ অসংখ্য কাজের দায়িত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল কিছুদিন। কাজেই বিশ্রাম লাভ করা তাঁর শেষের জীবনেও কোনদিন ঘটে ওঠে নি। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিঙ-মেলের দুর্ঘটনায় যখন তিনি অসুস্থ ও ডাক্তাররা উপদেশ দিলেন পূর্ণবিশ্রাম গ্রহণ করার জন্য, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ 'হ্যাঁ, এতদিন পরে ঠিক-ঠিক বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দিলেন আমায় করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁর কল্যাণময়ী ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' অবশ্য এ'সকল কথারও কিছু কিছু আলোচনা করেছি পূর্বে।

অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও বিশ্রাম তাঁর জীবনে ছিল খুব অল্পই। বাকী সারা দু'টি বৎসর,—এমন কি শরীর যাওয়ার পূর্বদিন-পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি সকলের নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য ক'রেও। এই সম্বন্ধে কেউ পীড়াপীড়ি করলে তিনি বলতেন ঃ 'বাবা, এ শরীরটা তো একদিন যাবেই। এখন এই ভাঙা-শরীর দিয়েও যদি কারু কিছু উপকার করতে পারি তো শরীর ধারণ করা আমার সার্থক হবে।'

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলতেন ঃ *'Be the instrument in the hand of the Almighty'* (সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের হাতের যন্ত্ররূপে সর্বদা থাক্‌বে); কিংবা বলতেন ঃ *'Be the playground of the Almighty.'* (নিজেকে সর্বশক্তিমান ভগবানের লীলাভূমিতে পরিণত করো)। কিন্তু ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র বা ঈশ্বরের লীলাভূমি হওয়া কি সাধারণ কথা! কত সাধনা ও কত পুণ্যকর্মের ফল থাক্‌লে তবে নিজের কর্তৃত্বাভিমান দূর করা যায়। অভিমান দূর হ'লে তবেই মানুষ নিজের ব্যষ্টি-ইচ্ছা ভগবানের বিরাট-সমষ্টি ইচ্ছার কাছে বলি দিতে পারে, আর তখনই হৃদয়ে আসে যথার্থ-আত্মসমর্পণের ভাব। তখনই মানুষ হয় ঠিক-ঠিক-ভাবে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রস্বরূপ। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাই বলতেন ঃ 'নিজের এতটুকু কর্তৃত্বাভিমান, ভোগের স্পৃহা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লালসা-থাক্‌লে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা মানুষের ভাগ্যে হয় না। তাই যতক্ষণ না মানুষ নিজের অহম্ বা অহংকারকে বলিদান দিচ্ছে ঈশ্বরের

সমষ্টি-ইচ্ছার কাছে, যতক্ষণ না মানুষ নিজের পার্থিব শরীরকে ভগবানের লীলাভূমিতে পরিণত করছে, ততক্ষণ ঈশ্বর অতিনিকটে হ'য়েও অতিদূরে থাকেন। দিব্যচেতনার বিকাশ হ'লে তবেই মানুষ তার আত্মাকে অনুভব করতে পারে, আর তখনই হয় মুক্তি তার করতলগত।'

এই কথাগুলির প্রত্যক্ষ রূপও দেখেছি আমরা স্বামীজী মহারাজের মধ্যে দিনের পর দিন। যে'কোন কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যাক্ না কেন, তার উত্তরে তিনি বলতেন ঃ 'শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় যা হয়—তাই হবে, আমি কিছু জানি না বাপু। শ্রীশ্রীঠাকুর করান তো নিশ্চয়ই হবে।'

দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পক্ষপাতী থাক্‌লেও ঐসকল বিষয়ে স্বামীজী মহারাজের ছিল অত্যন্ত কড়াকড়ি নিয়ম। আমেরিকা থেকে ফেরার পর বেলুড় মঠে তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করেন। অনেকে তখন অনুরোধ জানাতেন তাঁর কাছে দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। তিনি কিন্তু স্থিরভাবে বলতেন ঃ 'রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কাছে যাও, অধ্যাত্ম-অনুভূতির তিনি অতলস্পর্শী সাগর।' রাজা মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের মহাসমাধির (১০ই এপ্রিল, ১৯২২) পর দীক্ষাপ্রার্থীদের তিনি বলতেন ঃ 'মহাপুরুষ মহারাজের (স্বামী শিবানন্দ) কাছে যাও, তিনি দীক্ষা দেবেন। তিনি মঠ ও মিশনের সভাপতি ও তাঁর কাছেই দীক্ষা নেওয়া উচিত।' তবে অনেক অনুরোধের পর গোড়ার দিকে তিনি দু'চারজনকে মাত্র সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য দিয়েছিলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে তিনি দু'জনকে মাত্র সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন।[৩] কলকাতায় ও দার্জিলিঙে যখন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তখনও দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস-দানসম্বন্ধে একেরকমেরই ছিল কড়াকড়ি নিয়ম। কেউ দীক্ষা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে সস্নেহে বলতেন ঃ 'শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ কর। তিনিই সব ক'রে দেবেন।' জীবনের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজনকে তিনি সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য ও অনেককে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তবে সকলের বেলায়ই ছিল কিন্তু ঐ একই রকমের নিয়ম। অনেকে তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখে দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য নেবার কথা বলতে সাহসীই হতেন না। স্বামীজী মহারাজের কানে সে'কথা গেলে বল্‌তেন ঃ 'ও, তাই নাকি, আমি গম্ভীর ব'লে লোকে আমার কাছে আস্‌তে ভয় করে? তা' খিল খিল ক'রে আর হাসি কাঁহাতক বলো।' এই ব'লে স্বামীজী মহারাজ সরল বালকের মতো উচ্চহাস্য ক'রে উঠ্‌তেন।

৩। স্বামী স্থিরানন্দ ও স্বামী রীতানন্দ।

একেবারে শেষের দিকে তাঁর জীবনযাপনপ্রণালী ছিল সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস কোনটার বিষয়েই আর কোন কড়াকাড়ি নিয়ম ছিল না। দীক্ষার প্রসঙ্গে তাঁর কথাগুলি ছিল অপূর্ব রকমের। তিনি বলতেন ঃ 'দীক্ষা দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু দীক্ষা দেবো অর্থে কারু দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে আমি রাজী নই। শ্রীশ্রীঠাকুরই সকলের গুরু ইষ্ট ও মালিক আসলে। তিনিই সকলের পারের কর্ণধার। আমি দীক্ষা দেই কিরকম জানো? —শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র নাম শুনিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতেই দীক্ষার্থীকে সঁপে দেই। ভালো বা মন্দ তিনিই সব দেখুন বা বুঝুন, আমার কি আর বলো! দীক্ষা দেওয়ার পর আমি কিন্তু সকলের জন্য বসে জপ করতে কোনদিনই পার্‌বো না। আমার কাজ হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে সঁপে দেওয়া। আমি উপলক্ষ মাত্র, শ্রীশ্রীঠাকুরই সকলকে পার করার মালিক।'

আমরা শুনে বিস্মিত হতাম ও ভাব্‌তাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে সঁপে দেওয়াও কি অতিসহজ কাজ এবং সঁপে দিলেই বা তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) শিষ্যের সকল-কিছু ভার নেবেন একথা যিনি জোর ক'রে বলতে পারেন, তিনিওতো সাধারণ মানুষ নন! সহজ (সাধনসিদ্ধ) মানুষ না হ'লে সহজকে (ভগবানকে) কেউ ঠিকঠিক বুঝ্‌তে ও বুঝিয়ে দিতে পারে না। আসলে সহজকে যিনি বুঝেছেন, তিনিও সহজ-মানুষ। বাউলরা 'সহজ' বা সহজ-মানুষকেও সাধনসিদ্ধ মুক্তপুরুষ বলে। বাউলদের ঈশ্বর বা ভগবানের অপর নাম 'সহজ'। স্বামীজী মহারাজ ছিলেন সেই সহজশ্রেণীরই মানুষ। তাই তাঁর অভয়-আশ্বাসের বাণী শুনে আমাদের হৃদয়ে জ্বলন্ত বিশ্বাসের ভাব জেগে উঠ্‌তো ও শ্রদ্ধায় অবনত হ'ত আমাদের মস্তক।

তাঁর দীক্ষাদানের কথায় একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে এখানে। দীক্ষাদেওয়ার পূর্বে দীক্ষার্থীকে তিনি বলতেন ঃ 'একথা সত্য যে, তিনিই (শ্রীভগবানই) তোমাদের গুরু, তিনিই আসলে তোমাদের সকলের ইষ্ট (ইষ্টদেবতা)। গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্র তিনটি এক ও অভিন্নই। গুরুতে তাই কখনও মনুষ্য-বুদ্ধি করতে নাই। দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাচক্রের কিছু উপরে দ্বাদশদলবিশিষ্ট গুরুর আসন আছে এবং সেই আসনে শুভ্র-জ্যোতির্ময়মূর্তি-গুরুকে ধ্যান কর্‌বে। তিনি জ্ঞানময়। বিশুদ্ধসত্ত্বের সত্ত্ব বা প্রকাশ ব'লে তিনি শুভ্র ও জ্যোতির্ময়। তিনি তোমার ভুত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল-কিছুই জানেন। তাঁর কল্যাণময় হস্ত তোমার দিকে সর্বদাই প্রসারিত। মন্ত্রের সঙ্গে গুরুর ও গুরুর সঙ্গে জ্যোতির্ময় ইষ্টের সমন্বয়সাধন কর্‌বে। চিন্তা কর্‌বে মন্ত্র ও ইষ্ট এক ও অভেদ। 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ',—প্রণব বা ওঙ্কার নির্গুণ-ব্রহ্মেরই

বাচক,—অর্থাৎ ব্রহ্মকেই বুঝিয়ে দেয় প্রণব। মন্ত্রও তাই। নাম যেমন নামীকে বুঝায়, শব্দ যেমন অর্থের প্রকাশক, জ্ঞানদাতা গুরুও তেমনই। ইষ্টকে বুঝিয়ে ও জানিয়ে দেন ব'লে গুরু ইষ্ট থেকে ভিন্ন নন। ইষ্টকে জেনেছেন ও অনুভব করেছেন বলেই তিনি গুরু এবং এজন্য তিনি ইষ্টকে দেখাতে পারেন। উপনিষদেও আছে যে, ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্ম থেকে পৃথক নন,—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। তাই ইষ্টবিদ্ বা ব্রহ্মবিদ্ গুরু ইষ্টমূর্তি বা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। গুরুর প্রণামমন্ত্রে আছে ঃ 'অজ্ঞান-অন্ধকার দূর ক'রে যিনি জ্ঞানের অঞ্জন চোখে পরিয়ে দেন এবং শিষ্যের জ্ঞাননেত্র যিনি খুলে দেন, তিনিই গুরু। শ্রীশ্রীঠাকুর বল্‌তেন, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান এ'তিনই এক ও অভিন্ন। মন্ত্র, গুরু এবং ইষ্টও তাই। এটাই সর্বদা মনে রাখ্‌বে। এই ভাবকে সর্বদা উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। গুরুর প্রয়োজন কেবল সেজন্য। গুরুই ভবসাগর-পারের উপায় ব'লে দেন, কেননা তিনি পারের দিশা জানেন।'

স্বামীজী মহারাজ বল্‌তেন ঃ 'ইষ্ট (ইষ্টদেব) কি রকম জানো?—যেন একটি ডায়নামো (Dynamo), আর তোমরা সকলে এক-একটি বাল্‌ব (bulb—আলো)। ডায়নামো থেকে ইলেক্‌ট্রিক-কারেণ্ট (বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ) তারের মধ্যে দিয়ে বাল্‌বে যায়, আর তাতেই বাল্ব্ বা আলো জ্বলে। সুইচের সাহায্যে তাকে জ্বালা ও নিভানো যায়। গুরুর কাজ হ'ল ঐ সুইচ্‌টা টিপে আলো জ্বেলে দেওয়া, নইলে ইলেকট্রিক-কারেন্ট তো সর্বদাই বইছে। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলতেন ঃ 'কৃপা-বাতাস বইছে, পাল তুলে দাও।' ভগবান অন্তরাত্মা,—তিনি জ্ঞানরূপে সকলের অন্তরেই বিরাজিত, কেবল অজ্ঞান থাকার জন্য মানুষ তাঁকে জান্‌তে পারে না। গুরুর কাজ ঐ অজ্ঞানকে সরিয়ে দেওয়া। গুরু বিচারের জাগপ্রদীপ শিষ্যের হৃদয়-মন্দিরে জ্বেলে দেন। শিষ্যের মধ্যে বিবেক-বিচারের আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লে তবেই অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়। তখন জ্ঞান আপ্‌না হতেই প্রকাশ পায়। প্রকাশ তো আছেই, তবে সেই প্রকাশসম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া চাই, আর এই জ্ঞান হওয়ার নামই মুক্তি। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রে অধ্যাসভাষ্যে বলেছেন—ব্রহ্ম স্বতঃপ্রকাশ। তবে অজ্ঞানে সেই প্রকাশ আবৃত বা ঢাকা রয়েছে, তাই অজ্ঞান দূর করতে হয়। মুক্তি জ্ঞান থেকে ভিন্ন জিনিস নয়। গুরু সহায়ক হন কেবল ঐ মুক্তিলাভের পথকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। তিনি আলোর সুইচটা টিপে দেন, আর অম্‌নি দপ্ ক'রে আলো জ্বলে ওঠে।'

কোন-কিছুর সম্বন্ধে কানে শোনা, তাকে চোখে দেখা ও তাকে ঠিক ঠিকভাবে বোঝা বা অনুভব করা এই তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু—এ'কথা স্বামী

অভেদানন্দ মহারাজ বল্‌তেন। গ্রন্থে পড়ায় বা কানে শোনায় মনে কোন-কিছুর একটা ধারণা বা সংস্কার সৃষ্টি হয় সত্য, কিন্তু সেটা প্রথমে অস্পষ্ট থাকে, কোন স্পষ্ট ধারণা হয় না। স্বামীজী মহারাজ বলতেন ঃ 'চোখে দেখ্‌লে প্রত্যক্ষ ধারণা হয়, কিন্তু তাতেও সত্যকারের জ্ঞান হয় না। ঠিক ঠিক জ্ঞান হয় প্রাণ দিয়ে বুঝ্‌লে বা অনুভব করলে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন—বোধে বোধ। একটা মানুষের সম্বন্ধে শুন্‌লে বা তাকে চাক্ষুষ দেখ্‌লেই লোকটার মন-মেজাজ, স্বভাব-চরিত্রসম্বন্ধে ঠিকঠিক জানা যায় না, তাই তার সঙ্গে আলাপ করতে হয়, দিনের পর দিন তার সঙ্গে মিশ্‌তে হয়, তার সকল-কিছু জান্‌তে হয়, তবেই যথার্থভাবে বোঝা যায় লোকটার স্বরূপ কি। ঈশ্বরানুভূতিও তাই। শুধু শাস্ত্রে পড়্‌লে বা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা শুন্‌লে হয় না, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা চাই, তাঁর স্বরূপ-সম্বন্ধে যথার্থভাবে জ্ঞান লাভ করা চাই, তবেই তাঁকে তত্ত্বত অনুভব করা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় আছে ঃ 'একজন দুধের কথা শুনেছে, একজন দুধ দেখেছে, আর একজন দুধ খেয়েছে—এই তিনজনের ভিতর যে দুধ খেয়েছে, সেই বল্‌তে পারে দুধ জিনিসটা কি রকম। দুধের কথা যে শুনেছে সে অজ্ঞানী, দুধ যে দেখেছে সে জ্ঞানী ও দুধ যে খেয়েছে সে বিজ্ঞানী।' বিজ্ঞানী কিনা বিশেষজ্ঞানী। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ব্যষ্টিজ্ঞান লাভ করলে জ্ঞানী, আর 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সমষ্টিজ্ঞান লাভ করলে বিজ্ঞানী। আসলে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীতে সত্যকারের কোন ভেদ নাই, একটা বিশেষ ও আর-একটা অংশত বা সামান্য। সাধারণ দৃষ্টিতে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী পৃথক, কিন্তু যে একবার 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-জ্ঞান লাভ ক'রে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে সেই আবার 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' আপনা-হ্‌তেই অনুভব করে। জ্ঞান হলেই জ্ঞানী দেখে 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্',—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মরসে জরে আছে। সে-ই বিজ্ঞানী কিনা বিশেষজ্ঞানী। আসলে জ্ঞানী যে, বিজ্ঞানীও সেই। কাশীর কথা গ্রন্থে পড়া, নিজে গিয়ে কাশী দেখা, আর কাশীতে থেকে তার সব-কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। এই তিনটের জ্ঞান আপাতত পৃথক বৈকি। অধ্যাত্মজগতের কথাও তাই। আত্মসাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরানুভূতি-ছাড়া ধর্মের ও সাধনজগতের আসল তত্ত্ব কিছু জানা যায় না, আর তত্ত্বের সমাধান না হলে সংসারে মানুষ মায়ানির্মুক্ত হ'তে পারে না। তাই প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎকার অনুভূতিবিশেষ। ইংরেজীতে একে বলে *feeling* বা *experience,* কিন্তু আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরানুভূতির এগুলি উপযুক্ত পরিভাষা নয়, বরং *realization* বা *God-realization* বা *God-consciousness* বল্লে যথার্থ-অনুভূতির কিছুটা অর্থ প্রকাশ পায়। 'জ্ঞান'-কে ইংরাজীতে আমরা *knowledge,* 'প্রজ্ঞা' বা 'সম্বিৎ'-কে *consciousness* ও

'চৈতন্য'-কে *intelligence* বলি, কিন্তু সত্যই কি জ্ঞান প্রজ্ঞা ও চৈতন্যের এগুলি ঠিকঠিক ইংরাজী পরিভাষা বা প্রতিশব্দ?'

আমরা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ঃ 'মহারাজ, পার্থিবভাবে ও অপার্থিবভাবে জ্ঞান তো দু'রকম। অপার্থিব জ্ঞানের নাম অদ্বিতীয়-জ্ঞান। এই অদ্বিতীয়-জ্ঞানই কি সর্বব্যাপক-ব্রহ্মজ্ঞান?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'হ্যাঁ, সাধারণভাবে প্রশ্নটা ঠিকভাবেই জিজ্ঞাসা করেছ। অদ্বিতীয়-জ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান, সর্বব্যাপক-জ্ঞান, অখণ্ডজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান—এ' সকলই এক পর্যায়ের জ্ঞান। দর্শনের ভাষায় এদেরকে বলে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, সবিকল্প ও নির্বিকল্প, বা সবিশেষ ও নির্বিশেষ-জ্ঞান। আসলে জ্ঞান একটাই, বিষয়ভেদে জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়। আচার্য শঙ্করের মতে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই changeless ও permanent (অবিকৃত ও নিত্য) জ্ঞান। আবার ঐ একই জ্ঞানের বহির্বিকাশ জাগতিক সকল রকম জ্ঞান।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, আচার্য শঙ্কর কি পরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করেছেন?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'করেছেন বৈকি। তিনি বলেছেন যে, বাহ্যবস্তুরও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় এবং তাই তার সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তা' পারমার্থিক নয়। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যথার্থজ্ঞান হ'লে ব্যবহারিক জ্ঞানও থাকে, তবে তখন তা' ব্রহ্মসংস্কৃত জ্ঞান হয়। যতদিন না ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হয়, ততদিন ব্যবহারিক-জ্ঞানকে নিত্য ও সত্য ব'লে মনে হয়, ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি হ'লে ব্রহ্মসত্য, জগন্মিথ্যা—এই জ্ঞান হয়।'

আমরা ঃ 'ব্যবহারিক ও পারমার্থিক-জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'পারমার্থিক-জ্ঞানে subject (জ্ঞাতা বা বিষয়ী), object (জ্ঞেয় বা বিষয়) ও relation (সম্বন্ধজ্ঞান) এই তিনটির কোনটাই থাকে না, কিন্তু ব্যবহারিক-জ্ঞানে ঐসকল কিছুই থাকে। আসলে জ্ঞান অখণ্ড ও একটাই। এই এক জ্ঞানই subject, object ও relation (জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও সম্বন্ধজ্ঞান) এই তিন রকমভাবে প্রকাশ পায়। Relation (সম্বন্ধ) থাক্‌লে জ্ঞান limited (পরিচ্ছিন্ন) হয়। আচার্য শঙ্কর তাই ব্রহ্মজ্ঞানে কোন relation বা সম্বন্ধ স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, সম্বন্ধ বা relation থাক্‌লেই জ্ঞান কখনো পারমার্থিক হয় না। তাই তিনি নৈয়ায়িকদের সমবায়সম্বন্ধকে অস্বীকার করেছেন। সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করলে দু'টো বা অনেকগুলো জিনিসের সত্যতা স্বীকার করতে হয়। আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করপন্থীরা তাই বলেন যে, যদি একান্তপক্ষে সম্বন্ধ স্বীকার করতেই হয় তবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ (relation of identity) ভাল। তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ও স্বরূপসম্বন্ধ এককথা। শঙ্কর বলেন যে,

object বা predicate (বিষয়) subject-এরই (বিষয়ীরই) concrete expression (চাক্ষুষ বিকাশ)। আসলে শঙ্কর কিন্তু subject ও object-এর (বিষয়ী ও বিষয়ের) মধ্যে কোন relation (সম্বন্ধ) স্বীকার করেন নি, কারণ relation-ও (সম্বন্ধও) পরিচ্ছিন্ন উপাধি (limiting adjunct) এবং তা' অখণ্ড বস্তু বা জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করে। দুই বা তার অধিক বস্তু থাক্‌লে তবেই সম্বন্ধের প্রয়োজন হয়, কিন্তু যেখানে একটাই মাত্র বস্তু ও অদ্বিতীয় জ্ঞান, সেখানে কে কার সঙ্গে আর সম্বন্ধ পাতাবে বলো? বৃহদারণ্যক-উপনিষদে আছে ঃ তখন 'কেন কং পশ্যেৎ',—কে কাকে দেখ্‌বে।

'তাই শুদ্ধজ্ঞানে subject, object ও relation (বিষয়, বিষয়ী ও সম্বন্ধ) কোনটাই থাক্‌তে পারে না। Subject-কে (বিষয়ীকে) অপেক্ষা ক'রেই তো object (বিষয়)। অপেক্ষা করার অর্থ object is related to subject (বিষয় বিষয়ীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত)। এই সম্বন্ধই limitation (পরিচ্ছিন্নতা) কিনা 'মায়া'। সম্বন্ধ ক্যাটিগরি বা বিশেষণ, সুতরাং বিশেষণে বস্তুকে limit বা সীমিত করা হয়। এজন্য ব্রহ্ম নির্বিশেষ, কোন গুণেরই তাঁতে আরোপ হয় না।

'রামানুজ শঙ্করের মতবাদ স্বীকার করেন নি। রামানুজের মতে সৃষ্টি, জীব ও ঈশ্বর এই তিনই নিত্য। সে'জন্যই তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। রামানুজ বলেন যে, বিষয়ের সত্তা বা অস্তিত্ব চিরদিন থাকে, বিষয়ীও নিত্য, আর বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাও নিত্য। রামানুজের মতে ঈশ্বরই সৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাই ব'লে শক্তি কোনদিনই limited (সীমাবদ্ধ) হয় না। ঈশ্বরের শক্তি অপরিসীম ও অনন্ত, সুতরাং ঈশ্বর অপরিণামী ও নিত্য। ঈশ্বর স্বয়ংপূর্ণ। ঈশ্বর জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বল, বীর্য ও সকল মাধুর্যের আকর এবং তাই ভগবান। অদ্বৈতবাদীরাও ঈশ্বর স্বীকার করেন। ঈশ্বরকে তাঁরা সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলেন, কিন্তু সেই ঈশ্বর মায়ানির্মুক্ত শুদ্ধব্রহ্ম নন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, সৃষ্টিকে অপেক্ষা ক'রেই স্রষ্টা ঈশ্বর, কিন্তু সৃষ্টি যখন মিথ্যা অর্থাৎ পরিবর্তনশীল ও অনিত্য, তখন অনিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত স্রষ্টা ঈশ্বরও পারমার্থিক ও নিত্য নন।[৪] শঙ্করের মতে

৪। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর 'ট্রু-সাইকোলজি'-গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন ঃ (a) '** but that which is unconditioned, is beyond the relative and the Absolute. Take, for instance, the conception of a Creator. Can He be the Absolute ? No, He is relative. Because a Creator requires to be related to the creation. If the creation is taken away from Him, He is no longer the Creator. It is a name. A name is related to the created object, and that relation makes

ব্যাস 'ন প্রয়োজনবত্তাৎ' (২।১।৩২)-সূত্রে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব খণ্ডন করেছেন।

'তাছাড়া অদ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বর দু'টি ঃ একটি মায়াধীশ বা অব্যক্ত-ঈশ্বর ও অপরটি মায়াধীন বা ব্যক্ত-ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ। অব্যক্তে মায়া ঈশ্বরের উপাধিরূপে থাকে, তখন সৃষ্টি থাকে না, কিন্তু সৃষ্টির ইচ্ছা ও উন্মুখতা বীজাকারে ঈশ্বরে থাকে। কিন্তু কার্য-ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভে মায়া ক্রিয়াশীল, সুতরাং সেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়, কিন্তু কারণব্রহ্মে বা ঈশ্বরে সৃষ্টি অব্যক্ত। সৃষ্টির বা জগতের ঈশ্বর বা স্রষ্টা যিনি, তিনি হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা। বিরাটে সৃষ্টি স্থূলভাবে প্রকাশ পায়। বেদান্তে অব্যক্ত-ঈশ্বরকে কারণব্রহ্ম ও হিরণ্যগর্ভকে বলে কার্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ-প্রজাপতি কেননা কারণব্রহ্ম ঈশ্বর মায়াধীশ। কিন্তু শঙ্করের মতে নিরুপাধিক মায়ানির্মুক্ত নির্বিশেষ-ব্রহ্ম কোন-কিছুরই কারণ নন, কার্যও নন। কারণ ও কার্য উপাধি বা গুণ। এই উপাধি বা গুণ শুদ্ধব্রহ্মে অজ্ঞানের জন্য আমরা আরোপ করি। উপাধি বা গুণ অজ্ঞান বা অজ্ঞানজাত বস্তু। আরোপ কিনা সত্য নয়—অনিত্য, আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু তাই ব'লে মায়া তুচ্ছ নয়, কেননা মায়ারও একটি আপেক্ষিক-সত্তা আছে ঃ

a Creator what He is. So the Creator of the universe. God, is not the absolute being, or *Brahman.* He is a part of the phenomena. and, therefore, He is the first-born Lord of the universe. He is the first manifestation of the Absolute. The Absolute, as if, projects out of its own body the first-born or *Isvara,* projects this cosmic consciousness, or the cosmic ego, which becomes the Creator, the *prime-mover* of the evolution. And matter again comes out of the same Absolute.'—*True Psychology* (1954), pp, 196-97.

(b) 'So, personal God is not the Absolute. It is a phase, or the expression of the absolute expression, through the force of nature, and that expression will last so long as the objects to which that expression is related, will last. So, if the phenomenal world would vanish, there would be no more necessity of a Creator or a personal God. Therefore, the monistic thinkers, who are sincere and earnest seekers after the Absolute, do not stop in dualism, do not stop in qualified non-dualism, but they want to go deeper and still further, which is beyond all changes and beyond all relations.'—*True Psychology,* pp. 197-98.

'যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি'। সগুণ ও নির্গুণ, ঔপাধিক ও নিরুপাধিক শব্দগুলি তাই কল্পিত উপাধি বিশেষ।

'শঙ্করের সঙ্গে রামানুজের মতের এখানেই পার্থক্য। শঙ্কর নির্বিশেষ অর্থাৎ সকল বিশেষণ বা উপাধিহীন অনুভূতিস্বরূপ শুদ্ধজ্ঞান (ব্রহ্ম) ছাড়া অন্য-কিছুকেই নিত্য বলেন না, কিন্তু রামানুজ নিত্য ও লীলা—স্রষ্টা ও সৃষ্টি দু'রকমই স্বীকার করেন এবং দুটিকেই নিত্য বা সত্য বলেন। রামানুজের সৎ-এ বা জ্ঞানে subject ও object (বিষয়ী ও বিষয়) দুই থাকে। রামানুজের মতে, নিরুপাধিক ও নির্বিশেষ-জ্ঞানের কোন সত্তা বা অস্তিত্ব নেই, সার্থকতাও নেই। আসলে তাই কর্তা বা বিষয়ীরই জ্ঞান হয়। কিন্তু এই জ্ঞান বিষয়ী থেকে ভিন্ন। বিষয়ও বিষয়ী ও জ্ঞান থেকে ভিন্ন। সেজন্য বিষয়ীর কাছে বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয়। Subject (বিষয়ী) না থাক্‌লে object-এর (বিষয়ের) জ্ঞান করবে কে, আর object (বিষয়) না থাক্‌লে জ্ঞানই বা হবে কোন্ জিনিষের। নিরুপাধিক-জ্ঞানই নির্বিকল্পক-জ্ঞান। রামানুজের মতে নিরুপাধিক-নির্বিকল্পক-জ্ঞানের কোন প্রামাণ্য নেই, অর্থও নেই।'[৫]

স্বামীজী মহারাজ পুনরায় বল্লেন ঃ 'রামানুজ তাই সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক দু'রকমই জ্ঞানই স্বীকার করেছেন। তাই শঙ্করের সঙ্গে রামানুজের মতের পার্থক্য হ'ল ঃ শঙ্কর নির্বিকল্পক-জ্ঞানকে নির্বিশেষ অর্থাৎ subject-object (বিষয়ী-বিষয়) উপাধিশূন্য বলেছেন, আর রামানুজের মতে নির্বিকল্পক-জ্ঞানেও subject-object (বিষয়ী -বিষয়) থাকে, কেননা subject ও object (বিষয়ী ও বিষয়) না থাক্‌লে নিরুপাধিক-জ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা অনুভব হয় না।'[৬] রামানুজ বলেছেন যে, জ্ঞান তখনই হয়, যখন তার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ও সত্তার নিশ্চয়তা থাকে, সুতরাং তাঁর মতে নির্বিকল্পক-জ্ঞানেরও নির্দিষ্ট একটি আকার বা বিষয় থাকে,—যদিও সেই জ্ঞানের আকারে কিছুটা ভেদ থাক্‌তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে সেই জ্ঞান সর্বভেদ-শূন্য নয়, কারণ সর্বভেদশূন্য-

৫। আচার্য রামানুজ তাঁর ভাষ্যে বলেছেন ঃ 'নির্বিশেষবস্তুবাদিভিঃ নির্বিশেষে বস্তুনি ইদম প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম ; সবিশেষবস্তুবিষয়কত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্।' নির্বিশেষ ও নির্গুণ-ব্রহ্মবস্তু সকল প্রমাণের অতীত, সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অনুপলব্ধি প্রমাণগুলি নির্বিশেষ-ব্রহ্মে প্রযোজ্য নয়।

৬। রামানুজের ভাষ্যে আছে ঃ 'নির্বিকল্পকমপি সবিশেষবিষয়মেব, সবিকল্পকে স্বস্মিন্ননুভূতপদার্থ-প্রতিসন্ধানহেতুত্বাৎ।'

নিরুপাধিক-জ্ঞানের কোনদিন প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয় না।[৭]

'শঙ্কর কিন্তু এ'কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, নির্বিকল্পক-জ্ঞান স্বসংবেদ্য, তাই তা' অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নয়। অর্থাৎ নির্বিকল্পক-জ্ঞানকে জানার জন্য অন্য-কোন প্রমাণের দরকার নেই। ব্রহ্মজ্ঞানও তাই; আসলে অনুভূতিই ব্রহ্মের স্বরূপ। শঙ্করের নিজের কথায় বলতে গেলে বলা যায়—'অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য'। ভক্তিসূত্রে ভক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নারদও বলেছেন যে, ভক্তির স্বরূপ মূক বা বোবার আস্বাদনের মতো। আস্বাদন অর্থাৎ নিজের অনুভূতি। নারদ বলেছেন ঃ 'মূকাস্বাদনবৎ'। মূক বা বোবা কথা বলতে পারে না, কিন্তু কিছু খেলে তার আস্বাদন কি ধরণের তা' সে ভালভাবে জানে। ব্রহ্মজ্ঞানও তেম্‌নি। যিনি অনুভব করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের কি যথার্থস্বরূপ তা বুঝ্‌তে পারেন। তাই ব্রহ্ম বোধে বোধস্বরূপ, কিন্তু অপরকে তা' বোঝানো যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত,—'অবাঙ্‌মনসগোচরম্'। ব্রহ্মজ্ঞান মন-বুদ্ধির অগোচর। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় অজ্ঞানের পরিণতি। তাই অন্ধকার দিয়ে যেমন আলোককে প্রকাশ করা যায় না, তেম্‌নি অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রকাশ করা যায় না। অজ্ঞানের নাশই জ্ঞান কিনা প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান। অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মজ্ঞানকে সর্বদা প্রাপ্ত ও সিদ্ধ বস্তু বলেন (an accomplished fact)। আচার্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যে বলেছেন—ব্রহ্ম বস্তুতন্ত্র। তাই কোন কার্য দিয়ে ব্রহ্মকে জানা বা লাভ করা যায় না। অনেকে বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান সাধনালব্ধ, অর্থাৎ সাধনার ফলরূপে ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায়। কিন্তু এটা ভুল। ব্রহ্মজ্ঞান কোন সাধনালব্ধ ফল নয়। ব্রহ্ম চিরদিনই আছে ও থাক্‌বে, তবে অজ্ঞানের জন্য ব্রহ্মকে জান্‌তে পারছো না এই যা! তুমি যে সত্য-শিব-সুন্দর এটা নিজের দেহের উপর মায়া-মমতা আছে ব'লেই জান্‌তে পার্‌ছো না। এই মায়া-মমতার নামই অজ্ঞান। শরীরের উপর থেকে মায়া ও মমতা সরে গেলেই তোমার নিজের স্বরূপ তখন উপলব্ধি করতে পারবে। ব্রহ্ম নিজের মহিমায় মহিমময়,—'সে মহিম্নি'। সেই মহিমাকে আর অন্য-কোন্ জিনিস দিয়ে জান্‌বে বলো! প্রদীপ দিয়ে তো আর সূর্যকে প্রকাশ করা যায় না, কেননা সূর্য নিজেই চিরপ্রকাশমান। তাই মায়ার আবরণ দূর করার নাম ব্রহ্মজ্ঞান।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, জ্ঞান নিয়ে কি অন্যান্য দেশেও এ'রকম মতভেদ

৭। রামানুজ-ভাষ্য ঃ 'নির্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণং ন সর্ব-বিশেষরাহিত্যস্য ; তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাদ্ অনুপপত্তেশ্চ।'

আছে?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'আছে বৈকি। এই সব নিয়ে দ্বন্দ্ব এদেশে যেমন, ওদেশে পাশ্চাত্য-দার্শনিকদের ভিতরও তেম্‌নি। সাধারণ লোক জ্ঞানে অখণ্ডত্ব ও নির্বিশেষ-ভাব উপলব্ধি করতে পারে না। তাছাড়া time, space ও causation-এর (দেশ, কাল ও নিমিত্তের) জগতে বাস ক'রে মানুষ সহজে ব্রহ্মের অসীমত্ব ও নির্বিশেষ-ভাব কল্পনা করতে পারে না। শঙ্কর বলেছেন—দেশ, কাল ও নিমিত্তই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।[৮] দেশ, কাল ও নিমিত্তই মায়া, অজ্ঞান বা অবিদ্যা।[৯] মায়ার জন্য আমরা আমাদের স্বরূপ বুঝ্‌তে পারি না। অধ্যাসপ্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর এ'কথাই বলেছেন। অধ্যাসভাষ্য শঙ্করের একটি বিশিষ্ট অবদান ভারতীয় দর্শনের জগতে। তিনি মায়ার definition (ব্যাখ্যা) দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিঃ',—অর্থাৎ যেটা যা নয়, তাকে তাই ব'লে মনে করার নাম অধ্যাস কিনা মায়া বা ভ্রম। দেহ আত্মা নয়, কিন্তু দেহকেই আত্মা ব'লে আমরা মনে করি ও ভ্রম করি। ভ্রম কিনা ভুলজ্ঞান,—false knowledge. দেহের জরা ও মৃত্যু আছে, কিন্তু দেহের জরা, মৃত্যু প্রভৃতিকে আমরা আত্মার উপর আরোপ করি ও দেহটাকেই নিত্য ব'লে মনে করি। এই মনে করাটাই মায়া বা ভ্রম। অন্ধকাররাত্রে একটা কাঠের গুঁড়ি বা থামকে দেখে যেমন ভূত (অপদেবতা) ব'লে ভ্রম করি, কিংবা একটা দড়িকে হঠাৎ দেখে সাপ ব'লে যেমন ভুল করি, তেম্‌নি দেহকে ভুল ক'রে আমরা শাশ্বত আত্মা ব'লে মনে করি। আসলে কাঠের গুঁড়ি বা থামটা ভূত নয়, দড়িটা সাপ নয় ও মরণশীল দেহটা শাশ্বত বা নিত্য আত্মা নয়। এই সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর বিশেষভাবে রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণ দিয়েছেন। জগৎকে ভুলে নিত্য ও শাশ্বতরূপে চিন্তা করার এটি উদাহরণ। ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রমই মায়া। ব্রহ্মে জীববুদ্ধিই মায়া। জীবে আত্মাবুদ্ধিই মায়া। মায়া বা ভ্রম তখনই দূর (নষ্ট) হয়, যখন 'জীবই ব্রহ্ম' এই উপলব্ধি হয়। বিদ্যারণ্য মুনি পঞ্চদশীতে বলেছেন—

৮। 'প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গ যতঃ'—প্রভৃতি।

৯। মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে অনেকে পার্থক্য স্বীকার করেন। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির মতে ঈশ্বরে যে অজ্ঞান থাকে তার নাম 'মায়া' ও জীবে বা মানুষে যে অজ্ঞান থাকে তার নাম 'অবিদ্যা'। কিন্তু আচার্য শঙ্কর ও বিবরণমতাবলম্বীরা মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে কোন ভেদ বা পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে, বন্ধন করে বা ভুলিয়ে দেয় ব'লেই মায়া, অজ্ঞান বা অবিদ্যা, সুতরাং এদের মধ্যে কোন ভেদ বা পার্থক্য নাই।

মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নো হীয়তে যথা॥

মানুষ যেমন ঘুম থেকে জাগ্‌লে তার স্বপ্ন দূর হয়, তেম্‌নি সদসদ্‌বিচারের পর শুদ্ধজ্ঞানের প্রকাশ হ'লে অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর (নষ্ট) হয়। অবিদ্যা দূর হওয়ার নামই মুক্তি। আকাশ থেকে যেমন মেঘ সরে গেলে সূর্যের প্রকাশ হয়। মেঘ সরে যাওয়ার নাম সূর্যের উপর আবরণের নাশ।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, জীবনে আত্মজ্ঞান লাভ করা বড়ই কঠিন!'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'হ্যাঁ! ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক বিচার ও সাধনা-ছাড়া আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি করা কঠিন বই কি! কঠিন বল্‌তে একেবারে কঠিন,—সুকঠিন![১০] জীবনে অসংখ্য ভোগের বাসনা থাক্‌বে, আত্মজ্ঞানও লাভ কর্‌বে—এও কি হয়? সাধক রামপ্রসাদের সেই কথা—'বাস্‌নাতে দে আগুন জ্বেলে।' বাস্‌না কিনা বাসনা ও কামনা। 'ন জাতু কাম-কামানাং উপভোগেন শাম্যতি',—ভোগের দ্বারা শান্তি বা নির্বাণ লাভ হয় না। তাই ত্যাগ চাই। ত্যাগ কিনা বাসনা-কামনা-ত্যাগ। সংসারে এই চাই, ওই চাই—কেবল 'দেহি দেহি-রব।' এতে শান্তি হয় না। কামনাই যদি চাও—তবে মুক্তির কামনা করো! নির্বাসনার কামনা করো। তবেই কামনা ও ভোগের পরিবর্তে ত্যাগ ও বৈরাগ্য আস্‌বে,—'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌',—বৈরাগ্যই একমাত্র অভয় ও শান্তি।'

আমরা ঃ 'অসম্ভব ও কঠিন হলেও আত্মজ্ঞান উপলব্ধির উপায় কি?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'উপায় আছে বৈকি। প্রথমে ব্যষ্টিভাবে, তারপর সমষ্টি বা সমগ্রভাবে আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মের উপলব্ধি করতে হয় নিষেধ বা নেতিমুখে বিচার কর্‌তে কর্‌তে। নেতিমুখে বিচার বলতে—টাকা নয়, ধন-ঐশ্বর্য নয়, একমাত্র আত্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানেই শান্তি বা মুক্তির অর্থ অজ্ঞান বা আত্মা-সম্বন্ধে অজ্ঞতা থেকে মুক্তি। অজ্ঞানের আবরণের জন্য যথার্থজ্ঞানের স্বরূপ জান্‌তে পারো না। তাই অজ্ঞান বাধা বা আবরণ। আবরণ আত্মার যথার্থরূপকে আবৃত ক'রে রাখে। আবরণ সরে গেলেই নিরাবরণ, প্রকাশ ও মুক্তি। তোমরা সকলেই চেতন এবং পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ আত্মা, কিন্তু সংসারে ও জীবনে ভোগের আকাঙ্ক্ষার জন্য বুঝ্‌তে পারো না আত্মার স্বরূপ। এই ভোগাকাঙ্ক্ষাই আবরণ বা obstacle. সেজন্য ভোগের পারে যাও, তবেই শান্তি।

'তবে আত্মানুভূতিরও স্তরভেদ আছে—ব্যষ্টিভাবে ও পরে সমষ্টিভাবে। আগে নিজের মধ্যে ও পরে সবার মধ্যে ও সমগ্র বিশ্বসংসারের মধ্যে

১০। 'তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতম্‌...।' কঠ ২।১২

ব্রহ্মানুভূতি। প্রথমে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ নিজের মধ্যে 'আমিই ব্রহ্মস্বরূপ', তারপর 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম',—সমগ্র জগৎ ও বিশ্বচরাচরের যাবতীয় বস্তু ও প্রাণী ব্রহ্মস্বরূপ—এই সার্বিক অনুভূতি। এই অনুভূতিই প্রত্যক্ষ-অনুভূতি বা direct awareness. এই awareness বা প্রত্যক্ষানুভূতির নাম সর্বত্র-এক-সর্বতবিস্তৃত-অখণ্ড-ব্রহ্মচৈতন্যের অনুভূতি। উপনিষৎ তাই ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় দিয়ে বলেছে,—'আকাশবৎ— ব্যোমবৎ—বায়ুবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ'। সর্বত বা সর্বগত অর্থে তিনি (আত্মা বা ব্রহ্ম) বাতাসের মতো কি জড় ও কি চেতন সকল পদার্থ ও প্রাণীর মধ্যে চৈতন্যরূপে—মহাপ্রাণরূপে— পরমজ্ঞানরূপে আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। এই জ্ঞান মহাপ্রাণময় বিরাটচৈতন্য। এই সর্বতবিস্তৃত চৈতন্যের প্রত্যক্ষ-অনুভূতি হয় নিজের মধ্যে ও বিশ্বের সকলের ও সকল-কিছুর মধ্যে ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে। এরই নাম আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। তাই প্রথমে নিজের মধ্যে ব্রহ্মের সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি হয়, তারপর সকলের ও সকল-কিছুর মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়,—'একস্মিন বিজ্ঞাতে সর্ববিজ্ঞাতং ভবতি'। একই ব্রহ্ম ভূতে-ভূতে রূপে-রূপে বিরাজিত। এই এক ও অখণ্ড জ্ঞান, বিজ্ঞান বা মহাচৈতন্যসিন্ধুই আত্মা বা ব্রহ্ম। এর সম্যক্-উপলব্ধির নামই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। আচার্য শঙ্কর, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি এই সর্বতবিস্তৃত ব্রহ্মজ্ঞানকে বলেছেন ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মস্বভাব।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, উপনিষদে ও বেদান্ততে পার্থক্য কি?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'উপনিষদ্‌ই বেদান্ত, আর বাদরায়ণ-ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র, তার উপর শঙ্করের ভাষ্য, কিংবা মধুসূদন সরস্বতীর 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'সিদ্ধান্তবিন্দু' প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তের ভাষ্যগ্রন্থ। কিংবা সদানন্দ-যতি ও অন্যান্য শাস্ত্রকারদের বেদান্তের উপর গ্রন্থ প্রভৃতি হ'ল উপনিষদ্‌রূপ বেদান্তের ব্যাখ্যাবিশেষ-গ্রন্থ। 'বেদান্তসার'-গ্রন্থ বেদান্তের প্রাথমিক গ্রন্থ। বেদান্তসারের গ্রন্থকার সদানন্দ-যতি বলেছেন—

'বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্,
তদুপকারিণী শারীরকসূত্রাদীনি চ।'

এর অর্থ হ'ল—'বেদান্ত কাকে বলে? স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণরূপ উপনিষদের নাম বেদান্ত, আর তদুপকারী বা তার সহায়কগ্রন্থ উত্তরমীমাংসারূপ বাদরায়ণ-ব্যাস-রচিত ব্রহ্মসূত্র ও তার ভাষ্য প্রভৃতি। অধ্যাত্মশাস্ত্রও বেদান্ত নামে পরিচিত। আমি তোমাদের পণ্ডিত মশাইয়ের মতো সব বুঝিয়ে দিলাম।

'আসলে কি জানো?—উপনিষৎ (বা বিভিন্ন উপনিষৎ) সর্বত্যাগী ও

মুক্তিকামী বনচারী ঋষি-মুনিদের উপলব্ধ-সত্য এবং সর্বসাধারণকে বুঝানোর জন্য পরে সেই যথার্থ-উপলব্ধ-সত্যের তত্ত্বগুলিকে একত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। উপনিষৎ অসংখ্য, তবে আচার্য শঙ্কর দশখানি মাত্র উপনিষদের প্রামান্য ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় এই দশখানি উপনিষদে যে তত্ত্বের আলোচনা আছে, আর-আর অন্য উপনিষদে সেই সকল তত্ত্বেরই আলোচনা করা হয়েছে। আরণ্যকের পর উপনিষৎ। আরণ্যকের পূর্বে ঋকাদি সংহিতা। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং অদিতি, ঊষা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীদের সূক্ত বা মন্ত্র আছে। এদের উপর যাস্কের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণরূপ নিরুক্ত। যাস্কের পর দুর্গাচার্য, সায়ণ প্রভৃতি বেদের মন্ত্রের উপর টীকা, ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করেছেন। উপনিষদে অরণ্যবাসী ঋষিদের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির তত্ত্ব বিচিত্রভাবে বর্ণিত ও লিখিত হয়েছে। 'বেদান্ত'-শব্দের অর্থ তাই বেদের অন্ত কিনা যাগযজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানের পরে বা শেষে জ্ঞানবিচারের কথা। জ্ঞানবিচার কিনা আত্মা বা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা ও কথা,—যে তত্ত্বকথাকে জানাই শেষকথা। এজন্যই 'বেদ' কিনা বিদ্-ধাতু জানার বা জ্ঞানের শেষ ও চরমতত্ত্ব। আত্মকথা, আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান বলতে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির জ্ঞান। এখন বুঝ্‌লে বেদান্ত কাকে বলে?'

আমরা ঃ 'হ্যাঁ মহারাজ, উপনিষৎকেই বেদান্ত বলে, আর সব আত্মতত্ত্ববিচারের গ্রন্থ ঐ বেদান্ততত্ত্ব জানাকেই সাহায্য করে।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। 'বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্'। তবে বেদান্ত আবার ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছে, যেমন অদ্বৈতবেদান্ত, দ্বৈতবেদান্ত, বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত, দ্বৈতাদ্বৈতবেদান্ত, শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবেদান্ত প্রভৃতি। বিভিন্ন সাধক ও উপলব্ধ-তত্ত্বসম্বন্ধে জানার জন্য বিচারী-মানুষ তাই একই ব্রহ্মবস্তুকে বিভিন্নভাবে দেখেছে, বিচার করেছে, আবার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেছে। নানা মুনির নানা মত। বৈচিত্র্যে নানান্ মতবাদ ও নানান্ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সৃষ্টি হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে তাই আছে—'একম্ সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'—একই তত্ত্বকে বা ব্রহ্মকে ভিন্নভিন্ন দ্রষ্টা ভিন্নভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করেছে ও বলেছে। আসলে একই বস্তু, একই ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বেদান্তে 'বস্তু' বলা হয়েছে, কেননা ব্রহ্মের একটি বৃহৎ-সত্তা বা অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্ম 'সৎ'-বস্তু। বেদান্ত বলে যে, দেশ ও কালরূপ মায়া থাক্‌লেও ব্রহ্ম তিনকালেই সত্য। অর্থাৎ অজ্ঞানের বা মায়ার জগতে ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক-সৎ বা সত্য, আর সব ব্যবহারিক-সৎ বা সত্য। পারমার্থিক-সৎ বর্তমান, অতীত ও

ভবিষ্যৎ এই তিনকালেই মায়ার জগতে থাকে, আবার মায়ার অতীত কিনা দেশ-কালের অতীত অবস্থায়ও থাকে। বেদান্তে এজন্যই ব্রহ্মকে সর্বগত, আবার সর্বাতীত বলা হয়েছে, বুঝ্‌লে?'

আমরা ঃ 'বুঝ্‌লাম, কিন্তু বড়ই কঠিন।'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'হ্যাঁ, সাধনার বস্তু। ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝ্‌তে অর্থাৎ উপলব্ধি করতে গেলে সাধন-ভজন করতে হয়। এজন্য ত্যাগ ও তপস্যার প্রয়োজন। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে তাই ত্যাগের দ্বারা ভোগের কথা বলা হয়েছে,—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।' গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।' বৈরাগ্য কিনা অনিত্য বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা বা বিরাগ। বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসীরা তাই বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন, অন্যে নয়।'

তারপর প্রসঙ্গ উঠ্‌লো আদর্শের কথা নিয়ে। স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'আদর্শ কিনা—গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কথায় Ideal বা perfect Type। Ideal বা Type নিখুঁত একটি ছাঁচ,—যাতে ফেলে মানুষ জীবন তৈরী করে। প্রত্যেক মানুষই আদর্শরূপে তার চোখের সাম্‌নে একজন মহান্ পুরুষ বা দেবতাকে রাখ্‌তে চায়। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রতিটি মানুষ কোন-না-কোন উন্নত শিল্পী, কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, বীর, জ্ঞানী বা অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী মানুষকে অনুসরণ করে তার জীবন যথার্থভাবে তৈরী করার জন্য। সাধক ভগবানকে আদর্শরূপে অনুসরণ করে। চিন্তায় বা কল্পনায় কোন-না-কোন আদর্শ মানুষকে তাই লোকে জীবনে অনুসরণ ক'রে চলে। প্লেটোর Type বা Ideal-এর অর্থ অবশ্য ভিন্ন। প্লেটো ভারতীয় ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ ছিলেন। হিন্দুদর্শনে সৃষ্টির বীজকে 'প্রকৃতি' বলে। প্রকৃতি যেন একটি বিরাট ভাণ্ডার। মানুষের সমস্ত সংস্কার একীভূত হয় ঐ প্রকৃতিতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রকৃতিকে বলেছেন গিন্নির ন্যাতাকাতার হাঁড়ি। ঐ হাঁড়িতে কুম্‌ড়োর বীজ, ঝিঙের বীজ, লাউয়ের বীজ ও ফল, ফুল ও গাছের বীজ যত্ন ক'রে রাখা থাকে নতুন গাছ তৈরী করার জন্য। পৃথিবীর সকল জিনিসের সংস্কাররূপ বীজ অর্থাৎ Perfect Type সূক্ষ্মাকারে ঐ বিরাট প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চিত থাকে। আসলে প্রকৃতি সমষ্টি-বীজ ও ব্যষ্টি-বীজের আধার। বেদান্তে প্রকৃতিকে অব্যাকৃত বলা হয়েছে,—যার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বীজাকারে সুপ্ত থাকে। সুপ্ত বীজ জাগ্রত হলেই সৃষ্টি। ইংরেজীতে প্রকৃতিকে বলে Cosmic Mind,—যা individual mind-এর সমষ্টি। বাইবেলে নোয়ার (Noa) Ark-ও (নৌকাও) ঐ প্রকৃতিরই প্রতিচ্ছবি। সকল দেশের সকল জাতির

mythology (পুরাকাহিনী) অনুসন্ধান করলে দেখ্‌বে সৃষ্টির কাহিনী সকল দেশে একই ধরনের, তবে প্রকাশে বা ভাষায় হয়তো ভিন্ন ভিন্ন।

'আবার Perfect Type বা Ideal বল্‌তে কোন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবান মানুষকেও বোঝায়,—যার মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, মালিন্য (মায়া) নেই এবং তাতে স্বরূপের পরিপূর্ণ বিকাশ। কথাই তাই যে, ঈশ্বরকেই আমরা সৃষ্টির perfect বিকাশ ব'লে মনে করি। সচরাচর Ideal বা আদর্শ বলতে তাই অবতারকল্প পুরুষ, মহামানব বা ঈশ্বরকে বুঝায়। Who has seen the Son, has seen the Father (যিনি ভগবানের পুত্রকে অর্থে অবতারকে দেখেছেন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন)। আসলে কথা এই যে, যিনি ঈশ্বরের অবতারকে দেখেছেন, তিনি সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর বা ভগবানকেই দেখেছেন। Son (পুত্র) এখানে অবতার ও Father হলেন ঈশ্বর।

'অবতারপুরুষরাও এক-একটি Perfect Type। মুক্তির ও মোক্ষশাস্ত্রের তাঁরাই এক-একজন চাক্ষুষ-প্রমাণ। তাঁদের সাধনাময় জীবনই আমাদের সাম্‌নে দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁদের চেষ্টা অর্থাৎ কাজকর্ম ও সাধন-ভজন সমস্তই লোকশিক্ষার জন্য। শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষাকে বলেছেন 'লোকসংগ্রহ'। এখানে লোকসংগ্রহের অর্থ লোকশিক্ষা। মহাপুরুষ ও অবতারদের জীবন তাই আমাদের কাছে Ideal বা আদর্শ। তাঁদের জীবনের ছাঁচে ফেলে, তাঁদের পবিত্র জীবনের চেষ্টা বা কার্যকে অনুসরণ ক'রে আমাদের জীবনকে তৈরী করতে হয়। সংসারসমুদ্রে তাঁরা যেন ধ্রুবতারা। তাঁদের দিকে আমাদের জীবনের compass (দিকদর্শন-যন্ত্র) নির্দিষ্ট রেখে সংসারসমুদ্রে পাড়ি দিতে হয়, আর তবেই জীবন ঠিক পথে চলে, তবেই কর্মময় সংসারে থেকেও মুক্তি লাভ করা যায়।'

আমরা ঃ 'মহারাজ, অবতার কারা বা কাদের বলে?'

স্বামীজী মহারাজ ঃ 'অবতার কিনা অবতরণ করেন পৃথিবীতে যিনি (যে ঈশ্বর) মানুষের বেশে। স্বয়ং ঈশ্বর মায়াকে আশ্রয় ক'রে মানব অর্থাৎ মহামানবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। যুগে যুগে হয় এই আবির্ভাব। স্বয়ং ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর বা মায়াধীশ, সেজন্য মায়ার বন্ধন তাঁকে বাঁধ্‌তে পারে না। তাই মায়াকে আশ্রয় ক'রে যুগকর্ম-সাধনের জন্য ঈশ্বর মানুষের বেশেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রে বিশ্বের সকল মানুষকে মুক্তির বা পরমশান্তির পথ (উপায়) দেখান। খাঁটিসোনায় অলংকারের গড়ন হয় না, তাই খাঁটিসোনায় কিছু তামার খাদ মেশাতে হয়। এই তামার খাদই মায়া। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরের অবতারপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'থোলো-থোলো রাম, থোলো-থোলো কৃষ্ণ',—তার অর্থ বহু অবতার আসেন যুগকার্য সম্পন্ন করার জন্য।'

'অবতার ঈশ্বরেরই শক্তিবিশেষ। মহাযানী বৌদ্ধদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর বা প্রত্যেক-বুদ্ধেরা অবতারের নিদর্শন। পঞ্চরাত্রসংহিতায় সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি অবতারদের উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও অবতারের কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চরাত্র ও পুরাণের ভাবকেই পরিপুষ্ট করা হয়েছে। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে অবতারদের বর্ণনা আছে। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী বৈষ্ণব-দার্শনিকরা বিশেষ ক'রে অবতারবাদ প্রচার করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার এই দু'য়ের মিলিত-অবতার বলেন। এজন্য নরোত্তমদাস কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তন করেন। বৈষ্ণবরা বলেন, ঈশ্বর নিজে আসেন, আবার তাঁর শক্তিসম্পন্ন আধিকারিক-পুরুষরাও মানুষের রূপ ধ'রে পৃথিবীতে অবতরণ করেন ব'লে তাঁদের বলা হয় 'অবতার'। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।' বৈষ্ণব-দার্শনিকদের মতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান,—অংশাবতার নন। এ'যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণও তাই। শ্রীঠাকুর নিজেই বলেছেন ঃ 'এবারে ছদ্মবেশে রাজার রাজ্য-পরিভ্রমণ।' ছদ্মবেশ বলতে মানুষের দেহ ধারণ ক'রে আসা।

'অবতার আসেন লোককল্যাণের জন্য,—'লোকসংগ্রহার্থম্'। গীতায়ও 'যদা যদা হি ধর্মস্য' ব'লে অবতারবাদ স্বীকার করা হয়েছে। যুগে-যুগে এক-একজন আদর্শবান মহামানব জন্মগ্রহণ করেন বিশ্ব-মানুষকে পথনির্দেশ করার জন্য। অবতার-রহস্য অতিনিগূঢ়। তোমরা বিশ্বাস করো আর নাই করো, এটা ঠিক যে, সময়ে সময়ে বিশ্বের কল্যাণসাধনের জন্য এক-একজন আধিকারিক-পুরুষ বা অবতার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের ঈশ্বরাবতার বলো, আর জীবন্মুক্ত-পুরুষই বলো তাতে কিছু আসে যায় না। বেদান্তদর্শনে 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' (২।১।৩৩)-সূত্রে অবতারবাদের কথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষ্যে শঙ্কর ঈশ্বরের লীলার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেই লীলাকে তিনি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন বলেছেন; তাতে ঈশ্বরের অবতারদের মধ্যে কোন স্বার্থভাব থাকে না। সৃষ্টি অবিদ্যাকল্পিত, সুতরাং অবিদ্যার ভিতর ঈশ্বরের লীলার জন্য লীলাখেলা-ছাড়া আর কোন স্বার্থ থাকে না। তবে শঙ্কর একথাও আবার বলেছেন ঃ 'তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলেয়ম্, অপরিমিতশক্তিত্বাৎ।' কিন্তু শক্তি পরিমিতই হোক বা অপরিমিতই হোক শঙ্করের মতে শক্তি নিত্য নয়। শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ব'লে অনিত্য। শঙ্করই আবার বলেছেন 'ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ।' সৃষ্টিশ্রুতি যেমন তৈত্তিরীয়-উপনিষদে (৩।১) আছে ঃ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।' তাছাড়া

'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও শঙ্কর এ'কথা আলোচনা করেছেন[১১]। সৃষ্টিশ্রুতি থাক্‌লেও পারমার্থিক-সৃষ্টিতে শ্রুতির তাৎপর্য নয়। নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস যেমন মানুষের প্রযত্ন ছাড়া স্বভাবতই প্রবাহিত হয়, ঈশ্বরের লীলাও তেম্‌নি প্রযত্নহীন স্বাভাবিক খেলা। অবশ্য শঙ্কর এ'কথা ভাষ্যে স্বীকার করেছেন।[১২] শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ 'নিত্য ও লীলা।' লীলা নিত্য-ঈশ্বরেরই খেলা। ঈশ্বরই অবতাররূপে লীলা করেন পৃথিবীতে।

'কিন্তু psychology-র (মনোবিজ্ঞানের) দৃষ্টিতে natural ও automatic (স্বাভাবিক) কাজের পিছনেও মানুষের একটা ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব থাকে, ইচ্ছা-ছাড়া কোন কাজ ও ঘটনাই ঘট্‌তে পারে না। সুতরাং 'স্বভাবাদেব কেবলম্‌' কথাগুলির অর্থ বিচার করা দরকার। কিন্তু 'আপ্তকামশ্রুতেঃ', 'সর্বশ্রুতেশ্চ' প্রভৃতি কথাগুলিতে শঙ্কর নিজের সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রমাণ করেছেন। যখন জীবন্মুক্তপুরুষ আত্মোপলব্ধির পর অজ্ঞানকল্পিত শরীর নিয়ে পৃথিবীতে বাস করেন ও সকল বাসনা ও কর্মফলস্পৃহা ত্যাগ ক'রে লোককল্যাণের জন্য কর্ম করেন, তখন মায়ানির্মুক্ত ও মায়াধীশ ঈশ্বরের পক্ষে নিঃস্বার্থ ও প্রয়োজনশূন্য হ'য়ে লীলা করা অস্বাভাবিক নয়। তবে 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্‌'-সূত্রের তাৎপর্য-সম্বন্ধে শঙ্করের সিদ্ধান্ত কিন্তু ভিন্ন রকমের। তিনি বলেছেন, এই সূত্রের উদ্দেশ্য অবতারবাদ প্রমাণ করা নয়, কিন্তু সৃষ্টির ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদন করা।[১৩] জগৎ বা সৃষ্টি যে ব্রহ্ম-ছাড়া অন্য-কিছু নয়, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এ'কথা বোঝানই সূত্রের আসল উদ্দেশ্য। আর এক কথা, জীবন্মুক্ত-পুরুষরাই মায়াধীশ ঈশ্বরের সমতুল্য। মায়াধীশ ঈশ্বর স্রষ্টা নন, স্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা।'

১১। 'অস্য জগতঃ নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য * * * জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারণাদ্‌ ভবতি তদ্‌ব্রহ্মেতি।'

১২। 'এবমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি।'

১৩। আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে বলেছেন ঃ 'অবিদ্যাকল্পিতনামরূপব্যবহারগোচরত্বাৎ, ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্চৈত্যেতদপি নৈব বিস্মর্তব্যম্‌।'

বাচস্পতি মিশ্রও 'ভামতী'-টীকায় উল্লেখ করেছেন ঃ 'অপি চ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি তত্ত্বয়া বিবক্ষন্ত্যাগমা, অপি তু জগত্‌ ব্রহ্মাত্মভাবম।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বল্লেন ঃ 'কি জানো, অদ্বৈতবাদের কথা স্বতন্ত্র। অদ্বৈতবাদে অদ্বিতীয়-সত্তা ব্রহ্মচৈতন্য-ছাড়া ঈশ্বর নেই, সৃষ্টি নেই এবং জগৎও নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এ'সব তত্ত্ব উপলব্ধি করা কঠিন। তাই জীব, জগৎ ও ঈশ্বরকে স্বীকার কর্‌লে মুক্তিলাভের আশা ও নির্দেশ পাওয়া যায়। সাধারণ অজ্ঞানী মানুষও তাই করে। কঠ উপনিষদে আছে ঃ 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।' জ্ঞানবিচারের পথে ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রয়োজন, তাই সাধারণের পক্ষে তা দুর্গম। 'কশ্চিদ্ধীরা',—কোন কোন বৈরাগ্যবান বিচারশীল পুরুষ জ্ঞানপথের ঠিক ঠিক অধিকারী, নইলে সাধারণের পক্ষে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদই ভাল। দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ তিনটিই সত্য, সুতরাং একজন আদর্শবান সত্যদ্রষ্টা পুরুষ বা অবতারের সেখানে স্থান আছে। তবে এটি সাধারণ মানুষের জন্য, জ্ঞানী বা বিচারীর জন্য নয়।

'অবতারপুরুষেরা কি রকম জানো,—মানুষ হ'য়েও তাঁরা অতিমানুষ। মানুষের বেশে তাঁরা আসেন, মানুষের মতোই তাঁদের চলন-বলন ও আচার-ব্যবহার, কিন্তু আসলে সেই সব থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও মুক্ত। সাংসারিক-মানুষ যে' পথে চলে, তাঁরা চলেন তার ঠিক বিপরীত পথে। সাধারণ মানুষ চায় পৃথিবীর আপাতরম্য আনন্দ ও পার্থিব সুখভোগ,—যা আজ আছে, কাল নেই, কিন্তু অবতারপুরুষেরা চান অপার্থিব সুখ ও শাশ্বত আনন্দ। গীতায় ও কঠোপনিষদে সংসারকে তাই অশ্বত্থবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সেকথা পূর্বে বলেছি। অশ্বত্থের ঊর্ধ্বমূল ও অবাক্‌শাখা। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। অনিত্য সংসারে থেকেও নিত্য ঈশ্বরে ডুবে ছিলেন তিনি সর্বদাই। তুচ্ছ সাংসারিক ভোগসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীভবতারিণীর আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কি আকুলতা, কি তীব্র-বৈরাগ্য, কি কঠোর সাধনাই না করেছিলেন তিনি জীবনে! নিজের আচরণ, দিয়ে বিশ্বমানুষকে শেখালেন তিনি সাধনা ও সিদ্ধির মহিমময় পথ ও মাধুর্য। মানুষমাত্রের শ্রীরামকৃষ্ণ তাই অনুসরণযোগ্য বা অনুকরণীয়!

'আমাদেরও সহায়-সম্বল তাই সর্বভাবসমন্বয়রূপী শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর অসাম্প্রদায়িক ভাব ও উদার আদর্শ যত বেশী বিশ্বের সর্বত্র প্রচার হয়, ততই মঙ্গল। মানুষের ঘরে-ঘরে স্বার্থের সংগ্রাম চলেছে, আর ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা ও মারামারিই কেবল জীবনের অভিনয়। চারিদিকে কেবল অশান্তির আগুন। তাইতো পৃথিবীতে শান্তি-দূতরূপে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নির্বৈর ও সার্বভৌমিক

তাঁর ভাব। নির্বিকার তাঁর প্রেম ও নিঃস্বার্থ তাঁর ভালবাসা। তাই মিলন-মৈত্রীর বাণী রেখে গেলেন তিনি সারা বিশ্বের জন্য। সেই ভাবকে অনুসরণ করা সকলেরই কর্তব্য, তবেই ফিরে আস্‌বে সমাজে আবার শান্তি ও জীবনে শাশ্বত আনন্দ।'

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শ বিশ্বের ঘরে ঘরে প্রচারিত হোক এই কল্যাণ-কামনাই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর অন্তরে সদাসর্বদাই পোষণ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গলময় হস্ত সর্বদাই সর্বত্র প্রসারিত এ'কথা তিনি বলতেন। তাই যখনই তিনি করতেন কোন কর্মের সংকল্প, তখনই অনুভব করতেন শ্রীভগবানেরই মঙ্গলময় ইঙ্গিত ও আশীর্বাদ সেই সকলের পিছনে। বর্তমান যুগ শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীসারদার অপার্থিব এই লীলাভূমি—এ'কথা তিনি বলতেন।

একবারের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে এ'প্রসঙ্গে,—যদিও সেই ঘটনা অতীব তুচ্ছ। বেলুড় মঠ থেকে কলকাতায় এসে তিনি 'বেদান্ত-সমিতি'-র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হ'লেন। জনৈক ভক্ত তখন কিছুটা বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। স্বামীজী মহারাজের মন নির্বিকার, তেজোদ্দীপ্ত ও ক্ষমাসুন্দর তাঁর মূর্তি। নিজের শরীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে ভক্তটিকে তিনি বলেছিলেন ঃ 'একে কি কাগী-বগী পেয়েছ? এর ভিতর তিনটে শক্তি খেলা করছে,—একটা শ্রীঠাকুরের, একটা শ্রীমা-র, আর একটা স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের)।'

আত্মবিশ্বাসের জয়পতাকা নিয়ে বিশ্বের সর্বত্রই স্বামী অভেদানন্দ ভ্রমণ করেছিলেন নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল অবস্থায়। বেশীরভাগ সময়ে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হ'য়ে সকল কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়েও পড়্‌তেন তিনি নির্ভীক মন নিয়ে, সহায়তা ও সফলতার আশীর্বাদও পেয়েছেন তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে সকল সময়েই।

স্বামীজী মহারাজ বলতেন ঃ 'নিজের উপর বিশ্বাস হারালে তো সবই গেল। তাই স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ কর্‌লে ভগবান তার সহায় হন। এর অর্থ কি জানো?—মানুষের *individual will* (ব্যষ্টিইচ্ছা) তখন *Cosmic Will*-এর (সমষ্টিইচ্ছার) কাছে *surrender* (আত্মসমর্পণ) করে। *Individual will*-এর তরঙ্গ *Cosmic Will*-এর প্রবাহের সঙ্গে এক হ'লে শক্তির অনন্ত ও অদম্য স্ফুরণ হয়, পৃথিবীর কোন শক্তিই তখন আর সেই গতির প্রতিরোধ করতে পারে না। *Individual will* এক-একটি মানুষ, আর *Cosmic Will* বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি। বিশ্বপ্রকৃতিই সর্বশক্তির উৎস কালী, —মহাকালী। কালী ভিন্নভিন্ন রূপে দশমহাবিদ্যা। কালীই ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা,

ললিতা ও ত্রিপুরসুন্দরী। সাধকভেদে দৃষ্টিভেদে একই মহাশক্তি কালী আবার নানা নামে ও নানা রূপে প্রকাশিতা। সকল সৃষ্টির বীজ কামনা-বাসনা বিশ্বপ্রকৃতিতে কারণাকারে নিহিত থাকে। মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে যখনই নিজের সংকীর্ণ বুদ্ধি নিয়ে মোহগ্রস্ত হয়, তখনই সে নিজেকে দুর্বল ভাবে, আর তখনই তার শক্তি হয় সীমায়িত, আর যখনই সে চিন্তা করে যে, 'আমি সামান্য তো নই, রাজপুত্র হই, পিতার ধনে পুত্রের পূর্ণ-অধিকার', তখনই বিশ্বপ্রকৃতি ও তার মধ্যে থেকে তার সকল ব্যবধান নিমেষে অন্তর্হিত হয়, এবং তখনই প্রকৃতির বিরাট শক্তির সে হয় অধিকারী। *Then he becomes the playground of the Almighty.* (সে তখন হয় ঈশ্বরেরই লীলাভূমি)।

'আত্মবিশ্বাস বলতে নিজের মধ্যে অন্তর্নিহিত বিশ্বপ্রকৃতির যে বিরাট ইচ্ছা বা শক্তি তাঁকে ঠিকঠিক ভাবে জেনে তাঁর সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন জ্ঞান করতে হয়। প্রকৃতির দিব্যইচ্ছা থেকে নিজেকে ভিন্ন ভাব্‌লে মনে দুর্বলতা আসে। এই ভিন্নজ্ঞানই সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি, অহংকার ও দুর্বলতা। ঈশ্বরকে ভুলে নিজেকে স্বতন্ত্র ও সর্বময় কর্তা চিন্তা করলেই মনের মধ্যে আসে অহংকার। এই অহংকারই সকল অনিষ্টের মূল।'

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ নিজের সকল কর্তৃত্বাভিমান সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে। বিভিন্ন সময়ে তিনি বলতেন ঃ 'আত্মসমর্পণের (self-surrender) ভাবই ভগবদ্‌কৃপা লাভের সহজ পথ। নিজের কর্তৃত্বাভিমান মুছে দিয়ে ঈশ্বরই সব-কিছু করাচ্ছেন একথা চিন্তা করতে হয়। তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র—এই রকম।' নিজের মধ্যে স্বামীজী মহারাজ গোপন ক'রে রেখেছিলেন এই ভাব সকল সময়েই। কিন্তু এই ভাব প্রকাশ পেয়েছিল আরও প্রবলভাবে তাঁর জীবনের শেষ-দু'বছর। কোন-কিছু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলতেন ঃ 'কি জানি বাপু, শ্রীঠাকুরের যা ইচ্ছা—তাই হবে, আমি কিছু জানি না।'

দার্জিলিঙ-আশ্রম থেকে কলকাতা ফেরার সময়ে (ইং ১৯৩৭, ২১শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার[১৪]) ঘুম-ষ্টেশনের আগে বাতাসিয়া-লুপের (Batasia Loop) কাছে তাঁর কামরার চাকা পড়ে যায় লাইন থেকে নীচে।[১৫] গাড়ী থেকে তিনি লাফিয়ে পড়েন। আঘাত পান হার্টে (heart)। পরের দিন (ইং ১৯৩৭,

১৪। ৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার (প্রতিপদতিথি), ১৩৪৪ সাল।

১৫। দার্জিলিঙ-মেলের প্রথম শ্রেণীর যে কামরায় তিনি ছিলেন ঠিক সে'টিই পড়ে যায় রেল থেকে কাঠে (sleeper),—যার উপর রেল পাতা থাকে—তাতে।

২২শে সেপ্টেম্বর, বুধবার) শিয়ালদহ-ষ্টেশনে নেমে কলকাতা বেদান্ত মঠে এলেন পরিশ্রান্ত হ'য়ে। চিংড়িহাটার জমিদার হরিহর দাসচৌধুরীর মোটরে তিনি এলেন বেদান্ত মঠে। নাটমন্দিরে বসার জন্য চেয়ার দেওয়া হ'ল একান্ত পরিশ্রান্ত ব'লে। চেয়ারে বসেই তিনি বল্লেন ঃ 'এবার আমার অগস্ত্যযাত্রা, দার্জিলিঙ যাওয়া বোধহয় এই আমার শেষ। যাক, বেঁচে এলাম এই যাত্রায় একমাত্র শ্রীঠাকুরের কৃপায়।' হোলও তাই। তারপর দার্জিলিঙ-আশ্রমে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর কোনদিন ঘটে ওঠেনি।

বাতাসিয়া-দুর্ঘটনাই স্বামীজী মহারাজের শরীর অসুস্থ হবার পক্ষে একমাত্র কারণ। তাঁর পা ধীরে ধীরে ফুল্‌তে লাগ্‌লো ও তারই ফলে কিছুদিন পরে পেটে জল জম্‌তে লাগলো। চিকিৎসারও হ'ল ব্যবস্থা। ডাক্তাররা ব্যবস্থা দিলেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম ('complete rest')। স্বামীজী মহারাজ শুনে বল্লেন ঃ 'বাঁচা গেল বাবা, এতদিন পরে আমার পেন্সন হ'ল। সারা জীবনটাই গেল কেবল কাজে আর কাজে, এতটুকু বিশ্রাম আর কোনদিন শ্রীঠাকুর আমায় দিলেন না! নেওয়াই যাক্ এখন complete rest (পূর্ণবিশ্রাম)।'

যথার্থ কথাও তাই। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কর্মময় জীবনে 'বিশ্রাম' কথার যেন কোন অর্থ ছিল না কোনদিনই। ছেলেবেলায় যোগশিক্ষার তীব্র-আকুলতা নিয়ে পদব্রজে উপনীত হলেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণও করলেন তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ। ধ্যান-ভজন, জপ-তপ এতেই কাট্‌তো দিবারাত্র বেশীর ভাগ সময়। অবসর যতটুকুও বা পেতেন, ততটুকু কাটাতেন তিনি তাঁর আচার্যদেবের সেবা-পরিচর্যায়। সাধন-ভজনের সময়েও অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতেন তিনি তাঁর অলোকসামান্য শ্রীগুরুদেবের শিক্ষা ও উপদেশ। সাধনের অবস্থায়ই প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি শ্রীভগবানের সর্বদর্শী-চক্ষু। বিশাল আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তপর্যন্ত আতত বা বিস্ফারিত সেই চক্ষু,—'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম।' একমাত্র জ্যোতিষ্মান দেবতারা ('সূরয়ঃ') ও জ্ঞানীরাই বিরাট আকাশের মতো ('দিবি ইব') দিগন্তবিস্তৃত চক্ষু ('চক্ষুরাততম্') সর্বদা দর্শন করতে পান ('সদা পশ্যন্তি')। স্বামীজী মহারাজ ইংরাজীতে তার নাম দিয়েছিলেন 'Omnipresent Eye',—যা সর্বক্ষণই আছে নিবদ্ধ সৃষ্টিময়ী মহাপ্রকৃতির লীলার সাক্ষীস্বরূপ হ'য়ে।

আর একটি অপূর্ব দর্শনও হয়েছিল ঠিক সেই সময়েই (সাধনার সময়ে)। ধ্যানে প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অসংখ্য স্তম্ভশোভিত একটি বিরাট শ্বেতস্ফটিকের প্রাসাদ। তার অভ্যন্তরে চারিদিকে আসীন এক-

একটি বেদীতে এক-একজন অবতারপুরুষ ও দেবতারা এবং মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময়মূর্তি! 'কোটিসূর্য-প্রতিকাশং কোটিচন্দ্রসুশীতলম্' সেই মূর্তির জ্যোতিচ্ছটা। প্রাসাদের অভ্যন্তর ছিল স্বচ্ছ ও আলোকস্নাত। ক্রমে অবতার ও দেবতারা সকলেই প্রবিষ্ট হলেন একে-একে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যশরীরে। অপূর্ব সেই লীলা! অপূর্ব সে' দর্শন! ধ্যানের শেষে আনন্দস্নাত দেহ-মন নিয়ে স্বামী অভেদানন্দ উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর আচার্যদেবের নিকট। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল কথা শুনে বল্লেন ঃ 'তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হ'য়ে গেল! এখন তুই অরূপের ঘরে উঠ্‌লি।' এই মহিমোজ্জ্বল দর্শনকে স্মরণ ক'রেই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বরানগর-মঠে তপশ্চর্যার সময়ে রচনা করেছিলেন 'শ্রীরামকৃষ্ণঅবতারস্তোত্রম্' তাঁর আচার্যদেবের উদ্দেশ্যে—

হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং,
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ।।

নিরুপমমতিসূক্ষ্মং নিস্প্রপঞ্চং নিরীহং
গগনসদৃশমীশং সর্বভূতাধিবাসম্।
ত্রিগুণরহিতসচ্চিদ্‌ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ।।

—প্রভৃতি

সৎ ও অসতের পার্থক্য যাতে নাই, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ ও প্রকৃতির বিকার যাঁর মধ্যে নাই—সেই নির্বিকল্প শান্ত-স্থির-পরমচৈতন্যই এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি পরিগ্রহ ক'রে। সৃষ্টির পূর্বে ও সৃষ্টির প্রভাতে যে মহান্ চৈতন্যঘন-পুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষীরূপে ছিলেন, বর্তমান সৃষ্টির পরেও যাঁর মহিমময় স্থিতি, তিনিই বর্তমানে মনুষ্যদেহধারী শ্রীরামকৃষ্ণ এ'কথাই বুঝাতে চেয়েছেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর সুললিত সংস্কৃত-স্তোত্রের মধ্যে। অতিসূক্ষ্ম- প্রপঞ্চবিকারহীন-দিগন্তব্যাপী আকাশের মতো বিশাল-বিরাট সুমহান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে আছেন প্রকাশমান, আর—

বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তিপ্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ।।

প্রাণীমাত্রের দুঃখে-কষ্টে ব্যথিত হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মনুষ্য-শরীরে এলেন মর্ত্যবাসী মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য নিত্য থেকে লীলায়। আপনি আচরণ ক'রে সকল মানুষকে শিক্ষা দিলেন ধর্ম ও সাধনার পরমরহস্য, জানালেন বিশ্বের মানুষকে জীবনের পরমসত্য ও চরমসার্থকতা অমৃতময় প্রশান্তলোকের দিকদর্শন ক'রে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কর্মময় সাধনসিদ্ধ-জীবনের অবসান হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর (১৩৪৬ সাল, ভাদ্র) শুক্রবার প্রাতে ৮টা ১৬ মিনিটে। বিরাট-বিচিত্র বহু স্মৃতিপূর্ণ তাঁর জীবনের কাহিনী! আমরা আর একটি দিনের মাত্র স্মৃতিদীপ্ত ঘটনার উল্লেখ ক'রে 'মন ও মানুষ'-এর উপসংহার করবো এখানে।

সে'টি হ'ল ইংরেজী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাস। তখন বেলা সাড়ে-এগারো বা পৌনে-বারোটা হবে। স্বামীজী মহারাজ কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে তাঁর অফিস-ঘরে একটি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন। অসুস্থ তাঁর শরীর। আমরা তিনজনমাত্র ছিলাম তাঁর কাছে। ঘরের ভাব ও পরিবেশ স্তব্ধ ও শান্ত। দু'একটি সামান্য কথার পর স্বামীজী মহারাজ বল্লেন ঃ 'দেখ, এখন সব যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এই তো সে'দিনের কথা,—শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) এলেন দক্ষিণেশ্বরে! কত লীলাখেলা তিনি করলেন! আমরা তাঁর সঙ্গে মিশেছি, তাঁকে স্পর্শ করেছি ও তাঁর সেবা করেছি মন-প্রাণ দিয়ে। কি অসাধারণই না ছিল তাঁর ভালবাসা! আজ প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠ্ছে সেই সব আনন্দময় পরিবেশের কথা! যা ছিল একদিন জাগ্রত, আজ মনে হচ্ছে যেন সবই স্বপ্ন। এই সে'দিনেরই কথা, কিন্তু মনে হচ্ছে কতদিন—কত শতাব্দী যেন কেটে গেছে,—যুগ-যুগান্তর হয়েছে যেন অতীত!'

নির্বাক হ'য়ে তিনজনে বিস্মিত হ'য়ে শুন্ছি।[১৬] স্বামীজী মহারাজের মুখ প্রদীপ্ত। তিনি বল্লেন ঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণের মতো অলোকসামান্য লোকনায়কের কৃপা পেলে জীবন ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হ'য়ে যায়! এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানও তুচ্ছ মনে হয়।'

আমাদের মধ্যে থেকে একজন অতিধীরে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

১৬। স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ (সুধন্ব মহারাজ), স্বামী দুর্গানন্দ (ডাক্তার মহারাজ) ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (প্রজ্ঞা মহারাজ)।

'মহারাজ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যই তো মানুষের জন্ম ও সাধনা, সুতরাং তাকে তুচ্ছ মনে হবে কেন?'

স্বামীজী মহারাজ ঈষৎ হেসে বল্লেন ঃ 'ঠিকই বলেছ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্যই তো মানুষের জীবন ও সাধনা। কিন্তু তা' আর ক'জন ভাবে ও পায় বলো। ব্রহ্মবস্তুটি কিরকম বলো দেখি? লাভই বা তাঁকে ক্যামন ক'রে করবে?'

আমরা পূর্বের মতোই শুন্‌ছি নির্বাক হ'য়ে। তিনি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন ঃ 'ব্রহ্ম কি আর তুমি-আমি-ছাড়া? তিনিই তো সব হয়েছেন,—জীবজন্তু, বৃক্ষ-লতা, বিশ্বসংসারের সকল-কিছু! এই যে চেয়ারটা দেখ্‌ছ, তোমরা মনে করছ এটা জড়, কিন্তু এই জড়ের মধ্যেই চৈতন্য ও জীবন আছে। এর প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যেই চৈতন্যশক্তি অনুস্যূত ও জাগ্রত! জড়বস্তু resist করে বা বাধা দেয়। দেওয়ালে জোরে একটা ঘুঁষি মার্‌লে দেখ্‌বে দেয়ালটা তার return (ফেরৎ) দিচ্ছে। এই return (ফিরিয়ে) দেওয়ার নামই resist করা। দেওয়াল resist করলো, ফলে তুমি হাতে ব্যথা পেলে। Resist করার শক্তি জড়ের মধ্যেও আছে। জড়ের এই শক্তিই জড়ের মধ্যে energy অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি। সেই চৈতন্য জড়ের ভিতর অব্যক্ত আকারে থাকে, আর ব্যক্তভাবে থাকে মানুষ ও প্রাণীদের মধ্যে। অব্যক্ত অবস্থার নাম জড়বস্তু। যে চৈতন্য জড়ে আছে, সেই চৈতন্যই আকাশে, বাতাসে ও পৃথিবীর সর্বত্র অণু-পরমাণুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। চিনিকে জলে ফেলে দিলে তা' যেমন জলের প্রতিটি কণায় বা পরমাণুতে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে, ব্রহ্মচৈতন্যও তেম্‌নি। ব্রহ্মচৈতন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র অনুস্যূত। ব্রহ্মের ব্যপক ও বৃহৎ সত্তাকে উপলব্ধি করার নামই ব্রহ্মজ্ঞান, সেকথা তোমাদের একদিন বলেছি। নইলে ব্রহ্মজ্ঞান কি আর গাছে ফলে! এই উপলব্ধি মন বা বুদ্ধি দিয়ে হয় না, অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়। জ্ঞান দিয়ে জ্ঞানের অনুভূতি—বোধে বোধ। বোধ কিনা শুদ্ধচৈতন্য। অনুভূতি তখনই আসে—যখন চিন্তা কর্‌বে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে তুমি ও কোনকিছু স্বতন্ত্র বা পৃথক নও। তোমার সত্তাই বিশ্বসত্তা ও চৈতন্যসত্তা! এটা অনুমানের জিনিষ নয়, প্রাণে-প্রাণে অনুভব করার বস্তু। বোধে বোধ। এই অনুভূতি হয়েছিল বলেই শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) একদিন কালীমন্দিরের পূজার কোশাকুশি, থালা-বাসন, দরজা-জানালা, চৌকাঠ সমস্তই চৈতন্যময় দেখেছিলেন। ব্রহ্মানুভূতি হ'লে এ'রকমই হয়! এই অনুভূতি এখুনি,—এই মুহূর্তেই হ'তে পারে!'

'এখুনি,—এই মুহূর্তেই হ'তে পারে' কথাগুলি স্বামীজী মহারাজ এমনিই দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লেন যেন আমাদের মনে হ'ল ব্রহ্ম যেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও মানুষমাত্রের অনায়াস-লভ্য জিনিষ, দুর্লভ এতটুকুও নয়। তারপর তিনি ও আমরা সকলেই নির্বাক নিস্তব্ধ হ'য়ে কিছুক্ষণ বসে থাক্‌লাম। অফিস-ঘরের পরিবেশ যেন এক জমাট ভাবে আচ্ছন্ন। নীরব ও নিথর চারিদিক। আমাদের সর্বশরীরে তখন এক অব্যক্ত আনন্দস্রোত প্রবাহিত! কতক্ষণ চিত্রার্পিতের মতো সেইভাবে ছিলাম মনে নাই, তবে স্বামীজী মহারাজ যখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তখন আমাদের হুঁস এলো বাহ্যজগতের! সত্য এই ঘটনা! ঘড়িতে তখন বেজেছে বেলা একটা। স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম ক'রে বাইরে এলাম আমরা তিনজনে! ভাবের আচ্ছন্নতা তখনো আমাদের মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ-ভাবে কাটেনি। সামান্যক্ষণের এই ঘটনা, কিন্তু আজও সেই স্মৃতি অবিস্মরণীয় হ'য়ে আছে আমাদের জীবনে! জীবন্মুক্ত মহামানবের সান্নিধ্য ও স্পর্শ সকল-কিছুকেই করে পবিত্র, সকল কিছুকেই করে চির-আনন্দময়! স্বামীজী মহারাজের সেই প্রদীপ্ত ও প্রেরণাময় কথার দ্যোতনা আজও আমাদের স্মৃতিকে প্রদীপ্ত ক'রে রেখেছে!*

---

* যতটুকু স্মরণে আছে মনে হয় ঠিকভাবেই এ'ঘটনা প্রকাশ করতে পেরেছি!



স্বামী অভেদানন্দ (লণ্ডনে)



কলিকাতার আউটরাম ঘাটে স্বামী অভেদানন্দের লণ্ডন-যাত্রাকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দক্ষিণে স্বামী অভেদানন্দ দণ্ডায়মান।